ইসলাম সভ্যতার শেষ ঠিকানা

জিয়াউল হক

সভ্যতা এক চিরন্তন নিয়ম মেনে চলে। অপেক্ষাকৃত উন্নত কোনো সভ্যতার সাক্ষাৎ পেলে সে তার নিকট আত্মসমর্পণ করে। বিলিন হয়ে যায় তার মাঝে। সভ্যতার উন্নতি-অবনতি উভয়ই নির্ভর করে মানুষের ওপর। কারণ, সভ্যতার মূল উপজীব্যই হলো মানুষ। এই মানুষ যখন সুনির্দিষ্ট কতক মৌলিক বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, তখন সভ্যতা দাঁড়িয়ে যায় শক্ত ভিত্তির পাটাতনে। নিশান ওড়াতে থাকে বিশ্বব্যাপী। আর মানুষ যখন সেই মৌলিক ভিত্তি হারিয়ে ফেলে, তখন সভ্যতা প্রস্তুত হতে থাকে অন্য কোনো উন্নত সভ্যতার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ার। গ্রিক, রোমান ও পারস্যের মতো প্রতাপশালী সভ্যতা এই দুটো নিয়ম মেনেই উত্থান-পতনের মুখোমুখি হয়েছিল। গ্রিক সভ্যতা আত্মসমর্পণ করেছিল রোমান সভ্যতার কাছে, আর রোমান ও পারস্য সভ্যতা আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল বিশ্বজনীন সভ্যতা ইসলামের কোলে।

ধীরে ধীরে ইসলামি সভ্যতার ধারক-বাহকদের বিচ্যুতি ঘটে। গ্রিক ও রোমান সভ্যতার ঔরস থেকে জন্ম নেওয়া আজকের পশ্চিমা সভ্যতা বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি হিসেবে বেছে নেয় ইসলামের চিরন্তন উৎসকে; এগিয়ে যায় নানান আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক উৎকর্ষতায়। পুরো বিশ্বকে ভেড়াতে থাকে নিজের প্রভাব-বলয়ে। কিন্তু আজকের পশ্চিমা সভ্যতায় যেসব আচরণ ও বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান, সেসব কারণেই পতন ঘটেছিল তার জন্মদাতার। এটাই যে চিরায়িত নিয়ম।

তাহলে কি অনিবার্য পরিণতি হিসেবেই এই সভ্যতার পতন অত্যাসন্ন? তখন কোথায় গিয়ে সভ্যতা আশ্রয় নেবে? আমরা দাবি করছি, সভ্যতা তার দীর্ঘ সফর শেষে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে আজ ইসলামের উদার বুকে ফিরে আসার দ্বারপ্রান্তে। ইসলাম : সভ্যতার শেষ ঠিকানা।

কিন্তু কীভাবে? চলুন উত্তর খুঁজি সভ্যতার বন্ধুর প্রান্তরে...
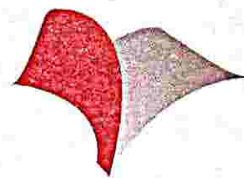
ইসলাম
সভ্যতার শেষ ঠিকানা

জিয়াউল হক

ইসলাম : সভ্যতার শেষ ঠিকানা

জিয়াউল হক

প্রকাশনায়
গার্ডিয়ান পাবলিকেশন্স
৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা),
বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০
০১৭১০-১৯৭৫৫৮, ০১৯৯৮-৫৮৪৯৫৮
@ guardianpubs@gmail.com
www.guardianpubs.com

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com

প্রথম প্রকাশ : ১৫ জুলাই, ২০০৩
দ্বিতীয় সংস্করণ : ১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
তৃতীয় সংস্করণ : ১ মার্চ, ২০১৯
(বর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ)

শব্দ বিন্যাস : মো. জহিরুল ইসলাম
প্রচ্ছদ : হাশেম আলী
মুদ্রণ : একতা অফসেট প্রেস
১১৯, ফকিরাপুল, জবেদা মেনশন, মতিঝিল, ঢাকা।

হার্ডকভার মূল্য : ২৭৫
পেপারব্যাক মূল্য : ২৫০

ISBN- 978-984-8254-18-9

Islam : Shovvotar Shesh Thikana by Zia Ul Haque Published by Guardian Publications, Price Tk. 275 (HC)/Tk. 250 (PB) Only.

‘সক্রেটিস অব দ্যা ইস্ট’ খ্যাত
অধ্যাপক এবনে গোলাম সামাদ স্যারের
হায়াতে তাইয়্যেবা কামনায়

প্রকাশকের কথা

আমরা কেন দাবি করছি, ইসলাম : সভ্যতার শেষ ঠিকানা? এই আলাপ তুলে আদতে মানুষের কী কল্যাণ? সম্মানিত পাঠকবর্গের নিকট এ ব্যাপারে দুটো কথা বলার তাগিদ অনুভব করছি।

সামগ্রিকভাবে বস্তুবাদী মানুষের জীবনের প্রধান লক্ষ্য এই পৃথিবীতে নিজে সুখী হওয়া, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য একটা সুখী সমাজব্যবস্থা তৈরি করে দেওয়া। আরেকটু মোটাদাগে বললে, পৃথিবী নামক এই গ্রহকে সুখের পৃথিবী হিসেবে গড়ে তোলা। এটা একটা দিক। অন্যদিক হলো, আমরা যারা মুসলমান, তারা জীবনের ব্যাপারে আরেকটু বড়ো দৃষ্টিভঙ্গি লালন করি। এই পৃথিবী তো বটেই, তার সঙ্গে অনন্ত জীবনের এক ক্লান্তিহীন সফরের প্রস্তুতি নিই। আমরা এই পৃথিবী এবং তার পরের জীবন-দুটোতেই সফলতা হাতড়ে বেড়াই।

বিতর্ক যা-ই থাকুক, আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে বর্তমান সময়ে পশ্চিমা সভ্যতা পুরো দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করছে। পশ্চিমা সভ্যতার প্রতাপের কাছে অন্যান্য সভ্যতা ম্রিয়মান, অস্তিত্বের লড়াইয়ে। এখন প্রশ্ন হলো, এই পশ্চিমা সভ্যতা কি বস্তুবাদী মানুষদের দুনিয়াবি প্রত্যাশাও পূরুণ করতে সক্ষম হচ্ছে? সুখপাখি বাস্তবে কি এই সভ্যতার ধারক-বাহকদের হাতে ধরা দিয়েছে? পশ্চিমা সভ্যতাকে যারা ধারণ করেছে, তারাও কি দিনশেষে তৃপ্তির ঢেকুর তুলতে পারছে?

আমরা মুসলমানরা যারা দুই জগতেই কল্যাণ প্রত্যাশা করি, তাদের অবস্থা কতটা সংকটাপন্ন- তা নিশ্চয় আপনারা জীবন থেকে উপলব্ধি করতে পারছেন। জ্বলন্ত উনুনে হাঁটছি দলবেঁধে। জ্বলে-পুড়ে ছারখার হচ্ছি, চিৎকার করারও জো নেই। জাহেলিয়াতের ঘোর অমানিশা সত্যের নুরের মশাল নিভিয়ে দেওয়ার আয়োজন করছে জোরেশোরে। শত পরীক্ষা দিয়েও নিদেনপক্ষে ঈমান নিয়ে অনন্ত সফরে বের হওয়ার সুযোগটাও যেন ফুরিয়ে আসছে। একটা বড়ো ঝড় ছুটে আসছে।

বস্তুবাদী কিংবা আসমানি জীবনদর্শনে বিশ্বাসী উভয় শ্রেণির মানুষদের কাছে এই সভ্যতা অগ্রহণযোগ্য ও প্রত্যাখ্যানযোগ্য প্রমাণিত হয়েছে। সভ্যতার ঠিকানা খোঁজার আলাপটা ঠিক এখানেই খুব বেশি প্রাসঙ্গিক, অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ইংল্যান্ড প্রবাসী সুলেখক, চিন্তাবিদ, কলমসৈনিক মুহতারাম জিয়াউল হক ভাই এই কার্যকর আলাপ তুলেছেন তাঁর *ইসলাম : সভ্যতার শেষ ঠিকানা* গ্রন্থে। তিনি দাবি করেছেন, ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বর্তমান সভ্যতার পতন অত্যাসন্ন। পতনোন্মুখ সভ্যতা কিছু যৌক্তিক কারণেই ইসলামি সভ্যতার কোলে আশ্রয় গ্রহণ করবে।

আমি সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে অনুরোধ করব, এই বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে সাহিত্যের রসের দাঁড়িপাল্লায় না তুলে জ্ঞান দুনিয়ার তৃষ্ণার নদীতে ঝাঁপ দিন। এই গ্রন্থ আপনার রসাত্মবোধকে একটু ধৈর্যের পরীক্ষায় ফেলবে। সে পরীক্ষায় উতরে গেলে আপনি নিশ্চিত থাকুন, ঋদ্ধ হবেন খানিকটা, বেছে নেওয়া পথের ব্যাপারে আস্থা খুঁজে পাবেন।

নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের
বাংলাবাজার
১০.০১.২০১৯

মুখবন্ধ

বর্তমান বিশ্বে কেবল একটিমাত্র সভ্যতারই একচ্ছত্র আধিপত্য ও কর্তৃত্ব চলছে। আধুনিক ইউরোপ থেকে উদ্‌গত এই সভ্যতা বিগত তিন-চারশো বছরে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। এই গ্রহের আনাচে-কানাচে, অলিতে-গলিতে সর্বত্র এর অবাধ বিচরণ।

এ সভ্যতার প্রধান দুটো উপকরণ হচ্ছে বস্তুবাদ ও ভোগবাদ। এর সঙ্গে অতিন্দ্রিয় বিষয় হিসেবে যুক্ত সংশয়বাদ। আর সংশয় মানেই হচ্ছে জীবন ও জগতের সৃষ্টি, পরিচালনা ও বিনাশ সম্পর্কে কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া। ইসলামের পরিভাষার ঈমান ও ইয়াকিন-এর ঠিক বিপরীত বিষয়ই সংশয়। খ্রিষ্ট ধর্মের বিকৃত রূপ থেকেই সংশয়ের জন্ম। সংশয় বুকে পুষেই সভ্যতা কয়েকশো বছর পৃথিবীর পথ অতিক্রম করেছে। কোনো সন্দেহ নেই, সেই সভ্যতা বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েছে। একইসঙ্গে স্বীকার করতে হবে, সংশয়বাদ আপাত সফল সভ্যতার আত্মায় যে পঁচন ধরিয়েছিল, তারও ষোলোকলা পূর্ণ হয়েছে। ফলে জন্মলগ্ন থেকেই এই সভ্যতা কোনো সংকটের প্রকৃত সমাধানের পরিবর্তে কেবল তার ভলিউম বাড়িয়েই চলেছে। শান্তি প্রতিষ্ঠায় বিশ্ব একেবারে দিশেহারা। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধের পর ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসানে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা আপাতত টলে গেলেও একক পরাশক্তির ক্ষমতার দর্প জুলুমের আরেক পাহাড় তৈরির উন্মত্ত প্রচেষ্টায় লিপ্ত।

বর্তমান সভ্যতা এমন দর্প ও অহংকারে মত্ত হওয়ার পূর্বে সমগ্র বিশ্ব ইসলামি সভ্যতার ছায়ায় হাজার বছরের পথ অতিক্রম করেছে। হাজার বছরেও পৃথিবীতে সংকটের মতো বড়ো আবর্ত কখনো সৃষ্টি হয়নি। বস্তুগত উন্নতিক দিক-নির্দেশনাও ইসলামই দিয়েছিল। তার ফলে বস্তুগত উন্নতির যে বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল, তার ভিত্তিতেই আধুনিক সভ্যতার এতটা পথ অতিক্রম সম্ভব হয়েছে। ইসলামের আওতায় সভ্যতার এ বিধ্বংসী রূপ এবং মারণাস্ত্রের নগ্ন ব্যবহার ছিল না। তাই ইসলামই আধুনিক সভ্যতার যাবতীয় উৎকৃষ্ঠাংশের উত্তরাধিকারী। পৃথিবী এগিয়ে চলে। মৃত্যু মানুষের জন্য অবধারিত হলেও মৃত্যুর জন্যই তাকে বেঁচে থাকতে হয়। আর এ বেঁচে থাকার মেয়াদ যত স্বল্পই হোক না কেন,

তার সার্থকতাই মৃত্যুকে সার্থক করে তোলে। এজন্যই ইসলামে বুনিয়াদি ধারণায় বস্তুবাদী উন্নতিকে মানবিক কল্যাণমুখী করার মন্ত্র নিহিত রয়েছে। তাই ইসলামের অনুসারী পৃথিবীও এগিয়ে চলে। ইসলামকে সভ্যতা ও উন্নতির প্রতিপক্ষ এবং সন্ত্রাস ও নিষ্ঠুরতার ধারক হিসেবে চিহ্নিত করার অপচেষ্টাকারীদের ব্যর্থ করে দিয়ে বিশ্ব সভ্যতাকে কল্যাণময় অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশ্বব্যাপী ইসলামের এক নব উত্থান ঘটছে। ইসলাম ছাড়া সভ্যতার আত্মরক্ষার দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। *ইসলাম : সভ্যতার শেষ ঠিকানা* গ্রন্থে লেখক অত্যন্ত সুন্দরভাবে যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে এ কথাই প্রমাণ করেছেন।

আবদুল মান্নান তালিব
মগবাজার, ঢাকা।

লেখকের কথা

আলহামদুলিল্লাহ, সকল প্রশংসা সেই মাবুদের, যিনি আমাকে এই গ্রন্থ রচনা করার মতো সময়, সুযোগ ও প্রয়োজনীয় শক্তির যোগান দিয়েছেন। দরূদ ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তির দূত সাইয়্যেদুল মুরসালিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর, তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ ও পরিবারবর্গের ওপর এবং তাঁর নিষ্ঠাবান সম্মানিত অনুসারীদের ওপর।

স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় সমস্যা জর্জরিত বর্তমান বিশ্ব অনিবার্যভাবেই ইসলামের কোলে আশ্রয় নিচ্ছে, তা সুস্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান। গোটা বিশ্বজুড়ে ঘটমান পরিবর্তন সে কথা সন্দেহাতীতভাবে বলে দিচ্ছে। তারপরেও কিছু লোক সবসময় যুক্তি খোঁজেন। তারা নিজেদের যুক্তিপ্রিয় বুদ্ধিজীবী হিসেবে দাবি করেন। বুদ্ধির জোরের চোটে স্বাভাবিক, সুস্পষ্ট এবং অতি সাধারণ পরিবর্তনগুলোও তাদের চোখে পড়ে না। একজন মূর্খ মানুষ হিসেবে বুঝতেই পারি না, এসব মহারথীদের কী নামে ডাকা উচিত। 'বুদ্ধিজীবী' নাকি 'যুক্তিজীবী'? ভাবতে বাধ্য হই, এসব মানুষ আদতে জ্ঞানপাপী, সুবিধাবাদী চরিত্রের। যেখানে বুদ্ধিকে খাটিয়ে জীবিকা অর্জন করা যায়, সেখানে তারা 'বুদ্ধিজীবী'। আর যেখানে যুক্তি খাটালে নগদ কিছু পাওয়া যায়, সেখানে তারা 'যুক্তিজীবী'।

বিশ্ব সভ্যতা যে ইসলামের কোলে আশ্রয় নেওয়ার একেবারে দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে, সে বিষয়ে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপরও আমি শুধু ওই যুক্তিজীবী গোষ্ঠীর সামনে যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা তুলে ধরে বলতে চেয়েছি, বর্তমানে বিশ্ব সভ্যতা টিকে থাকার সকল যোগ্যতা হারিয়েছে। এ সভ্যতা সেই একই রোগে আক্রান্ত, যে রোগে আক্রান্ত হয়ে অতীতের অনেক সভ্যতাই ধ্বংস হয়ে গেছে, বিলীন হয়েছে অন্য কোনো সভ্যতার মধ্যে। অতএব, এ সভ্যতার পরিবর্তন অনিবার্য এক বাস্তবতা।

কিন্তু পরিবর্তনের এ রূপ কী হবে? এ সভ্যতা টিকে থাকার জন্য শেষ অবধি কাকে আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করবে? সম্ভাব্য আশ্রয়স্থল হিসেবে আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও যুক্তিজীবী শ্রেণির উপস্থাপিত মতবাদ বা দর্শনের ব্যাপারে যুক্তি-প্রমাণ আসলে কী বলে? তত্ত্ব, তথ্য ও উপাত্ত সহকারে এসব আলোচনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে।

সম্ভাব্য সকল দিকেই যুক্তির দেয়াল খাড়া করা হয়েছে। ইসলামি জীবনদর্শন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টারত সংগ্রামী যুবকবৃন্দ, যাঁরা নিজেদের আহার-নিদ্রা, আরাম বিসর্জন দিয়ে মানুষকে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা বোঝাতে ব্যস্ত, এই গ্রন্থ তাঁদের কাজে লাগবে বলে আশা করছি। সমাজে তথাকথিত বুদ্ধিজীবী আর যুক্তিজীবীদের সামনে উপস্থাপনের মতো যুক্তির অস্ত্র এসব লড়াকুদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্যই এ গ্রন্থ।

আমি আমার জ্ঞানের স্বল্পতা ও অযোগ্যতা সম্বন্ধে পুরোমাত্রায় সচেতন। তার পরেও সাহস ও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ওপর ভরসা করে গ্রন্থখানা লিখেছি দীর্ঘ আড়াই বছর ধরে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এ বইটা লেখা শেষ করার এবং তা ছাপা হয়ে পাঠকের হাতে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করলেন, এ এক আশ্চর্য ব্যাপারই মনে হয় আমার কাছে! যখন পুরো বিষয়টি ভাবি, তখন শিহরিত হই, পুলকিত হই, আবার ভয়ে অন্তরও কেঁপে ওঠে, হায় কতটুকুই-বা তাঁর এ বদান্যতার শুকরিয়া আদায় করলাম! ইসলামি সাহিত্য বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে জনপ্রিয় করার অন্যতম দিকপাল প্রকাশনা সংস্থা *গার্ডিয়ান পাবলিকেশন* গ্রন্থটি প্রকাশ করার দায়িত্ব নেওয়ায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ।

এই গ্রন্থের কোনো ভুলত্রুটি চোখে পড়লে অনুগ্রহপূর্বক জানালে পরবর্তী সময়ে ইনশাআল্লাহ সংশোধন করে নেব। সবশেষে মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে মিনতি; মাওলা গো, সেই কঠিন দিনটিতে আপনি অনুগ্রহ করে আমার অনেক রাতজাগা এ লেখাটির উসিলায় একটুখানি রহমতের দৃষ্টি দেবেন আপনার পাপী ও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এ দাসের পানে।

খাকসার
জিয়াউল হক
ইংল্যান্ড

সূচীপত্র

সভ্যতা ও তার গঠন

সভ্যতা কী? এ প্রশ্নের উত্তরে বিশিষ্ট লেখক ও ইসলামি চিন্তাবিদ আব্দুর রহমান আজ্জাম লিখেছেন–

> 'সভ্যতা একটি মশালের মতো, যা যুগে যুগে এক জাতির হাত হতে অন্য জাতির হাতে স্থানান্তরিত হয়েছে।'[১]

পৃথিবীর সূচনাকালেই মানব সভ্যতার গোড়াপত্তন। পৃথিবীর বয়স কয়েক হাজার কোটি বছর; মানুষও এখানে বসবাস করছে কোটি কোটি বছর ধরে। মানুষের জীবনযাপনের ধারা ও ইতিহাস যাই হোক না কেন, পুরো সময় ধরেই এই পৃথিবী কোনো না কোনো সভ্যতার বুকেই আশ্রয় নিয়েছিল। জানা-অজানা শত শত সভ্যতার উত্থান-পতনের নীরব স্বাক্ষী পৃথিবী নামক গ্রহ। কোনো সভ্যতা তার সূচনালগ্নেই ভেঙে পড়েছে অথবা অন্য কোনো সভ্যতার আগ্রাসনের শিকার হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়েছে কিংবা পরিবর্তিত হয়েছে। বিপরীতে কোনো কোনো সভ্যতা প্রচণ্ড দাপট ও শৌর্য-বীর্য নিয়ে যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিকে থেকেছে। পৃথিবীর ওপর ছড়ি ঘুরিয়েছে প্রচণ্ড প্রতাপের সঙ্গে। সমগ্র পৃথিবী বা তার অংশবিশেষের ওপর স্থায়ী কিংবা অস্থায়ী প্রভাব বলবৎ রেখেছে। ভালো-মন্দ উভয়বিধ প্রভাবে মানব সভ্যতাকে প্রভাবিত করেছে।

গ্রিক সভ্যতা, রোমান সভ্যতা, দ্রাবিড়, বৌদ্ধ, আর্য ও চৈনিক সভ্যতা এবং সবশেষে ইসলামি সভ্যতাসহ অনেক সভ্যতাকে পৃথিবীর স্বস্ব স্থানে ভাস্বর দেখতে পাই। মানুষের জীবনযাপন, উত্থান-পতন, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সুখ-দুঃখসহ সামগ্রিক জীবনব্যবস্থাকে ঘিরে সভ্যতা গড়ে ওঠে। তাই সভ্যতার মূল উপাদান হলো মানুষ।

সমগ্র জাতি কিংবা তার অংশবিশেষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠে একটি সভ্যতা। যে সভ্যতা মানুষের মৌলিক, জৈবিক, সামাজিক, আত্মিক, আধ্যাত্মিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক তথা জীবনের সামগ্রিক প্রয়োজন যথাযথভাবে ও যথাসময়ে তুলনামূলক উত্তমরূপে মেটাতে সক্ষম হবে, সেই সভ্যতাই মানুষের কাছে কাঙ্ক্ষিত ও গ্রহণীয় হয়ে উঠবে। অপরদিকে যে সভ্যতা মানুষের সার্বিক প্রয়োজন মেটাতে যতখানি ব্যর্থ হবে, সে সভ্যতা ঠিক ততখানি বর্জনীয় হিসেবে বিবেচিত হবে। কালের পরিক্রমায় সে সভ্যতা ব্যর্থ ও অপাংক্তেয় বলেই চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

সভ্যতার উদ্দেশ্য

সভ্যতার মূল উদ্দেশ্য জীবদ্দশায় মানুষ যেন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। আত্মিক, জৈবিক ও দৈহিক চাহিদাসমূহ পূরণের অনুকূল পরিবেশ পায়। সুখ-শান্তি, প্রগতি ও কল্যাণের সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারে এবং সে আসনে আসীন থাকতে পারে। সে ব্যবস্থা নিশ্চিত করাটাই হলো সভ্যতার উদ্দেশ্য।

মানুষ অনেকটা আগ্নেয়গিরির মতো। যার ভেতরে লুকিয়ে থাকে শান্ত লাভার মতো সুপ্ত প্রতিভা! যেকোনো মানুষের ভেতরেই বিরল ও দুর্লভ প্রতিভা সুপ্তাবস্থায় লুকিয়ে থাকতে পারে। সভ্যতা হলো সেই শক্তি, যা মানুষের ভেতরে সুপ্তাবস্থায় লুকিয়ে থাকা এই প্রতিভা বিকাশের ক্ষেত্র তৈরি করে এবং সযত্নে লালন করে। মানুষের ভেতরে এসব কল্যাণকর প্রতিভার বিকাশ, লালন ও ক্রমোন্নয়নের মাধ্যমে তা পূর্ণতার স্তরে উন্নীত হয়।

একটি সভ্যতার দায়িত্ব হলো, মানুষের সকল ধরনের যোগ্যতা ও মেধার যথাযথ মূল্যায়ন করা। এর সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে বৃহত্তর মানবতার কল্যাণের ধারা উন্মুক্ত করা এবং তা অব্যাহতভাবে চালু রাখা। সেইসঙ্গে এই ধারা যেন উন্নত স্তর ও মান বাজায় রেখে পরবর্তী বংশধরদের হাতে স্থানান্তরিত হতে পারে, তা নিশ্চিত করা।

এই কঠিন দায়িত্বগুলো পালনে যে সভ্যতা যত বেশি এগিয়ে, সে সভ্যতা তত বেশি সফল। আর এই সভ্যতাই বিশ্বসভায় শ্রেষ্ঠ সভ্যতা হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রতি যুগের মানুষের কাছে সমাদৃত হয়। শুধু প্রাচুর্য, ধন-সম্পত্তি, বিলাস-ঐশ্বর্য দেখে একটি সভ্যতাকে উন্নত বলে রায় দেওয়া নিতান্তই অযৌক্তিক। বস্তুগত উন্নতি, জাঁকজমক, ক্ষমতা, প্রতাপ-প্রতিপত্তির বাহুল্য উপস্থিতি একটি সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না, হওয়া উচিতও নয়; বরং এ ক্ষেত্রে দেখা উচিত,

একটি সভ্যতা মানব সমাজের সদস্যদের চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস-আকিদা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যকে ক্রমবিকাশ ও উত্তরণের ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে। একইসঙ্গে কতটা আলোড়িত করেছে। নৈতিক দিকটাকে কতটা গুরুত্বের সঙ্গে উপস্থাপন করতে পেরেছে। উন্নয়নকে কতটা সংজ্ঞায়িত করতে পেরেছে। নৈতিকতার বাস্তব ও চিরন্তন মডেল কতটা দাঁড় করাতে পেরেছে। সমাজ কাঠামোর সদস্যদের নৈতিকতাকে কতটা উন্নত ও আলোড়িত করতে পেরেছে। উৎকৃষ্ট নৈতিকতা অর্জন ও সংরক্ষণে তাদের কতটা উজ্জীবিত, অনুপ্রাণিত করতে পেরেছে। এগুলোই হলো সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি। এসব বিষয়ের নিরিখেই বিচার করে দেখা উচিত, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সভ্যতা কোনটি?

সভ্যতার গঠন

সভ্যতার গঠনতন্ত্রে একটা নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী ও ভূখণ্ড অনিবার্য দুটো উপাদান। সভ্যতার সূচনা ও ক্রমবিকাশের জন্য আরও চারটি মৌলিক উপাদান বিদ্যমান। এগুলোকে বাদ দিলে সূচনাতেই একটি সভ্যতা বিলুপ্ত হতে বাধ্য।

- অর্থনৈতিক উপায়-উপকরণ ও কর্মপদ্ধতি
- প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক অবকাঠামো
- নৈতিক রীতি-নীতি ও বিধিবিধান
- জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সর্বোপরি একটি সমাজ-জীবনের প্রথম চাহিদা হলো অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা। এই প্রয়োজনের খাতিরেই গড়ে উঠে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড। এ ক্ষেত্রে সফলতা-ব্যর্থতা সামগ্রিকভাবে একটি জাতি এবং বিচ্ছিন্নভাবে জাতির প্রতিটি সদস্যকে প্রভাবিত করে। তাদের সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন ও ভালো-মন্দকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই সভ্যতা গড়ে ওঠার একটি অন্যতম উপাদান হলো অর্থনৈতিক উপায় উপকরণ ও কর্মপদ্ধতি।

সমাজের মানুষের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো শান্তি-সম্প্রীতি, মায়া-মমতা ও সৌহার্দ্য-ভালোবাসার উন্মেষ ঘটানো। প্রত্যেকের মৌলিক মানবাধিকার নিশ্চিত করা, তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক নিরাপত্তা দেওয়া, সমাজে অন্যায়-অনাচার প্রতিরোধ, দুষ্টের দমন, শিষ্টের লালন করা। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের অবকাঠামো নির্ধারণ, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ করা। এ গুরুদায়িত্ব কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা এককভাবে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব নয়; বরং এসব বিষয়ে সমাজের সকলেই কিংবা সংখ্যাগরিষ্ঠ সচেতন নাগরিকের মতামতের ভিত্তিতে নিজেদের পছন্দমতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা প্রয়োজন;

যার মাধ্যমে এগুলোকে আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব হবে। আর এই প্রতিষ্ঠানের নামই হলো রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং তার অবকাঠামোই হলো সভ্যতার দ্বিতীয় মৌলিক উপাদান।

মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, জীবন, পরিচালনা ও সম্পাদনা, মেলামেশার পথ ও পদ্ধতি; রাষ্ট্রের নাগরিক ও সমাজের অধিবাসী হিসেবে বসবাস ও চলাচলের জন্য কিছু সর্বগ্রাহ্য, উপযোগী, সহজ ও সাবলীল নিয়ম-কানুন ছাড়া কখনোই কোনো সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। তাই নৈতিক রীতি-নীতি ও বিধিবিধান হলো সভ্যতার তৃতীয় মৌলিক উপাদান।

সমাজে বসবাসকারী মানবমণ্ডলীর মানবীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ বজায় রাখা, তাদের মানবীয় প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির মান উন্নয়ন করা, তাদেরকে সমাজ-সভ্যতায় কর্মক্ষম ও যুগোপযোগী রাখা, সমাজ সকল জীবের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা এবং অপরের অধিকার সম্পর্কে দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করা একটি সভ্যতার গুরত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে হলে তাদেরকে ন্যায়-অন্যায় ও মঙ্গল-অমঙ্গলের সম্যক ধারণা দিতে হবে। সেইসঙ্গে সমাজ-সভ্যতা গঠনে তাদের প্রত্যক্ষ অংশীদারিত্ব ও দায়িত্ব গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সৃষ্টি এবং তা বিকাশের সহজ ও সাবলীল পথ থাকতে হবে। এই জ্ঞান-বিজ্ঞান, আকিদা বিশ্বাসের চর্চা প্রত্যহিক জীবনের কর্মকাণ্ডে ও আচার-আচরণে লালনের মাধ্যমেই গড়ে উঠে একটি সমাজের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। তাই একটি সভ্যতা গড়ে উঠার পেছনে জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা শিক্ষা-সংস্কৃতির উপস্থিতি হলো সভ্যতার চতুর্থ মৌলিক উপাদান।

মানুষের দ্বারা, মানুষের জন্য এবং মানুষের মধ্যেই একটি সভ্যতা গড়ে ওঠে। মানুষই হলো সভ্যতার মৌলিক প্রতিপাদ্য বিষয়। মানুষই সভ্যতার প্রস্তুতকারক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। সভ্যতার দ্বারা মানুষের জীবনের সকল দিক প্রভাবিত হয়। আবার উলটো করে মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড, জীবনাচার ও সফলতা-ব্যর্থতা দ্বারাও সভ্যতা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়। সময়ের সাথে সাথে সভ্যতার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়। স্থায়ী-অস্থায়ী, ভালো-মন্দ পরিবর্তনের ছাপ সভ্যতা তার সদস্যদের কথা কাজ, চাল-চলন ও আচার-আচরণের মাধ্যমে ধরে রাখে।

সভ্যতার দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপ হলো মানুষের নৈতিকতা, আচার-আচরণ, জীবনবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি। মানুষের উন্নত নৈতিকতা, জীবনাচার ও মহৎ দৃষ্টিভঙ্গি দেখেই আমরা বুঝে থাকি সংশ্লিষ্ট সভ্যতা নিজে কতটা উন্নত এবং কতটা উন্নত আদর্শের ধারক।

এটি খুব সাধারণ একটি দৃষ্টিভঙ্গি। সভ্যতার বিচারে সমাজবিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণ আরও গভীরে দৃষ্টিপাত করে থাকেন। তারা দেখেন, সভ্যতার আদর্শিক শক্তি মানব প্রকৃতির জন্য কতটা উপযোগী এবং এটি সমাজের সদস্যদের চেতনার মর্মমূলে কতটা প্রবেশ করতে পেরেছে। তারা সমাজ সভ্যতার উন্নয়ন ও স্থায়িত্বের জন্য কিছু মৌলিক উপাদান ও মৌলিক কার্যকারণের প্রতি অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিপাত করেন। যাচাই করে দেখেন, একটি সভ্যতার নীতি-নৈতিকতা, আকিদা-বিশ্বাস ও শিক্ষা-সংস্কৃতি দিয়ে মানুষের ব্যবসা-বাণিজ্য, অর্থনীতি, লেনদেন, সামাজিক বন্ধন ও জীবনাচারকে কতটা উন্নত ও সমৃদ্ধ করতে পেরেছে। তাদের একক ও সামষ্টিক জীবনে সংস্কৃতির সুফল কতটা আহরণ করতে পেরেছে। তাদেরকে নিজেদের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে সম্বন্ধে কতটা সচেতন করে তুলতে পেরেছে। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় মৌলিক বিষয়গুলোকে কতটা সরবরাহ করতে পেরেছে। এসবের ভিত্তিতেই একটি সভ্যতার সার্বিক বিচার করা হয়।

পৃথিবীতে কোনো সভ্যতা পরম উন্নত ও স্থায়ী আদর্শ সভ্যতায় পরিণত হতে পারে না। সেটা যে কালে, যে স্থানেই গড়ে উঠুক না কেন; বরং সভ্যতার নিয়ন্ত্রক ও পরিচালক মানবগোষ্ঠী তাদের সুচিন্তিত গবেষণা, মতামত ও প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার মাধ্যমে কালের পরিক্রমায় ক্রমাগতভাবে সভ্যতার উত্তরণ ঘটাতে থাকে। এভাবে তারা সভ্যতাকে শুধু নিজেদের সমাজের জন্যই নয়; বরং গোটা বিশ্বমানবতার জন্যই একটি কল্যাণের উৎস ও মাধ্যম বানিয়ে নিতে পারে।

সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করে মানব সমাজের কল্যাণ সাধনের জন্য সভ্যতার ক্রমাগত উন্নয়ন অপরিহার্য। বিনা পরিশ্রমে, বিনা প্রচেষ্টায় সভ্যতা উন্নত হয় না; প্রয়োজন সুপরিকল্পিত কর্মপ্রচেষ্টা। সুবিন্যস্ত কর্মপরিকল্পনা এবং নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমেই কেবল কাঙ্ক্ষিত সভ্যতা নির্মিত হতে পারে।

সভ্যতার উন্নয়নের জন্য প্রচেষ্টা চালানোর আগে এ কথা ভালোভাবে জেনে নেওয়া প্রয়োজন, সভ্যতার উন্নয়নের জন্য কিছু অপরিহার্য উপাদান থাকতে হবে; যা দিয়ে সভ্যতার উত্তরণ ও উন্নয়ন ঘটানোর প্রয়াস চালানো যায়। এগুলোকে আমরা সভ্যতার উন্নয়নে অপরিহার্য উপাদান বলে আখ্যায়িত করতে পারি।

সভ্যতার উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদানসমূহ

ধর্ম

সভ্যতার উন্নয়নের প্রথম উপাদান হলো ধর্ম। এখানে বিশেষ কোনো ধর্মের কথা বলছি না। সভ্যতার উন্নয়ন, ক্রমবিকাশ ও উত্তরণের জন্য একটা ধর্মীয় দর্শন ও আদর্শের উপস্থিতি একেবারেই অপরিহার্য শর্ত। সে ধর্ম বাতিল না সত্য; সে বিতর্ক আপাতত সাময়িক সময়ের জন্য এড়িয়ে চলছি।

ধর্ম আসলে কী? এ প্রশ্নের উত্তরে বিস্তারিত আলোচনা ও বিতর্কের সূত্রপাত হতে পারে। তাই সে দিকে না গিয়ে আমরা অতি সংক্ষেপে ধর্মের মূল তত্ত্ব (Core Cocept of Religon) বুঝতে চেষ্টা করব।

ধর্ম মানুষের বোধ-বিশ্বাস ও আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী কিছু বিশ্বাস। জীবনের সার্বিক কর্মকাণ্ড পরিচালনাকারী কিছু নির্দেশনা ও শিক্ষা; যা তাকে নিজের অবস্থান ও গন্তব্য জানিয়ে দেয় এবং জীবনপথ পাড়ি দিতে সহায়তা করে।

এই পৃথিবীতে অতীতে যত ধর্ম বিদ্যমান কিংবা বর্তমানে যত ধর্ম বিদ্যমান আছে, তার প্রতিটিই কিছু বিশ্বাস ও নির্দেশনার সমষ্টি মাত্র। এসব বিশ্বাস ও নির্দেশনার ভিত্তিতে মানুষ তার কর্মকাণ্ডকে বিস্তৃত করে। কোথাও কোথাও নিয়ন্ত্রণও করে। ধর্মীয় বিশ্বাস তার মন-মগজে স্থায়ী প্রভাব সৃষ্টি করে। ধর্মীয় চেতনা তাকে উদ্দীপ্ত ও উজ্জীবিত করে, সার্বিক মানবীয় সত্তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তার প্রতিটিই কোনো না কোনো ধর্মবিশ্বাস বা দর্শন দ্বারা আংশিক অথবা পূর্ণরূপে প্রভাবিত, পরিচালিত ও পরিশীলিত হয়ে ক্রমান্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ সভ্যতা কাঠামোতে রূপ নিয়েছে। প্রাচীন গ্রিক, রোমান, চৈনিক,

আর্য থেকে শুরু করে ইসলামি সভ্যতা সবগুলোই কোনো না কোনো দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছিল। সর্বশেষ বর্তমান বিশ্বের প্রাচ্য থেকে প্রতীচ্য জুড়ে বিদ্যমান পশ্চিমা জড়বাদী সভ্যতাও নির্দিষ্ট দর্শন ভিত্তিমূলের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে।

ধর্ম হলো সভ্যতার গঠন প্রক্রিয়ায় একটি অনিবার্য প্রয়োজনীয় অনুসঙ্গ। পূর্বের আলোচনায় আমরা সভ্যতার চারটি মৌলিক উপাদানসমূহের মধ্যে তৃতীয় উপাদানটিকে 'নৈতিক রীতি-নীতি ও বিধিবিধান' হিসেবে আখ্যায়িত করেছি। কিন্তু এখানে আমরা ধর্ম বলতে শুধু গুটিকতক সুনির্দিষ্ট বিধিবিধানকে বোঝাচ্ছি না; বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, জীবনদর্শনকে বোঝাতে চাচ্ছি।

বস্তুত ধর্ম ছাড়া এ পর্যন্ত বিশ্বে কোনো সভ্যতাই গড়ে ওঠেনি এবং ভবিষ্যতেও গড়ে উঠতেও পারে না। সোভিয়েত রাশিয়ায় ধর্ম বিবর্জিত একটি নতুন সভ্যতা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলেছিল। একটি নতুন সভ্যতা(?) প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় তারা ধর্ম-দর্শন ও সকল বিধিবিধান ত্যাগ করেছিল। মুখে ধর্মহীন সভ্যতার ইশতেহার উচ্চারিত হলেও বাস্তবে কি তারা আদৌ কোনো ধর্ম-দর্শনকে ত্যাগ করতে পেরেছিল? অহিভিত্তিক ঐশীধর্ম বলে পরিচিত সকল ধর্মকে পরিত্যাগ করলেও প্রকৃতপক্ষে নিজেদের অলক্ষ্যে ও অজান্তেই নতুন এক ধর্মের গোড়াপত্তন করে বসেছিল। তাদের দ্বারা নব উদ্ভাবিত এ ধর্মটির নাম হলো 'কমিউনিজম'।

পৃথিবীতে প্রচলিত সকল ধর্ম-দর্শনকে অস্বীকার করে তদস্থলে তারা নিজেদের মনগড়া নতুন এক দর্শনের গোড়াপত্তন করে এবং সেই দর্শনের বাহুডোরে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে। এটা অবশ্যম্ভাবীভাবে এ কারণেই হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে ধর্ম বা দর্শন ছাড়া কোনো কালেই কোনো সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। এমনকী সভ্যতার সূচনাও হতে পারে না।

ধর্মহীনতা, ধর্মের নাগপাশ হতে মুক্তি, এসব প্রলাপ মূলত আপামর জনসাধারণকে বোকা বানানোর এক প্রতারণাপূর্ণ কৌশল। ধর্মের বিরুদ্ধে মানুষকে বিষিয়ে তুলে নিজেদের জ্ঞান এবং বুদ্ধিজাত নবগঠিত দর্শন কমিউনিজম-এর ফাঁদে বিশ্ব মানবতাকে জড়িয়ে নেওয়ার এক কূটকৌশল মাত্র। কমিউনিজম নামের নতুন ধর্ম-দর্শনটি মানবীয় সকল প্রাকৃতিক সত্তার সাথে কট্টরভাবে সাংঘর্ষিক। নৈতিকতা, জ্ঞান ও আদর্শের দৃষ্টিকোণ বিবেচনায় সম্পূর্ণ ও শোচনীয়রূপে অন্তঃসারশূন্য। নব সৃষ্ট কমিউনিজম মাত্র সত্তর বছরের মধ্যেই নিজ জন্মভূমিতে মুখ থুবড়ে পড়ে। যে সময় ধরে এ সভ্যতাটি টিকে ছিল বলে যে দাবি করা হয়, আসলে তাকে টিকে থাকা না বলে কৃত্রিমভাবে টিকিয়ে রাখার একটা হাস্যকর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে, এমনটা বলা উচিত।

কোটি কোটি মানব সন্তানকে হত্যা করে, নিজেদের ভিটে-মাটি থেকে উচ্ছেদ করে, উদ্বাস্তু বানিয়ে এক মহাসাগর পরিমাণ ঘাম, রক্ত আর অশ্রুর সাগরে তৈরি নতুন এই আদর্শের অনিবার্যভাবেই ভরাডুবি ঘটেছে। ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের পর থেকে সত্তর বছর ধরে কমিউনিস্ট সভ্যতা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চলেছিল। এই পুরো সময়টা কমিউনিস্ট সভ্যতা প্রতিষ্ঠাকারীদের জন্য এক ভয়ংকর ক্রান্তিকাল ছিল। এটা ছিল তাদের চিন্তা-চেতনার অন্তঃসারশূন্যতা এবং নিজেদের ব্যর্থতা উপলব্ধির সময়কাল।

সমগ্র বিশ্বের বিদগ্ধ জ্ঞানী, গুণী ও সুধীজন চিৎকার করে সাবধান করে দেওয়া সত্ত্বেও উদ্যোগ গ্রহণকারী মহারথীদের তাদের আদর্শের ত্রুটি উপলব্ধি করতে সময় লেগেছে সত্তরটি বছর! ধর্ম ছাড়া কোনো সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না; এক সময় এই মহাসত্যটি তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। আর এর সাথে সাথে তারা স্বেচ্ছায় ও স্বপ্রণোদিতভাবে কমিউনিজম নামের তথাকথিত আদর্শকে একরাশ ঘৃণা আর অবজ্ঞার নিয়ে ভলগায় ডুবিয়েছে! এভাবেই স্বতঃসিদ্ধ এ ধারণাটি আরও একবার প্রমাণিত হয়েছে, 'ধর্ম-দর্শন ছাড়া কোনো সভ্যতা গড়ে ওঠে না, সভ্যতা টিকে থাকতে পারে না। ধর্ম হচ্ছে সভ্যতার উন্নয়ন ও গঠনে অনিবার্য এক উপাদান।'

ভাষা

ভাষা হচ্ছে সভ্যতার উন্নয়নে দ্বিতীয় অপরিহার্য অনুসঙ্গ। ভাষা মানুষকে তার মনের ভাব, কষ্ট, সুখ-দুঃখ, চাওয়া-পাওয়া, প্রয়োজন ও আবেগ-অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। পৃথিবীতে এমন একটা দিন যায়নি, যেদিন মানুষ তার মনের ভাব ও অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে কোনো ভাষার সাহায্য নেয়নি।

একটি জনগোষ্ঠী তাদের একই সাংস্কৃতিক বলয়ের মধ্যে নিজেদের ভাবের পরস্পর আদান-প্রদানের লক্ষ্যে স্বরভিত্তিক কিছু শব্দকে নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। এর ব্যাখ্যা তারা নিজেরাই করেছে এবং সেই ব্যাখ্যার ব্যাপারে ঐক্যমতও তৈরি করে নিয়েছে। আর সেটাকেই তারা নিজেদের ভাব ও অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। এটিই হলো তাদের ভাষা, এভাবেই ভাষা গঠিত হয়েছে।

মানুষ তাদের আবেগ অনুভূতি ও মননশীলতা দিয়ে যা ভাবে, তা তাদের এই স্বনির্ধারিত ভাষা দিয়েই প্রকাশ করে। স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় ভাষার তারতম্য ঘটেছে। এর ধরন, গঠন ও ব্যবহারের বৈচিত্র্যতা এসেছে। আজ এই আধুনিক যুগেও আমরা চারপাশে ছোটো-বড়ো হাজারো ভাষার অস্তিত্ব দেখতে পাই। একটি সভ্যতার অঙ্গনে বেড়ে উঠা মানুষ এক বা একাধিক ভাষার সাহায্যেই তাদের মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। ভাষার মাধ্যমেই তারা নিজেদের প্রয়োজন তুলে ধরে, উদ্ভূত সমস্যা এবং তার সমাধান ব্যক্ত করে।

এই ভাষার মাধ্যমেই মানুষ নিজেদের এবং অন্য সকলের জন্য কল্যাণ বোঝে-বোঝায়, সমস্যার সমাধান খোঁজে-খোঁজায়। চোখ বন্ধ করে কল্পনা করে দেখুন, একটি সভ্যতার আওতায় বসবাসকারী সকল সদস্যরা যদি ভাষাহীন অর্থাৎ বোবা হয়, তাহলে সেই সমাজ ও সভ্যতার রূপ কেমন হতে পারে? পৃথিবীতে সেই সভ্যতা কদিনই-বা টিকে থাকতে পারে? এক প্রজন্ম হতে অন্য প্রজন্মে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য স্থানান্তর করার মাধ্যম কেবল এই ভাষা। মনুষ্য বংশধরদের এক প্রজন্ম হতে পরবর্তী প্রজন্ম পর্যন্ত জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সংস্কৃতি সঞ্চালনের মাধ্যমই যদি না থাকে, তবে সভ্যতা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বড়োজোড় একটি প্রজন্ম পর্যন্ত টিকে থাকলেও থাকতে পারে। কিন্তু তারপরই তা মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য।

মানুষের নিজস্ব বিচার-বুদ্ধি, ক্ষমতা, বিবেক এবং অনুসন্ধিৎসু প্রবণতার কারণে সে যেকোনো বিষয়ের গভীরে যেতে পারে। অজানাকে জানার আগ্রহ মানুষের এক অতি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এটা তার মানবীয় সত্তার সঙ্গে জন্মলগ্ন থেকেই মিশে থাকে। সে প্রতিদিন তার জীবন থেকে শেখে। শেখে তার পারিপার্শ্বিকতা ও পরিবেশ থেকে। আর এসব অভিজ্ঞতা দিয়ে সে তার বিবেক-বুদ্ধিকে প্রতিনিয়তই সমৃদ্ধ করে। মানুষের আরেকটি স্বাভাবিক ও মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, সে তার অধঃস্তন বংশধরদের জন্য নিজের মনে আপনাআপনি এক ধরনের দায়িত্ববোধ অনুভব করে এবং তা স্বযত্নে লালনও করে থাকে। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কমবেশি এ বোধটুকুর অস্তিত্ব দেখতে পাওয়া যায়।

মানুষ নিজের জীবন থেকে প্রতিদিন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বা কোনো বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে তার প্রকৃতি, ব্যবহার, উপকার-অপকার সম্বন্ধে যে তত্ত্ব-তথ্য অর্জন করে, তা প্রকারান্তরে তার জ্ঞানকে আরও বেশি উন্নত করে। জীবনের প্রতিটি বাঁকে উদ্ভাবিত নিত্য নতুন সমস্যাকে সে প্রতিদিন বিভিন্ন পথ, পদ্ধতি ও দক্ষতার সাহায্যে মোকাবিলা করে এবং তার নতুন নতুন সমাধানও বের করে। নিজের বুদ্ধি-বিবেক ও বিচার ক্ষমতা দ্বারা এসব সমস্যা ও সমাধান বিশ্লেষণ করে তার গতি-প্রকৃতি ও পরিণাম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়। এভাবে জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি পদে পদে সে তার অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করে। একইসঙ্গে তার জ্ঞানের স্তরও ক্রমাগতভাবে পরবর্তী স্তরে উন্নীত হতে থাকে।

শিক্ষা

মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই আরও একটি বিশেষ মানবীয় প্রবৃত্তির উপস্থিতি বিরাজমান। তা হলো, পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার মানসিকতা। সে সহজেই অপরের সাফল্য, সমৃদ্ধি ও প্রাপ্তি দেখে ঈর্ষান্বিত হয় এবং সফলতা ও প্রাপ্তির মানদণ্ডে অন্যজনকে অতিক্রম করতে চায়। জ্ঞানপিপাসু মানুষের মনে এ ধরনের নিরন্তর প্রতিযোগিতার মানসিকতা তাকে জ্ঞান আহরণ, গবেষণা এবং আরও বেশি পরিমাণে জ্ঞান অর্জনের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রাখে। এ ক্ষেত্রে আরও বেশি সফলতার জন্য সে সর্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত থাকে। ফলে প্রতিদিনই কিছু লোকের জ্ঞানের জগৎ সমৃদ্ধ হতে থাকে।

এই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সে যদি শুধু নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে অথবা সভ্যতার অন্যান্য সদস্য কিংবা পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সঞ্চালন না করে, তবে সমাজ ও সভ্যতার জ্ঞানী-গুণীদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তির ক্ষেত্রে এক বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হবে। আর এর অনিবার্য পরিণতি হিসেবে অচিরেই সমাজে নেতৃত্বের ঘাটতি এবং আদর্শিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দেউলিয়াপনা দেখা দেবে। দেখা যাবে চিন্তার জগতে অস্থিতিশীলতা ও নৈরাজ্য। ফলে খুব শীঘ্রই সভ্যতার অস্তিত্বে ভাঙনের সূচনা ঘটবে। এ সভ্যতা তার নিজস্ব স্বকীয়তা বজায় রেখে কিছুতেই টিকে থাকতে পারবে না; বরং সে পার্শ্ববর্তী অপেক্ষাকৃত উন্নত কোনো সভ্যতার নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে। ইতিহাসের প্রচণ্ড প্রতাপশালী পারস্য সভ্যতা ও রোমান সভ্যতার অন্যান্য অনেক দুর্বলতার মধ্যে এই দুর্বলতাও প্রকট ছিল। ফলে তারা তাদের নিকটবর্তী সুমহান ইসলামি আদর্শের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভেঙে পড়ে। কোনো ধরনের প্রতিরোধ প্রচেষ্টাই এ দুটো বিশাল ঐতিহ্যবাহী সভ্যতার পতন ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি।

এ পরিণতি থেকে রক্ষা করে একটি সভ্যতার প্রাণশক্তির ক্রমাগত উত্তরণ ঘটাতে হলে নিজস্ব শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা কার্যক্রম থাকা আবশ্যক। যে কার্যক্রম ও কর্মসূচির মাধ্যমে সভ্যতার একটা অংশ তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সূচারুরূপে সংরক্ষণ এবং তাদের নিকট পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। অতএব, শিক্ষা হলো সভ্যতার উন্নয়নের জন্য তৃতীয় অপরিহার্য শর্ত।

প্রশিক্ষণ

ব্যাপক বিশ্লেষণ ও গবেষণার পর অর্জিত হয় শিক্ষা; যা বহু সময়, মেধা ও শ্রমলব্ধ অভিজ্ঞতার একটা অংশ। এই শিক্ষা নিজের ও সমাজের অন্যান্য সদস্যদের নিকট ভাষা ও বিভিন্ন প্রকাশ মাধ্যমের সাহায্য নিয়ে পৌঁছে দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমাজের সদস্যদের সম্পৃক্ত করার জন্য শুধু ভাষা ও শিক্ষার উপায়-উপকরণই যথেষ্ট নয়। কারণ, শিক্ষা থেকে উপকৃত হয়ে যথাযথভাবে সুফল অর্জন করতে হলে অবশ্যই তার প্রায়োগিক পদ্ধতির সঙ্গেও একীভূত হতে হবে। একটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টিকে আরও সহজবোধ্য করা যেতে পারে।

কমপিউটার বিজ্ঞানে অধ্যায়নরত একজন ছাত্রকে কমপিউটার আবিষ্কারের ইতিহাস, এর গঠন, ব্যবহার পদ্ধতি ও উপকারিতা সম্বন্ধে পুঁথিগত জ্ঞান দিয়ে তাকে কমপিউটার সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ বানিয়ে দেওয়া যায়। এতে হয়তো সে পুঁথিগত জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠবে সত্য, কিন্তু বাস্তবে সে কখনোই কমপিউটার বিষয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হিসেবে গড়ে উঠবে না। তার পুঁথিগত জ্ঞানের যথাযথ ও সঠিক ব্যবহার তখনই সম্ভব, যখন সে বাস্তবে কমপিউটার নামের একটি যন্ত্র নিজ হাতে ব্যবহার করবে এবং এর ব্যবহার দেখানো হবে। একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে রেখে তার অর্জিত পুঁথিগত জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগের কলাকৌশল যথাযথ নির্দেশনা ও পরামর্শ সহকারে দেখিয়ে দেওয়া হবে। তখনই কেবল সে তার অর্জিত পুঁথিগত বিদ্যা এবং ব্যবহারিক প্রয়োগ দ্বারা অর্জিত অভিজ্ঞতার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে একজন সত্যিকার কমপিউটার বিশেষজ্ঞ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারবে।

ব্যবহারিক প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো বিষয়ে অর্জিত শিক্ষাকে পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীনে নেওয়ার যে প্রক্রিয়া তার নামই প্রশিক্ষণ। আমরা আরও সহজ করে বলতে পারি, অর্জিত জ্ঞানের ওপর শিক্ষার্থীর পূর্ণ ও স্থায়ী দক্ষতা নিশ্চিত করতে পুঁথিগত বিদ্যাকে বাস্তবে প্রয়োগের যে কৌশল; তাই হলো প্রশিক্ষণ।

প্রশিক্ষণ ছাড়া কোনো শিক্ষাই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। সেই শিক্ষা থেকে প্রত্যাশিত ফলাফলও অর্জন করা যায় না। তাই দেখা যায়, বাস্তবে একজন চিকিৎসককে দীর্ঘ পাঁচ বছর মেডিকেল কলেজের ক্লাসরুম ও প্রাকটিক্যাল রুমে রোগ ও চিকিৎসার প্রায় প্রতিটি শাখায় জ্ঞান দেওয়া হয়। এরপরেও তার অর্জিত ওইসব জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনের জন্য নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ নিতে হয়। এ সময়ে ওই চিকিৎসক চিকিৎসাশাস্ত্রে তার এত দিনের অর্জিত জ্ঞান একজন অভিজ্ঞ, দক্ষ ও সিনিয়র চিকিৎসকের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে থেকে বাস্তবে প্রয়োগ করেন। এতে করে তিনি তার অর্জিত জ্ঞানের ফলাফল (outcome) বাস্তবে উপলব্ধি করেন এবং নিজের ভুলভ্রান্তিকেও চিহ্নিত করতে পারেন।

এভাবেই ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তার অর্জিত পুঁথিগত জ্ঞান ধীরে ধীরে একটা উন্নত ও কার্যকর স্তরের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। প্রশিক্ষণ দ্বারা একজন প্রশিক্ষণার্থী মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করে থাকে। এই অভিজ্ঞতা একজন জ্ঞানীর অর্জিত জ্ঞানের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের পূর্বশর্ত। ইসলামের শিক্ষাও সেটাই। সূরা তাওবার ১২২ নম্বর আয়াতে খোদ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজেই বলেছেন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য বের হয়ে যেতে।

প্রশিক্ষণ ছাড়া কখনো একটি দক্ষ ও শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করা সম্ভব না; এমনকী কল্পনাও করা যায় না। তাই সমাজ ও সভ্যতা নির্মাণে সভ্যতার প্রতিটি সদস্যকে নিজেদের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে পরবর্তী প্রজন্মের মাঝে বিলাতে হবে। সেইসঙ্গে পূর্বসূরিদের নিকট থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে কীভাবে নিজেদের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে ব্যবহার ও সংরক্ষণ করতে হয় সেটিও শিখিয়ে দিতে হবে। ঠিক যেভাবে পিতা তার শিশুসন্তানের কচি দুটো হাত ধরে হাঁটি হাঁটি পা পা করে হাঁটার প্রশিক্ষণ দেন।

সমাজ-সভ্যতার উন্নয়নের স্বার্থে শিক্ষা কার্যক্রমকে বাস্তবে সকল সদস্যদের মধ্যে বিস্তৃত করে সঠিক দিক-নির্দেশনা ও অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য অবশ্যই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রশিক্ষণ হচ্ছে কোনো বিশেষ জ্ঞানকে ত্রুটিমুক্তভাবে ব্যবহার ও বাস্তবে প্রয়োগ করতে শেখার নাম। আর এই প্রশিক্ষণ সভ্যতার উন্নয়নের চতুর্থ মৌলিক উপাদান।

সভ্যতার স্থায়িত্ব

বিশ্ব তার ইতিহাসে শত শত সভ্যতার উত্থান ও পতন দেখেছে। প্রতিটি সভ্যতাই একটা নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য হলেও ইতিহাসে নিজেদের সরব উপস্থিতি জানান দিয়েছিল। কিন্তু একটা সময় পরে সেগুলো আর আসল রূপে টিকে থাকতে পারেনি। কোনো কোনো সভ্যতার নাম-নিশানা ইতিহাস থেকে মুছে গেছে।

সভ্যতার গঠন ও উন্নয়নের জন্য কিছু কার্যকারণের উপস্থিতির পাশাপাশি তার স্থায়িত্বের জন্যও কিছু কার্যকারণের অবশ্যই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই কার্যকারণসমূহ ছাড়া একটি সভ্যতা মানব সমাজে স্থায়িত্ব পেতে পারে না; এমনকী কালোত্তীর্ণও হতে পারে না। কালোত্তীর্ণ সভ্যতার জন্য যেসব মৌলিক কার্যকারণগুলি প্রয়োজন। তা হলো-

স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় বিধিবিধান

একটি স্থায়ী সভ্যতার আদর্শ বা বিধিবিধান অবশ্যই সকল প্রকার ত্রুটি, অপূর্ণতা ও দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকতে হবে। এসব বিধিবিধান স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় হবে। ধনী-গরিব, ছোটো-বড়ো, সাদা-কালো নির্বিশেষে সকলের জন্য সর্বাবস্থায় একই রকম, অপরিবর্তণীয় ও অলঙ্ঘনীয় হিসেবে বিবেচিত হবে। পূর্বে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে, জলে-স্থলে, রাতে-দিনে, প্রকাশ্যে-গোপনে পৃথিবীর সব জায়গায় সব পরিবেশে একই রকম ও অপরিবতির্ত থাকবে। কোনো রকম ছোটো-বড়ো ঘটনা বা দুর্ঘটনা দ্বারা কখনোই প্রভাবিত হবে না। পৃথিবীর সূচনালগ্নে যেসব বিধিবিধান মানব সভ্যতার জন্য উপকারী ও প্রয়োজনীয় বলে নির্ধারিত হয়েছিল, কোটি বছর পরে, এমনকী পৃথিবী ধ্বংসকালীন সময়েও তা একই রকম উপকারী ও প্রয়োজনীয় বলেই নির্ধারিত থাকবে।

জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির নামে, যুগের পরিবর্তনের নামে, দেশ-কালের উত্থান-পতনের নামে এসব বিধিবিধান পুরোনো, পরিত্যাজ্য ও পরিবর্তশীল বলে বিবেচিত হবে না। একটি দেশ, জাতি, সভ্যতার সকল সদস্য যদি একমত হয়ে কোনো কর্মকাণ্ডকে তাদের জন্য উপকারী বলে নির্ধারণ করে নেয়; অথচ তা মানবপ্রকৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক, তবে তা শুধু সংখ্যাধিক্য জনগণের সমর্থনের কারণে মানবতার জন্য উপকারী বিধান বলে বিবেচিত হবে না। যেমনটি ইউরোপ-আমেরিকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থনের ভিত্তিতে অবাধ যৌনাচার (Free Mixing, Free Sex) ও সমকামিতাকে বৈধ ও গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষিত হয়েছে। সংখ্যগরিষ্ঠের সমর্থন সত্ত্বেও সভ্যতার জন্য এগুলো গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। এসব বিধিবিধানগুলো হবে অপরিবর্তনীয়, অলঙ্ঘনীয় ও স্থায়ী।

এ স্থায়ী বিধিবিধানের আবার দুটো মৌলিক বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে।

প্রথমটি হলো, এসব বিধিবিধান ও নিয়ম-কানুন সাধারণ ও সহজ ভাবধারার হবে। সময়ের বিবর্তনে সামাজিক, পারিপার্শ্বিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক নতুন সমস্যা ও প্রয়োজনে এসব বিধিবিধানের মৌলিক দর্শন ও শিক্ষার সঙ্গে সংগতি রেখে সমাধান করা যাবে। নিয়ত পরিবর্তনশীল বিশ্বে উদ্ভূত যেকোনো সমস্যা সমাধানে এসব বিধিবিধান কার্যকর ও ফলপ্রসু হবে। যার ফলে সমাজ ও সভ্যতা সভ্যতার আওতাধীন মানুষের জীবনমানের বিকাশ ও অগ্রগতি হবে বাধাহীনভাবে। সময় ও কালের কোনো পর্যায়েই এসে যেন এমন না হয় যে, সমাজ সভ্যতা তার প্রয়োজনীয় মুহূর্তে এসব বিধিবিধান থেকে পথনির্দেশ পাচ্ছে না। সামাজিক সমস্যা ও প্রয়োজন যতই জটিলতা ও বৈচিত্র্যতা লাভ করুক না কেন, সব ক্ষেত্রে এসব বিধিবিধান অতি সহজেই ব্যক্তি বা সমাজকে পথনির্দেশ করতে পারবে।

দ্বিতীয়টি হলো, এসব বিধিবিধানের মান এতটা উন্নত হবে যে, জীবনের কোনো স্তরে এসে এগুলোকে পুরোনো, সেকেলে ও একঘেঁয়ে বলে মনে হবে না। সর্বাবস্থায় এসব বিধিবিধান সমাজ-সভ্যতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারবে। সমাজ ও মানুষের জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধি ও সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। এসব বিধিবিধান যুগের চাহিদা মেটানোর মতো প্রাণশক্তি তার নিজের মধ্য থেকেই পাবে। কখনোই অন্য কোনো বিধিবিধান থেকে ধার নেওয়ার প্রয়োজন পড়বে না। সভ্যতার প্রতিটি বাঁকে, বিবর্তনের প্রতিটি স্তরে এসব বিধিবিধানকে মনে হবে সম্পূর্ণ নতুন, পূর্ণমাত্রায় কর্মক্ষম।

সর্বজনীন জীবনদর্শন এবং বৃহত্তম ঐক্য

কোনো সভ্যতার স্থায়িত্ব সেই সভ্যতার মতবাদ, দর্শন, চিন্তাধারার উদারতা ও সর্বজনীনতার ওপর নির্ভর করে। কোনো আদর্শের এতটা উদার হওয়া প্রয়োজন যে, তা বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে ধর্ম-বর্ণ-গোত্র, স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে এক ও অভিন্ন মনে করবে। তার সকল কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য হবে মানবতার কল্যাণ। মানুষের পার্থিব ও পারলৌকিক সকল প্রয়োজন পূরণকে কেন্দ্র করে এসব কর্মকাণ্ড আবর্তিত হবে। এসব ধ্যানধারণা ও মতবাদ যাবতীয় মানবীয় দুর্বলতা, ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতা হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হবে। সভ্যতার মৌল দর্শন হবে সকল প্রকার দুর্বলতা, অপূর্ণতা ও ত্রুটি থেকে মুক্ত।

মানুষ তার শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে দক্ষতার যতই উন্নতর স্তরে উত্তীর্ণ হোক না কেন, সে কখনোই সকল প্রকার দুর্বলতা ও অক্ষমতাকে কাটিয়ে উঠতে পারে না। তাই তার দ্বারা যদি কোনো মতবাদ রচিত হয়, তবে সেই মতবাদ অবশ্যই রচয়িতার মৌলিক দুর্বলতা, অক্ষমতাসহ ত্রুটিযুক্ত হয়েই গড়ে উঠবে এবং তার ত্রুটিগুলোকে ধারণ করবে। এই জন্যই মানুষের তৈরি সমস্ত মতবাদ স্থান-কাল-পাত্র ও পরিবেশের তারতম্যভেদে অচল ও অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাই এই মতবাদের সংশোধন, সংযোজন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন জরুরি হয়ে পড়ে।

সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের আরেকটি দুর্বলতা। মানুষ সকল ক্ষেত্রে, সর্বপ্রথম নিজের ব্যক্তি স্বার্থের বা গোষ্ঠী স্বার্থের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়। তার দ্বারা পরিচালিত ও সম্পাদিত যেকোনো কর্মকাণ্ডের বাহ্যিক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যাই হোক না কেন, তার মূল উদ্দেশ্য হয় নিজের বা গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করা। স্বার্থ রক্ষার এই ধ্যানধারণা তার মন-মগজকে এতটাই আচ্ছন্ন করে রাখে যে, সে এই গণ্ডির বাইরে বের হতে পারে না। তাই সে হর-হামেশাই নিজের স্বার্থ রক্ষা করে চলার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকে। তার এ প্রচেষ্টার প্রক্রিয়ায় যদি অপর কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠীর স্বার্থহানী হয়, তাতেও সে ভ্রুক্ষেপ করে না। তাই মানুষের তৈরি মতবাদ মৌলিক ও প্রকৃতিগত এই দুর্বলতাকে অতিক্রম করতে পারে না।

এ ধরনের অপূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ মতবাদ বা দর্শন পৃথিবীতে হয়তো কিছু সময়ের জন্য বিশেষ কোনো দেশ বা স্থানের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। ওই সময়ের বিশেষ গোষ্ঠীর কিছু স্বার্থকে রক্ষা করে। কিন্তু সেটা বিশ্বের সকল মানুষের জন্য সর্বজনীনভাবে সব সময়ে সমানভাবে কার্যকর ও উপযোগী বলে বিবেচিত হতে পারে না। এ আদর্শ যেহেতু মানবীয় দুর্বলতাকে অতিক্রম করতে পারে না,

তাই এ মতবাদের দৃষ্টিসীমায় সকল মানুষের সার্বিক কল্যাণের দিকটি উহ্য থেকে যায়। এই মতবাদ মানব সভ্যতার সকল সদস্যের জন্যে নয়; বরং তাদের নির্দিষ্ট একটি অংশের জন্য। এ মতবাদ বিশ্বের সকল কালের জন্য নয়; বরং একটি নির্দিষ্ট সময়কালের জন্যে।

একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে, মানুষের রচিত বিধিবিধান, দর্শন-মতবাদ কখনোই সর্বজনীন হতে পারে না। মনুষ্য রচিত এ মতবাদ একইসঙ্গে গোটা বিশ্ব মানবতার কাছে নিজের স্বার্থরক্ষার মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না। একেক গোষ্ঠীর স্বার্থ একেক রকম। এখানে এক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষার জন্য অপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থকে পদদলিত করা হয়। একটি গোষ্ঠীকে তার প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ সরবরাহ করতে গিয়ে অপর গোষ্ঠীর সদস্যদেরকে বঞ্চিত করা হয়। মানুষের দ্বারা তৈরি এ মতবাদ ও দর্শনকে বিশ্বের সকল গোষ্ঠী একইসঙ্গে মেনে নিতে চায় না। একটি নির্দিষ্ট ধ্যানধারণাকে নিজেদের জন্য উপযোগী বলে মেনে নেওয়া ব্যক্তিবর্গ তাদের আদর্শ ও চিন্তাধারা এমন ব্যক্তিদের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়, যারা আদৌ তা মেনে নিতে চায় না।

অপরদিকে যারা নিজেদের স্বার্থহানীর সম্ভাবনা দেখে বা স্বার্থরক্ষার নিশ্চয়তা পায় না এবং নিজেদের বোধ-বিশ্বাসের সঙ্গে এর কোনো সঙ্গতি পায় না, তারা প্রতিনিয়তই এ মতবাদকে নিজেদের জীবন ও সমাজ থেকে দূরে রাখার কাজে ব্যস্ত থাকে।

পরস্পরবিরোধী ও বিপরীতমুখী এ দুটো ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু থাকে। একইসঙ্গে তা সমাজে বসবাসকারী মানুষের মধ্যে বিভেদের সূত্রপাত ঘটায়, যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে মানুষের মাঝে বৃহত্তম ঐক্য গড়ে উঠতে পারে না।

যদি এমন হয় যে, মানুষ এমন একটা দর্শন বা মতবাদের সন্ধান পেয়ে গেল, যা তাদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক প্রয়োজন পূরণে পূর্ণ সক্ষম। একজনের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে অন্যজনকে বঞ্চিত করতে হয় না। সকলেরই চাহিদা মেটানোর ক্ষমতা এই মতবাদ ধারণ করে। যেখানে বিশ্বের কোনো বিশেষ দেশ বা নাগরিকের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিতে গিয়ে অন্যের নিরাপত্তায় বাধা সৃষ্টি করে না। যেখানে নারী-পুরুষ, যুবক-শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বিজ্ঞ-অজ্ঞ, ধনী-গরিব, সাদা-কালো নির্বিশেষে সকলেরই মৌলিক চাহিদা পূরণের নিশ্চিত গ্যারান্টি আছে। কিন্তু এজন্য কারও অধীন বা পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হওয়ার শঙ্কা নেই। তাহলে এর ফল হিসেবে অনিবার্যভাবে যা হবে তা হলো, এই আদর্শ বা মতবাদ বিশ্বের সকল মানুষের কাছে সর্বজনীনতা পাবে। সকলের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

এবং তা অর্জনের পথ-পদ্ধতি একই রকম হবে। ফলে তাদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির মূল কারণগুলো দূরীভূত হয়ে বৃহত্তম ঐক্য গড়ে উঠবে। এমন একটি সমাজ, সভ্যতা প্রতিটি মানুষের কাছে মহা মূল্যবান বলে মনে হবে। তারা এ মতবাদকে পরম কাঙ্ক্ষিত বিবেচনা করবে। এর রক্ষণাবেক্ষণে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রম, মেধা ও সম্পদ নিয়োগ করবে এবং সর্বপ্রকার ত্যাগ-তিতিক্ষাকে মেনে নেবে। ফলে দেখা যাবে সভ্যতা বিধ্বংসী সকল কারণগুলো দূরীভূত হয়ে যাচ্ছে। এ রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সভ্যতা স্থায়িত্ব লাভ করতে পারবে। তাই সভ্যতার স্থায়িত্বের জন্য উদার, সর্বজনীন জীবনদর্শন এবং বৃহত্তম ঐক্য গুরত্বপূর্ণ একটি উপাদান।

মানবহিতৈষী ধ্যানধারণা

এ পৃথিবীতে আজ অবধি সবগুলো সভ্যতা ধ্বংসের জানা-অজানা কারণ যা-ই হোক না কেন, মানুষের দ্বারাই ধ্বংস প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। মানুষই নিজের সভ্যতাকে ধ্বংস করেছে। নিজের মন-মগজে লালিত চিন্তা-চেতনা, বোধ-বিশ্বাস দ্বারা প্রভাভিত হয়ে অপর মানুষকে ধ্বংস করেছে; নয়তো ধ্বংস প্রক্রিয়ার সূত্রপাত করেছে।

এগুলো এ জন্যই হয়েছে যে, মানুষ যেসব চিন্তা-চেতনা দ্বারা তাড়িত ও চালিত হয়েছে, সেই চিন্তা-চেতনা ও দর্শনের শিক্ষা উন্নত ও মানবহিতৈষী ধ্যানধারণাকে ধারণ করেনি। সে নিজেকে তার পারিপার্শ্বিক সমাজের মানুষের চেয়ে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ ভেবেছে। তার নিজের স্বার্থ ও নিরাপত্তাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছে, কিন্তু প্রতিবেশীর স্বার্থ ও নিরাপত্তাকে ভেবেছে মূল্যহীন। নিজেকে মানুষ হিসেবে যতটা শ্রেষ্ঠ ভেবেছে, অপরকে ততটাই নিকৃষ্ট ভেবেছে। গোষ্ঠী বা জাতীয়তাবাদী এ ধারণা কখন, কীভাবে, কার দ্বারা ঘটল, সে আলোচনা এখানে অবান্তর। কিন্তু এই ধ্যানধারণা, চিন্তা-চেতনা, মানুষের জীবনের সকল সুখ-শান্তি এবং নিরাপত্তাকে ভেঙে খান খান করে দিয়েছে। তাকে দুর্দশার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করেছে। পরিণামে নিজের ও পারিপার্শ্বিক সমাজ তথা পুরো সভ্যতার ধ্বংস ডেকে এনেছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী, সম্পদ ও জীবননাশী যুদ্ধটি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ; যা জার্মানির হিটলার কর্তৃক ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল। এ যুদ্ধে প্রাণ হারায় সর্বমোট তিন কোটি পঞ্চাশ লাখ মানবসন্তান। ফ্যাসিস্ট হিটলার তার জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারায় জার্মানিকে বিশ্বের অন্য সকল জাতিগোষ্ঠীর ওপর শ্রেষ্ঠ ভাবতেন।

তিনি ভাবতেন, কেবল জার্মান জাতিরই অধিকার আছে বিশ্বকে শাসন করার। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় L.K. Mukharjee-এর লেখায়। তিনি লিখেছেন-

> 'The Nazis Were Motivated by their Philosophy of their Master Race and so looked upon themselves as man of superior type'. অর্থাৎ 'নাৎসিগণ প্রভু জাতি সম্পকির্ত ধ্যানধারণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিল। তাই নিজেদেরকে তারা শ্রেষ্ঠতর মানুষ হিসেবে গণ্য করত।'[২]

অপরের ওপর নিজের এই শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা মানুষকে দাম্ভিক ও অহংকারী করে তোলে। ফলে তার দ্বারা অপরের মান-সম্মান ও জীবনের নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটানো অবশম্ভাবী হয়ে পড়ে। তাই এ ধরনের অহংকারী, গর্বিত ও দাম্ভিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠী দ্বারা পৃথিবীতে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয়েছে। মানুষে মানুষে হিংসা, বিদ্বেষ ভেদাভেদ বেড়েছে। একে অপরকে ধ্বংসের নেশায় মেতেছে। ফলে সভ্যতা, সমাজ অনৈক্যের কারণে নিজ থেকেই ভেঙে পড়েছে। এভাবে পৃথিবীতে সভ্যতার পর সভ্যতা ধ্বংস হয়েছে। কোনো সভ্যতাই স্থায়িত্ব পায়নি; চিরস্থায়ী হয়নি।

একটা দেশ, সমাজ বা সভ্যতার অধিকাংশ মানুষের মধ্যে যদি অপরের প্রতি ভালোবাসা, প্রেম ও দয়ার অনুভূতি থাকে এবং তা যদি তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতি ও বোধ-বিশ্বাসের অংশ হিসেবে পরিণত হয়; তবে সেখানে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ জন্ম নেবে। তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে একে অপরের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী এবং বিপদের বন্ধু হবে। নিজেদের সকল যোগ্যতা উপায়-উপকরণসহ সম্ভাব্য সকল পন্থায় বিশ্ব মানবতার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবে। অন্যের মান-সম্মান, সম্পদ ও জীবনকে নিজেদের মান-সম্মান, সম্পদ ও জীবনের মতোই মহার্ঘ বলে মনে করবে। ধর্ম-বর্ণ-গোত্র, স্থান-কাল-পাত্র নির্বিশেষে সভ্যতার কোনো সদস্যই তখন নিজেদেরকে শঙ্কাগ্রস্থ মনে করবে না। এ ক্ষেত্রে গোটা মানবতা একটি অখণ্ড অঙ্গ বা পরিবারের মতো প্রেম ও ভালোবাসার চেতনায় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

তাই যে আদর্শ ও মতবাদকে ভিত্তি করে একটি সভ্যতা বা সমাজের গোড়াপত্তন হয়, তাতে যদি মানবহিতৈষী ধ্যানধারণার উপস্থিতি থাকে, তবে নিঃসন্দেহে সেই আদর্শের শিক্ষায় গড়ে উঠা মানুষের মনে বিশ্বমানবতার জন্য কল্যাণকর ও উন্নত মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনা গড়ে উঠবে। অতীতে ধ্বংসপ্রাপ্ত, উন্নত ও ইতিহাসখ্যাত সভ্যতার কথা আমরা জানি। তাদের আদর্শ ও মতবাদে ক্রমান্বয়ে মানবহিতৈষী ধ্যানধারণা লোপ পাওয়ার কারণে সেখানে জুলুম-নির্যাতন, অত্যাচার ও নিপীড়নের বিস্তৃতি ঘটে এবং দুঃস্থ মানবতার সংখ্যা সমাজে বৃদ্ধি পায়। ফলে তাদের বহু দিনের শ্রমে গড়া সভ্যতা শেষ পর্যন্ত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

উন্নত নৈতিক আচরণবিধি

নৈতিকতা হলো কিছু নিয়ম-নীতির সমষ্টি। এমন কিছু নিয়ম-নীতি, যার মাধ্যমে মানুষ নিজের ধ্যানধারণা, শিক্ষা-দীক্ষা, বোধ-বিশ্বাসকে বাস্তবে রূপদান করে থাকে। নৈতিকতা হলো সেই মানদণ্ডের নাম, যার দ্বারা ন্যায়কে ন্যায় ও অন্যায়কে অন্যায় হিসেবে; ভালোকে ভালোর স্থানে, আর মন্দকে মন্দের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এই নৈতিকতা উন্নত বা অনুন্নত যেকোনো ধরনেরই হতে পারে। এ বিশ্ব বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ ও সমাজে নৈতিকতার নানান রকমের সংজ্ঞা ধরন ও রূপ দেখেছে। উন্নত বা অনুন্নত উভয় ধরনের নৈতিকতারই সে সাক্ষী হয়েছে।

মানবীয় চরিত্রের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষ তার সকল কর্মকাণ্ডের নগদ ও তাৎক্ষণিক সুবিধা প্রত্যাশা করে। সকল প্রচেষ্টার ফল সে জীবদ্দশাতেই পেতে চায়। তা সে যে ধরনেরই হোক না কেন। নৈতিকতা হলো এমন এক শক্তি, যা তার এই মৌলিক প্রবৃত্তি ও আকাঙ্ক্ষা পূরণকে বৈধ কিংবা অবৈধ নির্দেশ করে। তার বৈধ-অবৈধ সীমারেখার মধ্যে নিয়ন্ত্রণ রাখে এবং মুখে লাগাম দেয়।

একটি পশু যেহেতু নৈতিকতা-অনৈতিকতা বোঝে না, তার সংজ্ঞাও জানে না; তাই সে পথ চলতে সুযোগ পাওয়া মাত্রই নাগালের মধ্যে যে ফসলেই পায়, মাথা মুড়ে খেয়ে ফেলে। তাই পশুর মালিক তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তার মুখে লাগাম পরিয়ে দেয়। তেমনি নৈতিকতা হলো মানুষের জন্য সেই লাগাম, যা তার মনের পাশবিকবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ এই পাশবিকবৃত্তিকে তার চরিত্র থেকে একেবারে দূর করে ফেলতে পারে না। তাকে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় রাখে মাত্র। তার এই নিয়ন্ত্রণের অস্ত্রই হলো নৈতিকতা। এই নৈতিকতার শিক্ষা যদি উন্নত হয়, তবে তার দ্বারা মানুষের সকল পাশবিকবৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। সেইসঙ্গে তাৎক্ষণিক পার্থিব ভোগ-বিলাসের ক্ষুদ্র স্বার্থের পরিবর্তে উন্নত ও দূরবর্তী মহান লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করা যায়।

যে নৈতিকতা তাৎক্ষণিক পার্থিব সুবিধা কামনা করে না, হিংসা-বিদ্বেষের বিপরীতে মানুষের মধ্যে ভালোবাসা ছড়িয়ে দেয়, বিশ্বমানবতাকে ভালোবাসতে এবং তার কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করতে শেখায়, সেই নৈতিকতাই কেবল সভ্যতার সুফল বয়ে আনতে পারে। খুলে দিতে পারে উন্নতি ও প্রগতির প্রশস্ত দুয়ার। এ ধরনের নৈতিকতার মূল কথা হলো; এক উন্নত, চিরন্তন ও অবিনশ্বর সত্তার সন্তোষ অর্জন। এ বিশ্বাস মানুষকে পরকালমুখী করে তোলে। সেইসঙ্গে মৃত্যুতেই যে জীবনের শেষ নয়; বরং এর মধ্য দিয়ে নতুন এক অনন্ত জীবনের সূত্রপাত ঘটবে- এ কথা তার অন্তরে বদ্ধমূল করে দেয়।

তাকে উন্নত আদর্শ ও জীবন পরিচালনার মাধ্যমে এক মহান সত্তার সন্তোষ অর্জনের জন্য সংগ্রাম করতে শেখায়। এটাই হলো উন্নত নৈতিক বিধিবিধানের অনিবার্য ফলাফল। এই বিশ্বাস ছাড়া নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন ও পরিচালনা কখনো সম্ভব হতে পারে না।

এই নৈতিকতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কী? মানুষ কি উন্নত নৈতিকতার মানদণ্ড নির্ধারণ করতে পারে? আমরা যদি খুব সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করে মানুষের প্রকৃতিগত দুর্বলতাগুলোকে দৃষ্টির আড়ালে যেতে না দিই, তবে এটা মেনে নিতে বাধ্য যে, মানুষ যত বড়ো, উন্নত জ্ঞানী-গুণী ও দক্ষই হোক না কেন, সে কখনোই নৈতিকতার মানদণ্ড নির্ধারণ করতে পারে না।

কারণ অনেক। তার মধ্যে অন্যতম মুখ্য কারণ হলো, মানুষ তার পারিপার্শ্বিকতা দ্বারা সর্বক্ষণ এত বেশি প্রভাবিত হয় যে, তার দ্বারা নৈতিকতার কোনো স্থায়ী মানদণ্ড নির্ধারণ সম্ভব নয়। আজকের বিশ্বই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রাচ্যের অধিকাংশ দেশসমূহে যেসব আচার-আচারণকে আমরা অনৈতিক জ্ঞান করি, সেই আচার-আচারণই পাশ্চাত্য দেশসমূহে বিনা দ্বিধায় তাদের প্রাত্যহিক জীবনে পালিত হচ্ছে। আমাদের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে আমরা বিবাহ বহির্ভূত যৌনতাকে ঘৃণার চোখে দেখে থাকি। কিন্তু পাশ্চাত্যের দেশসমূহে এ ধরনের মেলামেশা উভয়ের সম্মতিতে সংঘটিত হলে তা অনৈতিক হিসেবে বিবেচিত হয় না।

তাই মানুষ নৈতিকতার মানদণ্ড নির্ধারক হতে পারে না। এটা তার জন্মগত সীমাবদ্ধতা। এই মৌলিক সীমাবদ্ধতাকে সে কখনোই অতিক্রম করতে পারে না। নৈতিকতার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক হলো, সে কেবল তার ধারক, বাহক ও পালক। সে কোনোমতেই এর স্রষ্টা নয়, একটি সার্বভৌম শক্তি। অর্থাৎ যিনি ক্ষমতাবান, প্রকাশ্যে বা গোপনে সংঘটিত যেকোনো কাজের শাস্তি বা প্রতিদানের একচ্ছত্র ক্ষমতা যার হাতে, এমন শক্তিই কেবল এই নৈতিকতার সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারেন। এ শক্তি হবে সকল প্রকার দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা হতে মুক্ত। যেহেতু একটি উন্নত, নিরপেক্ষ ও চাহিদা হতে মুক্ত সত্তা দ্বারা এ নৈতিকতা নির্ধারণ হয়ে থাকে, তাই এখানে কোনো মানুষের প্রতিই বিন্দুমাত্র অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। একজন গরিব, অশিক্ষিত, দুঃস্থ মানুষের জন্য যা নৈতিক, ঠিক একজন সবল, ধনী, সমাজপতি, এমনকী রাষ্ট্রপতির জন্যও তা-ই নৈতিক বলে নির্ধারিত হবে। প্রথমজনের জন্য যা অনৈতিক, দ্বিতীয়জনের জন্যও সর্বাস্থায়ই তা অনৈতিক। এ ধরনের নৈতিকতাকে মেনে চলতে মানুষ সহজেই স্বতঃস্ফূর্ত হয়। এই বিবেচনায় নৈতিকতাকে কেবল ইসলামই পূর্ণতা দিয়ে ত্রুটিমুক্ত, উন্নত ও মহান করে তুলেছে।

সমাজে সাধারণত সমাজপতিরাই নিজেদের ক্ষমতার স্বার্থ রক্ষার জন্য নৈতিকতা ও বিধিবিধানের ক্ষেত্রে তারতম্যের সূত্রপাত ঘটিয়ে থাকে। এ ধারা একবার শুরু হলে, তা আর শেষ হতে চায় না; যতক্ষণ না সেই সভ্যতা ধ্বংস হয়! এ ধারার উপস্থিতি থাকলে সমাজে খুব দ্রুতই জাতিভেদ চালু হয়ে যায়। যেমনটা ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজে চালু আছে। যে সমাজে জাতিভেদ প্রথা চালু থাকে, সে সমাজের মানুষের মধ্যে কোনোভাবেই বৃহত্তর ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। অথচ এই ঐক্যই হলো একটি সভ্যতার স্থায়িত্বের জন্য প্রাণশক্তি। ঐক্য যখন ভেঙে পড়ে, সমাজ সভ্যতা তখন ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে এগোতে থাকে। অবশেষে তা একদিন তাসের ঘরের মতো ধ্বসে পড়ে। সভ্যতার স্থায়িত্ব, অমরত্বের জন্য অন্যতম শর্ত হলো; উন্নত নৈতিক আচরণবিধি।

বাস্তবভিত্তিক জীবনাচার

মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করে। তার দৈনন্দিন জীবনের কাজ-কর্ম, চলা-ফেরা, উঠা-বসা, লেন-দেন, খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা-দীক্ষাসহ সকল কর্মকাণ্ড নির্বাহ শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়েই সীমাবদ্ধ থাকে না। তাকে চেনা-অচেনা, জানা-অজানা হাজারো লোকের সঙ্গে উঠা-বসা করতে হয়। আর সে এটা করে থাকে নিজস্ব অস্তিত্ব ও স্বকীয়তা রক্ষা এবং বিভিন্নমুখী চাহিদা মেটাতেই। বলা চলে অনেকটা বাধ্য হয়েই। মানুষের জীবন, অস্তিত্ব ও জীবন নির্বাহের পদ্ধতির সঙ্গে এটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। আর সে তার বোধ, বিশ্বাস ও শিক্ষানুযায়ীই এসব কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে।

মানুষের জীবনাচার সর্বদাই তার মন-মগজে ঠাঁই করে নেওয়া বোধ-বিশ্বাস, ধ্যানধারণা দ্বারা পূর্ণরূপে প্রভাবিত হওয়ার পাশাপাশি তার সকল কাজকর্ম সে আলোকেই সম্পাদিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। একটা উদাহারণ দিই। ইউরোপীয় দেশসমূহের খ্রিষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী জনগণ কালো রঙ-কে শোক-দুঃখের প্রতীক হিসেবে মনে করে থাকে। এটা তাদের বিশ্বাস। এ বিশ্বাস তাদের মন মগজে বদ্ধমূল হয়ে গেছে। এজন্যই তারা কোনো মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করতে হলে অবশ্যই কালো পোশাক পরিধান করে। শেষকৃত্যানুষ্ঠানে হাজির হওয়ার জন্য কালো রঙ-এর পোশাক হতে হয়। অর্থাৎ নিজেদের বদ্ধমূল বিশ্বাসকে তারা এই আচরণ দ্বারা প্রকাশ করে থাকে। এই আচরণ তাদের বিশ্বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এটা তাদের বাস্তবভিত্তিক জীবনাচারের একটি উদাহরণ। এ জীবনাচারকে তারা স্বযত্নে লালন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে যেহেতু তাদের বিশ্বাস ও কর্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তাই এই জীবনাচারকে তারা পরিত্যাগ করার প্রচেষ্টাও করবে না।

অপরদিকে এক সময় খ্রিষ্টান জগতে, বিশেষ করে ইউরোপীয় খ্রিষ্টান জগতে রুটিকে হজরত ইসা (আ.)-এর শরীর হিসেবে এবং মদকে তাঁর রক্ত জ্ঞান করে যথাযথ ধর্মীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে 'ইউকারিস্ট' নামক এক বিশেষ ধরনের ভোজন উৎসব করা হতো। মার্টিন লুথার এ ধরনের অনুষ্ঠানসহ অনেক জীবনাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। ফলে খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠীর বিরাট একটা অংশ নিজেদের জীবনাচার হতে এ ধরনের অস্পষ্ট আচার-আচারণ বর্জন করল। অথচ এটা তাদের ধর্মীয় রীতি হিসেবে পালন করা হতো। এটা ছিল খ্রিষ্ট সমাজে অনুপ্রবেশ করা একটি ভ্রান্ত মতবাদ ও বিশ্বাস। সমাজের কিছু অংশ চার্চের চাপে পড়ে এ ভোজনানুষ্ঠানে অংশ নিলেও অধিকাংশ খ্রিষ্টান জনগণের বিশ্বাসে সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক ছিল না। তারা একে বাস্তবভিত্তিক ও যুক্তিপূর্ণ বলে বিশ্বাস করত না। ফলে অচিরেই এমন অনুষ্ঠান পালনকারী ও বিরোধিতাকারী লোকজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগে যায়।

এরূপ দ্বন্দ্ব স্বাভাবিকভাবেই সমাজে বিভেদ, বিদ্বেষ ও পারস্পরিক হানাহানির জন্ম দেয়। চার্চের পক্ষ থেকে এ অনুষ্ঠান পালনে বাধ্য করার প্রচেষ্টার কারণে জনগণের মন-মগজে হতাশা, অশ্রদ্ধা ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এক সময় উভয়পক্ষই সংঘাতের মুখোমুখি হয়। অবশেষে বিবেক ও যুক্তিরই জয় হয়। জীবনাচার যদি বাস্তবভিত্তিক না হয়, তবে কী ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে এটি তারই প্রকৃষ্ঠ উদাহরণ।

একটি সমাজ বা সভ্যতার স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ, সফলতার উচ্চ শিখরে আরোহণ ও স্থায়িত্ব লাভের জন্য অন্যতম শর্ত হচ্ছে আদর্শিক মতবাদ, বোধ-বিশ্বাস এবং তাদের ব্যক্তিগত জীবনাচার ও সামষ্টিক আচরণবিধির মধ্যে একটা নিগুঢ় সম্পর্ক বিরাজ করা; যা তাদের মধ্যে সব ধরনের বিভাজন রোধ করতে পারে। এর বিপরীতে অবস্থা যদি এমন হয় যে, সমাজবাসী আদর্শ হিসেবে যে মতবাদে বিশ্বাস করে, সমাজব্যবস্থা সে আদর্শ অনুযায়ী গঠিত না হয়ে ভিন্ন এক আদর্শ অনুযায়ী গড়ে উঠেছে, যা মানুষ বিশ্বাস করে না; তাহলে মানুষ প্রতিটি মুহূর্তে এক ধরনের মানসিক অশান্তি ও দ্বন্দ্বের মধ্যে বাস করতে থাকে। কারণ, তারা জীবনকে এমন এক পন্থায় পরিচালিত করতে বাধ্য হয়, যা নিজের জন্য উপযোগী ও কল্যাণকর মনে করে না। আবার এমন এক ব্যবস্থাকে আদর্শ হিসেবে মানে, যা বাস্তব জীবনে মেনে চলতে পারছে না। ফলে তাদের বাস্তব জীবন ও বিশ্বাসের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয় এবং বিভাজন ঘটতে থাকে। তখন তারা নিজেদেরকে সমাজের জীবনাচার থেকে আলাদা করে দেখে।

এই দ্বৈত রূপ ও বিভাজন তাদেরকে সারাক্ষণ মানসিক পীড়নের মধ্যে রাখে। এর স্বাভাবিক ফল হিসেবে তারা কালক্রমে নিজেদের সভ্যতা ও সমাজের বিরুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। একটা সময় এমন আসে যখন সমমনা এসব ব্যক্তিবর্গ নিজেদের সমাজ থেকে বের হয়ে এসে জোট বাধে। এ সমাজকে পরিবর্তন এবং আপন বোধ-বিশ্বাস অনুযায়ী নতুন সমাজ গঠনের জন্য মরিয়া হয়ে প্রচেষ্টা চালায়। এরই বাস্তব প্রমাণ আজ আমরা সারা বিশ্বে; বিশেষ করে তথাকথিত উন্নত ও সভ্য দেশসমূহে দেখতে পাচ্ছি। এসব দেশের সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে জ্ঞানী-গুণীজনদের একটা বিরাট অংশ নিজেদের শ্রমে গড়া সমাজের বিরুদ্ধেই কথা বলছেন; এর পরিবর্তন দাবি করছেন। তাদের মনে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ ও অসন্তুষ্টি দানা বাঁধছে। সেসব কথা প্রকাশ্যে ও নির্দ্বিধায় ঘোষণাও করছেন। এটা হলো পরিবর্তনের পথে প্রথম স্তর। একটি অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনের সূচনা বিন্দু মাত্র। অতএব, এ কথা অনস্বীকার্য যে, সভ্যতা ও সমাজের স্থায়িত্বের জন্য বাস্তবভিত্তিক জীবনাচার একটি অন্যতম পূর্ব শর্ত।

সভ্যতা ধ্বংসের কারণসমূহ

সমাজ-সভ্যতার পেছনে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারণ অবশ্যই থাকে, যা একটি সভ্যতাকে স্থায়ী ও কালোত্তীর্ণ করে তুলতে সহায়তা করে। এগুলোর সক্রিয় উপস্থিতি ও অংশগ্রহণ ছাড়া কোনো সমাজ-সভ্যতা গড়ে উঠতে পারে না। পৃথিবীর এমন অনেক ইতিহাসখ্যাত সভ্যতার কথা আমরা জানি, যা তার নিজ সময়কালে গৌরবোজ্জ্বল, শৌর্য-বীর্য আর প্রচণ্ড প্রতাপে গোটা পৃথিবী কিংবা তার অংশবিশেষকে শাসন করেছে। প্রভাবিত করেছে বিশ্বমানবতা ও সামাজিক ক্রমবিকাশকে। আজ হাজার বছর পরেও সেই সভ্যতাগুলো বিশ্ববাসীকে তাদের প্রতাপ আর শৌয-বীর্যের কাহিনি স্মরণ করিয়ে দিয়ে হতবাক করে দেয়।

কিন্তু ইতিহাসের পাতায় দুর্দণ্ড প্রভাবশালী এসব সভ্যতার কোনোটিরই আজ আর অস্তিত্ব নেই। এসব সভ্যতা সমসাময়িককালে উদীয়মান ও অস্তিত্ববান অপর কোনো সভ্যতার সামরিক শক্তি বা আদর্শিক শক্তির নিকট পরাজিত হয়ে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়েছে। নতুন সেই সভ্যতার কাছে তারা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় নিজেদেরকে সমর্পণ করেছে। বিলীন হয়ে গেছে নিজেদের সকল স্বাতন্ত্র্য অস্তিত্ব।

প্রশ্ন, হলো একটি সভ্যতার উন্নয়ন ও টিকে থাকার সব ধরনের প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও কী কী কারণ তাকে ধ্বংস করেই ছাড়ে? কোন কোন ত্রুটি ও দুর্বলতা একটি অস্তিত্ববান সভ্যতাকে ভেতর থেকে কুড়ে কুড়ে খায়? যার অনিবার্য ফলস্বরূপ দুর্দণ্ড প্রতাপশালী হওয়া সত্ত্বেও সামান্য একটু প্রতিকূল প্রতাপেই সে ঘুনে খাওয়া কুঁড়ে ঘরের মতো ধ্বসে পড়ে!

যেসব সভ্যতার কথা আমরা স্মরণ করতে পারি বা যেগুলো ইতিহাসের পাতায় প্রবল পরাক্রমশালী(?) হিসেবে বিরাজ করেছে এবং আজ অবধি টিকে আছে,

সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গ্রিক, রোমান, আর্য ও বৌদ্ধ সভ্যতা। এ ছাড়াও মেসোপটেমীয়, আর্মেনীয়, ইয়েমেনি এবং একেবারে হাল আমলের ইসলামি সভ্যতার কথা আমরা জানি; যা সারা বিশ্বে অতি স্বল্প সময়ে বিকশিত হয়ে বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়েছে।

এসব সভ্যতার মধ্যে গ্রিক সভ্যতা কালের বিবর্তনে রোমান সভ্যতার কাছে পরাস্থ হয়ে তার মাঝে বিলীন হয়ে গেছে। তবে তার আদর্শ-শিক্ষা, চিন্তা-চেতনা ও ধ্যানধারণার অধিকাংশই বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতাকে আশ্রয় করে এখনও টিকে আছে। কিন্তু এই শিক্ষা, চিন্তা, দর্শন ও ধ্যানধারণা গ্রিক সভ্যতাকে এবং পরবর্তী সময়ে রোমান সভ্যতাকেও স্থায়িত্ব দিতে পারেনি।

বর্তমান বিশ্ব সভ্যতা প্রকারান্তরে গ্রিক সভ্যতারই পরিবর্তিত একটি রূপমাত্র। বর্তমান সভ্যতা যেসব মূল দর্শন ও শিক্ষার ভিত্তিতে চলছে, তার উৎস যদি কেউ খুঁজতে চান, তবে তিনি গ্রিক সভ্যতা এবং এর চিন্তা-দর্শনের উদ্যোক্তা তিন দার্শনিক, বিশেষ করে সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটোর শিক্ষা-দর্শনের মধ্যে তা খুঁজে পাবেন। সুতরাং বর্তমান সভ্যতা আর কিছুই নয়; বরং প্রাচীন সেই গ্রিক সভ্যতারই সন্তান!

এখন আমাদের বিবেচ্য প্রশ্নটি হলো, কোন সেই কারণ যা একটি সভ্যতাকে ধ্বংস করে দেয় অথবা নিদেনপক্ষে তার ধ্বংসের প্রক্রিয়া সূচনা করে? ইতিহাসের পাতা হতে প্রাপ্ত তথ্যাদি যদি আমরা সচেতনভাবে অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণ করি, তাহলে আমাদের দৃষ্টিতে সভ্যতা বিধ্বংসী কারণগুলো ধরা পড়ে।

সভ্যতার ধ্বংসের প্রথম কারণ

সভ্যতা গড়ে উঠার জন্য প্রয়োজনীয় যেসব উপাদানের কথা আমরা আলোচনা করেছি, তার মধ্যে অন্যতম একটি উপাদান ছিল নৈতিক বিধিবিধান। এসব বিধিবিধান যদি উন্নত হয়, তাহলে এর দ্বারা গঠিত সভ্যতাও উন্নত হবে। সেইসঙ্গে এই সভ্যতার আওতায় মানুষদের উন্নত চরিত্রসম্পন্ন করে গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। তাদের কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ, রুচিবোধ-শালীনতা, লেন-দেন, পোশাক-পরিচ্ছদ, বোধ-বিশ্বাস সবকিছুতেই তখন উন্নত ও মহান মানসিকতাসম্পন্ন ভাবধারা প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তা জীবনাবোধের ধারক-বাহক হয়ে উঠবে। তখন তাদের মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনাতেও উন্নত ধ্যানধারণা স্থান পাবে। তাদের বিবেক-বুদ্ধি ও সার্বিক চারিত্রিক মাধুর্যের প্রভাবে আশেপাশের পরিবেশ এবং তার আওতাধীন মানুষও তখন প্রভাবিত হতে থাকবে। এসব মানুষ তখন উন্নত চারিত্রিক মাধুর্য অর্জনে নিজের অলক্ষ্যেই উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত হতে থাকবে।

এভাবে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষগুলো এক সময় উন্নত নৈতিক চরিত্র, মাধুর্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। এক সময় পুরো সমাজ সভ্যতাই তখন একটি উন্নত নৈতিক ও মানবীয় চরিত্রের আধার হয়ে উঠবে।

কিন্তু পুরো ব্যাপারটিই যদি এর বিপরীত হয়, তখন কেমন পরিস্থিতি হবে? সমাজ-সভ্যতার সদস্যরা যদি উন্নত নৈতিক বিধিবিধানের ধার না ধারে, নিজেদের কাজ-কর্ম, চিন্তা-চেতনা, কথা-বার্তা, ধ্যানধারণা ও পোশাক-পরিচ্ছদে কোনো নীতি-নৈতিকতার পরোয়া না করে অথবা তাদের দৃষ্টিসীমায় নীতি নৈতিকতার উন্নত কোনো মডেলও না থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে কোনো আদর্শবোধ বা শৃঙ্খলাবোধ থাকবে কি? তারা কি আদৌ তাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে কোনো রকম শৃঙ্খলা বজায় রাখতে পারবে?

সোজা উত্তর হলো, না; তারা আদৌ তা পারবে না; বরং সমাজ সভ্যতা তখন এক বিশৃঙ্খল ও অনাচারপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে পুরোপুরি নিমজ্জিত হয়ে যাবে। সেখানে কোনো নীতি-নৈতিকতা থাকবে না। থাকবে না কোনো ভালো বা মন্দের মানদণ্ড। নিজের শখ, খায়েশ মেটানো বা প্রবৃত্তির পূর্ণ দাসত্ব করাই তখন চরম ও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হয়ে দেখা দেবে। এ উদ্দেশ্য সাধনে তারা যেকোনো পথ, পন্থা অবলম্বন করবে। তাতে অপরের কোনো ধরনের ক্ষতি, সর্বনাশ বা অপমান তাদের মানসকিতায় ধর্তব্যের মধ্যে গণ্য হবে না; বরং যত রকম পাপাচার, অনাচার কল্পনা করা যায়, তার সবগুলোই তারা করবে। এর জন্য তারা বিন্দুমাত্র অনুতাপবোধ বা অনুশোচনায় ভুগবে না। কেননা, অনুতাপ বা অনুশোচনার তো জন্ম হয় শাণিত জাগ্রত বিবেক থেকে। বিবেকবোধ যদিও জন্মগতভাবে পেয়ে থাকে, তবুও এটি শাণিত ও উন্নত হয় উন্নত শিক্ষা ও নৈতিকতা চর্চার মাধ্যমে। বিবেককে এ রকম উন্নত ও শাণিত পর্যায়ে নিয়ে আসা এবং তা ধরে রাখাই হলো সভ্যতা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য।

যেখানে মানুষের দ্বারা অকল্পনীয় ও অচিন্তনীয় পাপাচার অনুষ্ঠিত হতে থাকবে অথচ তা রোধের কোনো কার্যকর উন্নত নৈতিক ও আদর্শ শক্তির উপস্থিতি থাকবে না, সে সমাজ তো অনতিবিলম্বে একটি বর্বর ও অসভ্য সমাজে রূপান্তরিত হবে। সেখানে মানুষের বসবাস এক রকম অসম্ভব হয়ে পড়বে। এমন সমাজ কোনো মানুষের কাছেই কাঙ্ক্ষিত হতে পারে না এবং এ ধরনের সমাজ রক্ষার জন্য কোনো পাগলও এগিয়ে আসবে না। বরং এর বিপরীতে তারা সকল ত্যাগ, প্রচেষ্টা ও পদক্ষেপের পেছনে একটি মাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করবে। তাহলে, হয় এ সমাজকে ধ্বংস করে দিতে হবে, নয়তো সংশোধন ও পরিবর্তন করে তাকে নতুন এক কাঙ্ক্ষিত সমাজে পরিণত করতে হবে।

সমাজের সদস্যরাই যেহেতু ভেতর থেকে এ ধরনের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবে, তাই এ কথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এ সমাজ ও সভ্যতা কোনোমতেই স্থায়িত্ব পেতে পারে না। রোমান সভ্যতা যখন উন্নতির চূড়ায় অবস্থান করছিল, তখন প্রথমে তাদের মধ্যে নীতি-নৈতিকতা অর্থাৎ আইন মেনে চলার ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখা দেয়। আর এর অনিবার্য পরিণতিতে অনৈতিক কাজকর্ম, অনাচার, স্বেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ব্যাপক প্রসার ঘটে। ফলে মাত্র কয়েক শতাব্দীর মধ্যে এ সভ্যতা তার ভেতরের সমস্ত প্রাণশক্তিটুকু হারিয়ে নিঃস্ব এক কাগুজে বাঘে পরিণত হয়। ইতিহাস সাক্ষী, এরপরে এই সভ্যতা তার অস্তিত্বকে আর বেশি দিন ধরে রাখতে পারেনি। তাই আমরা এ আলোচনা হতে সহজেই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, নৈতিক অধঃপতন ও উশৃঙ্খলতা সভ্যতা ধ্বংসের একটি অন্যতম কারণ।

সভ্যতার ধ্বংসের দ্বিতীয় কারণ

মানুষ চিন্তাশীল। কমবেশি প্রতিটি মানুষই চিন্তা করে। শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, ধর্মীয় মূল্যবোধ, দেশ, লোকাচার, দায়িত্ববোধ ও বুদ্ধিবৃত্তিক যোগ্যতা ইত্যাদি বহুবিধ কারণে প্রভাবিত হয়ে মানুষ চিন্তা করে। ব্যক্তি স্বকীয়তা বা নিজের অস্তিত্ব রক্ষার ব্যগ্রতা ও উৎকণ্ঠার জন্যই বাধ্য হয়ে সে চিন্তা করে। কারণ, মানুষের সৃষ্টির মৌলিকত্বই এমন যে, তার মনোযোগ ও দৃষ্টিতে আসা যেকোনো বিষয়ের ব্যাপারে সে কমবেশি উদ্‌গ্রীব ও উৎসাহী হয় এবং তা নিয়ে চিন্তা করে। এ প্রবণতা তার অস্তিত্বেরই একটা অংশ। মানুষের অস্তিত্ব ও চিন্তা-চেতনা, এ দুয়ের মধ্যে কোনো রকম বিভাজনরেখা টানা সম্ভব নয়।

একটি সভ্যতা কোনো বিশেষ ধরনের চিন্তা-চেতনা হতে উৎসারিত বিশ্বাসবোধকে ধারণ করেই গড়ে ওঠে এবং একটি গোষ্ঠী সচেতনভাবেই এ চিন্তা ও ধ্যানধারণাকে লালন করে। তাদের ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন ওই নির্দিষ্ট বোধ-বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়ে থাকে। তাদের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের পেছনেও ওই একই বোধ বিশ্বাসের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে।

চিন্তার উৎস, ধরন ও উপাদান যাই হোক না কেন, পুরো জাতি বা সভ্যতা, কিংবা তার অধিকাংশ সদস্যই যদি বোধ-বিশ্বাস ও ধ্যানধারণার দিক দিয়ে এককেন্দ্রীক হয়, তবে তাদের সকলের কর্মকাণ্ড, কর্মধারা ও লক্ষ্য একই দিকে ধাবিত হবে। চাই তা যৌথভাবে সম্পাদিত হোক, কিংবা এককভাবে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন ব্যক্তিকে যদি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে একটি কাজ একই সময়ে করতে দেওয়া হয়, তবে তাদের একমুখী বোধ-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা ও শিক্ষার কারণে ওই কাজটি একই লক্ষ্যপানে ধাবিত হবে। ছোটোখাটো ব্যক্তিগত ও মানবিক ত্রুটি-বিচ্যুতি বাদে একইভাবে সম্পাদিত হবে।

মনে হবে যেন, কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা শক্তি একইসঙ্গে সব স্থানে ওই একই কাজটি সম্পাদন করেছেন। বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যোগ্যতা ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের কারণে কাজটি সুচারুরূপে সম্পাদনের ক্ষেত্রে কমবেশি গরমিল থাকলেও তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি প্রায় একই রকম হবে। সম্পাদিত সকল কাজের ক্ষেত্রে একটি অদৃশ্য যোগসূত্র ধরা পড়বে। কাজটি সম্পাদনে অংশগ্রহণকারী সকলের মধ্যে চিন্তা-বিশ্বাস ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট এককেন্দ্রীমুখীতার প্রকাশ থাকবে। কারণ, এরা সকলে চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস ও আদর্শের দিক থেকে সমগোত্রীয় বা একই আদের্শর ধারক। এরা সকলে তাদের শ্রম দ্বারা একটি নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট লক্ষ্য হাসিলের জন্য চেষ্টা করে যাবে। এ ধরনের আদর্শিক-মানসিক-আত্মিক ও সাংস্কৃতিক সামঞ্জস্যতা একটা জাতি বা দেশকে সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ করে, যা তাদের জাতিগত ঐক্য রক্ষায় অব্যর্থ রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে।

কিন্তু যেকোনো কারণেই হোক, যখন একটি সভ্যতা বা জাতির সদস্যদের মধ্যে মৌলিক লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে ভিন্নতা ও বিভক্তি দেখা দেয়, তখন তাদের লক্ষ্য অর্জনের পথ ও পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন ধাঁচে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এতে তাদের চিন্তা-চেতনার সেই ঐক্যসূত্র নষ্ট হয়ে যায়। সমাজে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী তখন চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাস-দর্শনের দিক থেকে ছোটো বড়ো বিভিন্ন দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এসব গোষ্ঠী, দল-উপদল তখন নিজ নিজ চিন্তা-চেতনার শ্রেষ্ঠত্ব, উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতার প্রচার-প্রপাগান্ডায় লেগে পড়ে। অন্যান্য দল-উপদল, গোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনার ওপর নিজেদের ধ্যানধারণাকে বিজয়ী করে তোলার জন্যে সকল শ্রম, মেধা, প্রচেষ্টা ও উদ্যমকে নিয়োজিত করে।

এভাবে একই সমাজ-সভ্যতা ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারক হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যকার কেন্দ্রীয় ঐক্য বিনষ্ট হয়ে যায়। শুরু হয়ে যায় বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়া। নিজেদের মধ্যে দীর্ঘদিনের লালিত সুসংহত ঐক্যে ভাঙনের প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটে। বিগত এক হাজার বছর ধরে চলে আসা মুসলিম সভ্যতার ইতিহাস ও কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের ক্ষেত্রেও ঠিক এমনটিই ঘটেছে।

জীবনের সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও সে শিক্ষা হতে মুখ ফিরিয়ে মুসলমানরা যখন জীবনের জন্য সংকীর্ণ লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে নিল এবং তা হাসিলের জন্য শাশ্বত ও নির্ধারিত পথ ছেড়ে বিকল্প বাঁকাচোরা পথ বেছে নিল, ঠিক তখনই তাদের মধ্যে আদর্শিক বিভিন্নতা দেখা দিলো। সেইসঙ্গে মত ও পথের পার্থক্যজনিত দ্বন্দ্ব জন্ম নেওয়ার ফলে তাদের কেন্দ্রীয় ঐক্যসূত্র ক্রমাগতভাবে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ল।

উমাইয়া, আব্বাসীয়, ওসমানীয় ও মিসরের ফাতেমি খেলাফত, স্পেনের মুর শাসন এবং ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্যের শাসনের ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে তাদের পতনের কারণগুলো স্পষ্টভাবে দেখা যায়। তাদের পতনের অনেকগুলো কারণের মধ্যে মূল কারণ ছিল, এসব শাসন ব্যবস্থায় সংঘ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর চিন্তাধারার মধ্যে আদর্শভিত্তিক কেন্দ্রীয় ঐক্য অক্ষুণ্ন ছিল না। প্রয়োজনের মুহূর্তে তারা দেশ-জাতি ও সমাজের জন্য চাহিদামতো প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি। বজায় রাখতে পারেনি নিজেদের মধ্যে প্রয়োজনীয় ঐক্য। তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের চিন্তার জগতে নৈরাজ্য ও বিভাজন সুস্পষ্ট ছিল। বাগদাদে নেতৃস্থানীয় শাসকবর্গ, সমাজপতি ও আলেম-ওলামাদের মধ্যে এ ধরনের ভয়ংকর (চিন্তার জগতে নৈরাজ্য) ত্রুটির কারণেই তারা মুষ্টিমেয় মোঙ্গল যাযাবরের হাতে কচুকাটা হয়ছিল। রূপকথার মতো তাদের জৌলুস ও শান-শওকত বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তারা কোনো রকম কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি।

স্পেনে মুসলিম শাসকদের মধ্যেও একই রকম চিন্তার নৈরাজ্য বাসা বেঁধেছিল। ফলে তারাও ফার্ডিনান্ডের আক্রমণের মুখে খড়কুটোর মতো ভেসে গিয়েছিল। ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মন-মননে যখন চিন্তার নৈরাজ্য স্থায়ী হয়, তখন তার চরিত্র হতে গঠনমূলক ক্ষমতা (Productivity) লোপ পেয়ে যায়। তার চরিত্রে মানবীয় গুণাবলি বিকশিত হওয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং পূর্বে বিকশিত হওয়া মানবিক গুণাবলিও বিলিন হয়ে যায়। অর্থাৎ তাদের চরিত্র ধ্বংস হয়ে যায়। তারা তখন যেটাই করতে চায়, সেটাতেই ভাঙন ও বিপর্যয়ের ঘণ্টা বেজে ওঠে। কিছুই তারা গড়তে পারে না, শুধু ভেঙেই যায়। এমনসব লোক নিয়ে সভ্যতা বেশি দিন টিকে না। তাই আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, চিন্তার জগতে নৈরাজ্য হলো সভ্যতা ধ্বংসের দ্বিতীয় মৌলিক কারণ।

সভ্যতার ধ্বংসের তৃতীয় কারণ

মানুষ সততই তার প্রবৃত্তি দ্বারা প্ররোচিত ও অনুপ্রাণিত হতে থাকে। মানুষের মন বা অন্তর্জগতে সবসময় ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়বোধের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। অর্থাৎ যতক্ষণ তার ন্যায়বোধ অন্যায়বোধকে পরাজিত ও অবদমিত করে রাখতে পারে, ততক্ষণ সে নিজ, পরিবার, সমাজ, দেশ-রাষ্ট্র, এমনকী সমগ্র বিশ্বমানবতার জন্য কল্যাণকর বলে বিবেচিত হতে থাকে। তার সকল কাজ-কর্ম, কথা-বার্তা, চাল-চলন, আচার-আচরণ সবকিছুই সমগ্র বিশ্বের মানুষের জন্য কল্যাণের বার্তা বয়ে আনে। এমনকী সে যদি কোনো কাজ না করে শুধু বসে বসে চিন্তা করে, তবে সে চিন্তাটুকুও তার নিজের এবং পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী সকলের জন্যেই কল্যাণকর হয়ে দেখা দেয়।

আর যখনই তার ন্যায়বোধ অন্যায়বোধের নিকট পরাজিত হয়, অর্থাৎ তার ভেতরের অন্যায়ের চেতনা মন-মগজকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখনই সে নিজের ও চারপার্শ্বের সকলের জন্য অকল্যাণ ও অমঙ্গলের উৎস হয়ে দেখা দেয়। তার কাজ-কর্ম, চলা-ফেরা, কথা-বার্তা ও লেন-দেনসহ সকল পদক্ষেপই পৃথিবীর সকল জীবনের জন্য অকল্যাণকর, ক্ষতিকর ও অশুভ বলে প্রমাণিত হয়।

মানুষ কখনো কখনো তার জীবনে ন্যায়বোধ দ্বারা তাড়িত হয়। তার ভেতরের অন্যায়বোধকে সচেতনভাবে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখে। আবার কখনো কখনো পরিস্থিতি ও পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উলটো ন্যায়বোধকেই দাবিয়ে রেখে অন্যায়বোধকে তার ওপর বিজয়ী করে তোলে। অন্যায়ের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। এটা মানুষের মৌলিক মানবীয় দুর্বলতা। আর এ দুর্বলতা নিয়েই সে বেঁচে থাকে।

মানুষের কাজ হলো এসব দুর্বলতাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে নিজেকে সহায়তা করা। মানুষ যেন এ ধরনের দুর্বলতার শিকার না হয় অথবা হলেও যেন নিজ গরজে নিজেকে এ ধরনের পরিস্থিত থেকে উদ্ধার করে নিতে পারে– এজন্য তার সম্মুখে একটা নির্দিষ্ট ব্যবস্থা (System) থাকা দরকার। যার মাধ্যমে সে নিজেকে অন্যায়ের কাছে পরাভূত হওয়া থেকে বিরত রাখতে পারবে। কখনো যদি সে মানবীয় দুর্বলতার জন্য অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করে ফেলে, পরাভূত হয়েও যায়, তবুও যেন সে এই ব্যবস্থায় মাধ্যমে নিজেকে ওই পরিস্থিতি থেকে পরিশুদ্ধ করে নেয়। মুক্ত করে নেয় ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য।

আর এ জন্যই মানুষের সম্মুখে তওবার পদ্ধতি, পুরস্কারের স্বীকৃতি, শাস্তি ও তিরস্কারের ব্যবস্থা রাখা হয়। এসব পুরস্কার-স্বীকৃতি, শাস্তি-তিরস্কারের প্রয়োগ ও প্রদানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করার যে মাধ্যম তাই হলো আইন।

আইন যে শুধু ভালো কাজের প্রতিদান ও অন্যায় কাজের শাস্তি বিধান করার মাধ্যম, আসলে পুরো ব্যাপারটা তা নয়। বরং আইন হলো ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, শ্লীল-অশ্লীল, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি মৌলিক ধারণাগুলোকে তাদের নিজ নিজ মানদণ্ডে টিকিয়ে রাখার মাধ্যম। সভ্যতা বিনির্মাণে এই আইন শুধু জরুরিই নয়; বরং অনিবার্য বাস্তবতা। আইন বা বিধান ছাড়া কোনো সমাজ-সভ্যতা গড়ে উঠার কথা কল্পনাও করা যায় না, টিকে থাকা তো দূরের কথা! এমনকী আইন বা বিধিবিধান ছাড়া কোনো সভ্যতার সূচনাও হতে পারে না।

কোনো সমাজ-সভ্যতার ভিত্তিমূল আইনের মধ্যে যদি ত্রুটি থাকে, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে ত্রুটি থাকে অথবা আইন সঠিকভাবে প্রণীত হলেও প্রয়োগের ক্ষেত্রে তারতম্য ঘটে, তাহলে সেই সমাজব্যবস্থায় সামাজিক ও প্রশাসনিক অবকাঠামো সহসাই ভেঙে পড়বে। দেখা দেবে শোষণ, অনাচার, জুলুম ও নির্যাতন। সমাজের সবল ও শক্তিশালী গোষ্ঠীগুলো অপেক্ষাকৃত দুর্বল গোষ্ঠীর ওপর চড়াও হবে। তাদেরকে সকল মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে শুধু নিজেদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধাগুলোকে নিশ্চিত করে নেবে। যত অন্যায়ই করুক না কেন, তারা নিজেরা সবসময়ই আইনের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যাবে। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও জুলুমের বিস্তার ঘটতে থাকবে। বিঘ্নিত হবে সমাজবাসীর সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা। তাদের জান-মাল ও ইজ্জতের কোনো নিরাপত্তাই তখন থাকবে না। এর স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে সমাজে অতি দ্রুত গণ-অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দেখা দেবে।

পুরো সমাজ তখন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়বে। এক পক্ষে থাকবে সংখ্যালঘু অথচ শক্তিশালী জালিম শাসকগোষ্ঠী, আর অপর পক্ষে থাকবে সংখ্যাগুরু মজলুম জনগণ। সংখ্যাগুরুর সঙ্গে থাকবে বিবেকবান সমর্থক গোষ্ঠী। এমতাবস্থায় সমাজ-সভ্যতা নিজেই অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। কারণ, যেকোনো বহিঃশত্রুর আক্রমণ ও আগ্রাসনের মুখে শোষিত ও মজলুম এই সংখ্যাগুরু অংশটি দেশের প্রতিরক্ষায় সরকারকে সহায়তা করার পরিবর্তে নিজেদের মুক্তির আশায় শত্রুকে সমর্থন জোগাবে। অথবা তারা দেশরক্ষায় অংশ না নিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে দর্শকের ভূমিকা পালন করবে।

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত অভিযানের ক্ষেত্রে আমরা এরকমটা দেখতে পাই। আফ্রিকা, স্পেন, ভারতীয় উপমহাদেশ, সিরিয়া, আলবেনিয়া, বসনিয়ায় মুসলিম সামরিক অভিযানের ক্ষেত্রে এ রকম ঘটেছিল। এসব অঞ্চলের অত্যাচারিত মজলুম সাধারণ জনগোষ্ঠী মুক্তির আশায় বৈদেশিক মুসলিম শক্তিকে নিজ দেশের সরকারে বিরুদ্ধে স্বাগত জানিয়েছে, উৎসাহ যুগিয়েছে এবং ক্ষেত্রবিশেষে নৈতিক ও বৈষয়িক সহায়তাও প্রদান করেছে। তাই এ কথা বাস্তবভাবেই উপলব্ধি করা যায় যে, সভ্যতা ধ্বংসের তৃতীয় কারণ হলো সমাজে বিশৃঙ্খলতা, জুলুম, নির্যাতন ও সন্ত্রাস।

সভ্যতা ধ্বংসের চতুর্থ কারণ

এ ক্ষেত্রে চতুর্থ যে কারণ, তা হলো সমাজ-সভ্যতায় বা কোনো জনগোষ্ঠীর মধ্যে দুঃস্থ ও অভাবী জনগোষ্ঠীর আধিক্য। প্রতিটি মানুষই নিজের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও নিরাপত্তা চায়। এগুলো পেতে সে দৈহিক, মানসিকসহ সকল ধরনের শ্রম ও মেধা দিতে প্রস্তুত। শুধু নিজের জন্যই নয়;

বরং তার অধীনস্থ পরিবার-পরিজন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, মা-বাবাসহ যারা তার নিকটতম প্রিয়জন সকলের জন্যই সে মৌলিক সুবিধাদি প্রত্যাশা করে। এজন্য সে মাঠে বা কল-কারখানা অক্লান্ত পরিশ্রম করে। মেধা খাটিয়ে অফিসে চাকরি করে। ব্যবসায় মেধা ও অর্থ খাটায়, মাথার ঘাম পায় ফেলে পরিশ্রম করে। যাতে সে এই পরিশ্রমলব্ধ অর্থ-সম্পদ দিয়ে তার মৌলিক প্রয়োজনগুলো মেটানোর ব্যবস্থা করতে পারে। রাষ্ট্র বা সমাজ অর্থের বিনিময়ে তার এসব মৌলিক চাহিদা মেটাবে অথবা মেটানোর পরিবেশ সৃষ্টি করে দেবে। আবার ক্ষেত্রবিশেষে সকল শ্রম ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ব্যক্তি যখন এসব চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হবে, তখন রাষ্ট্র নিজ উদ্যোগেই তার এসব চাহিদা মিটিয়ে দেবে।

কিন্তু অবস্থা যদি এমন হয় যে, ব্যক্তি তার সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দৈহিক বা মানসিক কোনো রকম শ্রম দেওয়ার সুযোগই পাচ্ছে না। এজন্য সে অর্থ উপার্জনে ব্যর্থ হচ্ছে এবং নিজের সকল মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। রাষ্ট্রও সেখানে এসব চাহিদা মেটানোর ব্যাপারে কোনোরূপ কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। আবার যদি এমন হয় যে, সাধারণ জনগোষ্ঠী শ্রম, মেধা ও পুঁজি দিয়ে অর্থ উপার্জন করল বটে, কিন্তু তাদের মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণে অথবা বাজারে যোগানের অপ্রতুলতা এবং ব্যাপক চাহিদার কারণে ক্রয় ক্ষমতার বাইরে রয়ে গেল (যেমনটি দেশে মুদ্রাস্ফীতি ঘটলে বা দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে হয়ে থাকে)। এ ক্ষেত্রেও তারা নিজের সর্বস্ব নিয়োগ করে উপার্জিত অর্থ দিয়েও ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ হবে।

এহেন যেকোনো এক বা একাধিক কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি যদি দীর্ঘায়িত হয়, তবে সমাজে স্বল্প আয়সম্পন্ন লোকেরা ভীষণ আর্থিক দুরাবস্থার মধ্যে নিপতিত হবে। তারা অর্ধাহারে, অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় দিনাতিপাত করবে। এর বাস্তব উদাহরণ দেখতে আমাদের খুব বেশি দূর যেতে হবে না। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে আমাদের নিজেদের দেশটিতেই এ রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। চুয়াত্তরের দুর্ভিক্ষ তো বিশ্ববাসী জানে! আর আজ এ অবস্থাটা বাস্তবেই বিরাজ করছে ইয়েমেন, ইথিওপিয়াসহ তৃতীয় বিশ্বের কোনো কোনো স্থানে। এই জনগোষ্ঠীটিই সমাজে 'দুঃস্থ জনগোষ্ঠী' হিসেবে পরিচিত। এ ধরনের পরিস্থিতি যদি সরকার বা সমাজের কর্ণধাররা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে, তবে দিনে দিনে সমাজে এই দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

একটি সরকারের দায়িত্ব হলো, এ রকম অবস্থায় সমাজে বসবাসকারী দুস্থ জনগোষ্ঠীর সকল মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য তড়িৎ ও সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

তাদের প্রত্যেকের দোরগোড়ায় প্রয়োজনীয় বস্তু যথাসময়ে ও যথাযথ পরিমাণে পৌঁছে দেওয়া। আর দুঃস্থ মানবগোষ্ঠীর মনে ও ধরনের স্থির নিশ্চয়তা সৃষ্টি করা যে, তারা অসহায় বা পরিত্যক্ত নয়; বরং সরকার ও সমাজবদ্ধ জনগোষ্ঠী তাদের সাহায্যে সর্বদা প্রস্তুত।

এ কাজে যদি সরকার ও সমাজবাসী ব্যর্থ হয় এবং এ রকম পরিস্থিতি যদি দীর্ঘায়িত হতে থাকে, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ এই দুঃস্থ জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষ পুঞ্জিভূত হতে থাকবে এবং তা বাড়তে থাকবে। এক সময় তারা সরকার ও সমাজের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলবে। তাদের এ অসন্তোষ এক সময় ক্ষোভ ও আক্রোশে রূপান্তরিত হবে। আর এমন একটি সময় আসবে যে, এই সংখ্যাগরিষ্ঠ দুঃস্থ জনগণের একমাত্র জীবনটুকু ছাড়া হারানোর আর কিছুই থাকবে না। তখন তারা মারমুখো হয়ে উঠবে।

এ ধরনের ঘটনা আমরা ইতিহাসে বারবার দেখেছি। একেবারে হাল আমলে রুমানিয়া, সোভিয়েত রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় এ ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। তাই আমরা এ সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, সভ্যতা বিধ্বংসী চতুর্থ কারণ হলো; সমাজে দুঃস্থ ও অভাবী মানুষের সংখ্যাধিক্য।

সভ্যতা ধ্বংসের পঞ্চম কারণ

যতই উন্নত যন্ত্রপাতি সজ্জিত ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত নৌকাই হোক না কেন, তাকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে হলে সমুদ্রের সকল প্রকার ঢেউয়ের ঝাপটা, উথাল-পাতাল তরঙ্গ ও পথ হারিয়ে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনাকে অতিক্রম করার মতো দক্ষ-অভিজ্ঞ মাঝির প্রয়োজন। নৌকার গঠন বা সুযোগ-সুবিধায় কিছু কমতি বা ত্রুটি থাকলেও আবহাওয়ার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও মাঝির দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার গুণে এ নৌকা তীরে ভিড়তে পারবে বলে আশা করা যায়।

আমরা একটি জাতিকে এভাবে তুলনা করতে পারি যে, সভ্যতা নামক একটি কল্পিত নৌকায় চড়ে এ মানবগোষ্ঠী সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তার লক্ষ্যে পৌঁছতে সচেষ্ট। তারা সমস্ত বাধা-বিপত্তি পাড়ি দিয়ে জীবনের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য হাসিলের জন্য নৌকারূপী সভ্যতার ঘাড়ে সওয়ার হয়েছে। এখন এই সভ্যতা পরিচালনার দায়িত্ব এমন এক বা একাধিক দক্ষ পরিচালকের হাতে থাকতে হবে, যিনি বা যারা সভ্যতার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে ওয়াকিবহাল থাকবেন। যিনি পথের সমস্ত বাধা-বিপত্তি, চড়াই-উৎরাই সম্পর্কে সচেতন হবেন এবং তা অতিক্রম করার সকল কলা-কৌশল, পথ-পদ্ধতি তার গোচরে থাকবে।

তাদের মধ্যে খুব বিচক্ষণতা থাকতে হবে। এ পথে যাত্রাকালে বাধা-বিপত্তির উদ্ভব হবে। বাধার ধরন ও ব্যাপকতা অনুযায়ী সময়, পরিবেশ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে তাৎক্ষণিকভাবে তাদের তা মোকাবিলা করার যোগ্যতা থাকতে হবে। জাতির অধিকাংশ সদস্যই এ ধরনের প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে থাকেন। কিন্তু এসব সমস্যা, সমস্যার ধরন, গভীরতা, ব্যাপকতা, পরিণতি এবং এর সমাধানের সহজ ও সম্ভাব্য কার্যকর পথ ও পন্থা ব্যাখ্যা করে দেওয়ার দায়িত্ব হলো নেতৃত্বের আসনে আসীন ব্যক্তিবর্গের।

আমরা তাদেরকেই নেতা বলে অভিহিত করে থাকি, যারা একটি দেশ, জাতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে নৌকার মাঝির ভূমিকা পালন করেন। নেতার এতটা দূরদর্শিতা থাকতে হবে যে, তিনি এ পথে যাত্রার প্রারম্ভেই সম্ভাব্য উত্থান-পতন, বাধা-বিপত্তির রূপ ও ধরন সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা রাখেন। তাদের ওপরে এ দায়িত্বও বর্তায় যে, যেকোনো জটিল সমস্যার মুখে অটল অবিচল থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষা করা জন্য তারা জনগণের মধ্যে আত্মিক ও মানসিক সাহস জোগাবেন। আর নিজেরা থাকবেন পুরো কর্মী বাহিনীর সম্মুখ কাতারে। নিজ যোগ্যতাবলে তারা জাতির প্রতিটি সদস্যদের সামনে নিজেদের জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মপদ্ধতি ও পথকে স্পষ্ট করে তুলে ধরবেন এবং তা অর্জনের জন্য জাতির অধিকাংশ সদস্যকে উজ্জীবিত করে তুলবেন। তাদের অনুপ্রাণিত করে লক্ষ্যপানে ধাবিত ও পরিচালিত করবেন। আধুনিক বিশ্ব ইতিহাসে হিটলার তার জাতি জার্মানিকে এ ধরনের উজ্জীবিত করতে পেরেছিলেন; যদিও তিনি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছেন। তার ব্যর্থতার যৌক্তিক কারণও ছিল, তা ভিন্ন আলোচনার বিষয়।

কিন্তু কোনো জাতির মধ্যে যদি এ ধরনের যোগ্য ও দূরদর্শী নেতার অভাব ঘটে, লক্ষ্যপানে ধাবিত করতে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করতে না পারেন, বাধা-বিপত্তিকে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হন, তাহলে জাতির কপালে দুর্ভোগ নেমে আসে। নেতার চরিত্রে যদি অবিচলতা ও লক্ষ্য অর্জনের সুদৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও প্রতিজ্ঞা না থাকে, তাহলে পুরো দেশ ও জাতিই লক্ষ্যচ্যুত হয়ে যাবে এবং বাধা-বিপত্তির কাছে পরাজয় মেনে বসে থাকবে।

নেতৃত্বের আসনে আসীন ব্যক্তি যদি নিজেদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থকে পুরো দেশ ও জাতির স্বার্থের ওপরে প্রাধান্য দেন, তবে তা হবে পুরো জাতির জন্যই মৃত্যুঘণ্টা! নেতৃত্বের আসনে আসীন ব্যক্তিদের হাতেই ক্ষমতা থাকে। ক্ষমতার প্রয়োগও তারাই করে থাকেন এবং প্রশাসনও তাদের অঙ্গুলির হেলনেই পরিচালিত হয়। তাই সমাজের সকলেই ন্যায়-অন্যায়ের পরোয়া না করে প্রকাশ্যে বা গোপনে ক্ষমতাশীন নেতৃবর্গের মন জুগিয়ে চলতে সচেষ্ট হয়, তাদের প্রভাবিত করতে চায়।

নেতাদের একটা নির্দেশেই সম্পদের পাহাড় তাদের পায়ের নিচে গড়াগড়ি খায়। না চাইতেই পকেটে দেশের সম্পদ হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে এ সকল সুযোগ ও সম্পদের লোভ সামাল দিতে পারা এবং তাকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখাটা প্রতিটি নেতার জন্যই অপরিহার্য এক যোগ্যতা। বলা যায় সবচেয়ে বড়ো ও গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতাগুলোর মধ্যে এটি একটি।

নেতা যদি এই গুরুত্বপূর্ণ যোগ্যতার অধিকারী না হন, তবে কী ঘটতে পারে, তা খুব সহজেই অনুমেয়। মিসরের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হারানোর মূলে যে দুর্নীতিগ্রস্থ নেতা তৌফিক তার ব্যক্তিস্বার্থকে পুরো জাতির জাতীয় স্বার্থের ওপরে স্থান দিয়েছিলেন। মির জাফর, জগৎশেঠ, রায়বল্লভ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গও তাদের নিজেদের লোভ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে ভারতের স্বাধীনতাকে পদদলিত করেছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের বাদশাহ আকবর তার দেশ ও জাতির স্বার্থকে প্রাধান্য না দিয়ে নিজের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা এবং নিজের মনের লাগামহীন খায়েশ পূরণের প্রবৃত্তির সঙ্গে আপস করেছিলেন। এর ফলে মাত্র এক শতাব্দীর ব্যবধানেই ভারতে মোগল শাসনের কী হাল হয়েছিল, তা ইতিহাসের সকল সচেতন পাঠকই জানেন।

স্পেনের তৎকালীন নেতৃবর্গ জাতির অধিকাংশ সদস্যদের মতামতকে উপেক্ষা করে রাজা ফার্দিনান্দের সন্ধির আহ্বানে সাড়া দিয়ে পুরো গ্রানাডাকে কোনো কার্যকর প্রতিরোধ ছাড়াই খ্রিষ্টশক্তির হাতে তুলে দেন। সন্ধী পরবর্তী পরিস্থিতি কী হতে পারে এবং ফার্দিনান্দের আসল উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা বোঝার মতো দূরদর্শিতা সেই নেতৃত্বের ছিল না। ফলে লাখো গ্রানাডাবাসীর জীবনে নেমে আসে নারকীয় তাণ্ডব। পৃথিবীবাসী অবলোকন করল হত্যা ও ধর্ষণের এক বীভৎস চিত্র। লাখো মানুষ প্রাণ হারাল। এর মধ্য দিয়ে পুরো স্পেনে টিকে থাকা মুসলিম সভ্যতা অচিরেই হারিয়ে ফেলল তার স্বাধীনতা। পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল একটি উন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত সভ্যতা!

তাই এ কথা অনস্বীকার্য যে, একটি দেশ ও জাতি ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিমজ্জিত হয়ে যায়, যদি দুরদর্শী ও যোগ্য নেতৃত্ব দ্বারা ওই দেশ ও জাতি পরিচালিত না হয়। তাই আমরা এ আলোচনা হতে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সমাজ সভ্যতা বিধ্বংসী পঞ্চম কারণ হলো; যোগ্য ও দূরদর্শী নেতৃত্বের অভাব।

বর্তমান বিশ্ব সভ্যতার মৌলিক ভিত্তি

তিনজন গ্রিক চিন্তাবীদ (Greek Gang of Three) সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটল। মূলত তাদেরই সমন্বিত চিন্তাধারার প্রভাব ছায়ায় গড়ে উঠেছে বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতার মূল ভিত্তি। তাদের উদ্ভাবিত ও প্রতিষ্ঠিত চিন্তাধারা পশ্চিমা সভ্যতার মন-মানসকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, যেমনটি আষাঢ়ের ঘন কালো মেঘ পুরো আকাশটা ঢেকে রাখে। এমনকী তাদের এই চিন্তা সারা পশ্চিমাজগৎ, প্রাচ্য, দূরপ্রাচ্য ও প্রতীচ্যের অধিকাংশ মানুষেরই চিন্তা-চেতনার আকাশকে শত শত বছর ধরে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাদের চিন্তা-চেতনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সমাজ, রাষ্ট্র ও সভ্যতা। প্লেটোকে পশ্চিমা দর্শনের জনক বলা হয়। তিনি চিন্তার জগতে একটি অত্যন্ত শক্তিশালী গতিশীলতা এনে দিয়েছিলেন। তিনি রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন না, তবুও রাষ্ট্র পরিচালনা ও জনকল্যাণে তার উৎসাহ ছিল ব্যাপক। তিনি গভীরভাবে এ বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। তার লেখা বই *রিপাবলিক* হাজারো বছর ধরে রাজনীতিবিদ, সমাজবিজ্ঞানী এবং রাষ্ট্রনায়কদের চিন্তা-চেতনাকে প্রভাবিত করেছে। আজও সমগ্র বিশ্বে তার এই *রিপাবলিক* নামক গ্রন্থখানা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক অনন্যসাধারণ গ্রন্থ ও পথনির্দেশক হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে।

প্লেটো তার উক্ত গ্রন্থে পরামর্শ দিয়েছেন যে, সমাজ একটা বিশেষ শ্রেণি দ্বারা শাসিত হওয়া উচিত। তিনি এই বিশেষ শ্রেণিকে Gurdians নামে অভিহিত ও চিহ্নিত করেছেন। তার মতে, যারা মূলত সৈনিক শ্রেণিভুক্ত, তারাই দেশের শাসনভার গ্রহণ করবে এবং দেশ শাসন করবে। বলা চলে অনেকটা বর্তমান বিশ্বের ঘৃণিত ও নিন্দিত সামরিক শাসনের মতো। তিনি এই বিশেষ শ্রেণিকে আইন রচনা, প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষমতা দিয়েছেন। তবে তার পূর্বে তাদের প্রজাপালন ও জনহিতকর কাজে যথেষ্ট প্রশিক্ষণ প্রদানের সুপারিশ করেছেন।

কিন্তু কে, কীসের ভিত্তিতে এবং কোন নীতিমালার আলোকে ওই প্রশিক্ষণ দান করবেন, তা তিনি বলেননি। এ ব্যাপারে বলা চলে তিনি একেবারেই নীরব থেকেছেন।

ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা প্রাচীনকালে আমির-ওমরাহ, রাজা-বাদশাহ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নিকট অত্যন্ত প্রিয় একটি ক্রীড়া ছিল। আজও তা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় খেলা হিসেবে চালু অছে। আর এসব প্রতিযেগিতায় নির্বাচিত সুস্থ, সবল এবং উন্নত জাতের পুরুষ ও স্ত্রী ঘোড়ার সম্মিলনে জন্ম দেওয়া হতো আগামী দিনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে সক্ষম আরেকদল সবল ও সুস্থ ঘোড়ার। আজও বিশ্বের অনেক দেশে এ প্রথা চালু আছে। বরং বলা চলে এটা অনেকের জন্য অত্যন্ত লাভজনক পেশা হিসেবে দারুণভাবে জনপ্রিয়। মধ্যপ্রাচ্য, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, ইউরোপ ও আমেরিকায় এ লক্ষ্যে বিরাট বিরাট ফার্ম গড়ে উঠেছে।

সামগ্রিক বিচারে এর মধ্যে মানবতার জন্য এটা অত্যন্ত লজ্জাকর, অপমানজনক ও ঘৃণিত ব্যাপার লুকিয়ে আছে। তা হলো, প্লেটোর উদ্ভাবিত এই Gurdians বা সমাজে শাসক শ্রেণির লোকের যেন কোনো কালেই ঘাটতি না হয়, সেজন্য তিনি রেসের ঘোড়া উৎপাদনের ন্যায় রীতিমতো কঠোর বৈজ্ঞানিক পন্থায় একটি বিশেষ শ্রেণির মানুষ উৎপাদন এবং তাদের সেইভাবে লালন-পালন করে গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়েছেন। যেন তারা ভবিষ্যতে সমাজে শাসকশ্রেণির দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত ও যোগ্যতাসম্পন্ন হয়ে গড়ে ওঠে।

খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের একজন পরিপূর্ণ ফ্যাসিস্ট চিন্তাধারার অধিকারী দার্শনিক প্লেটোর চিন্তাধারায় প্রভাবিত হলো তার জন্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর পরে জন্ম নেওয়া আরেক ফ্যসিস্ট হিটলার। হিটলার তার শাসন কর্তৃত্ব সারা বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত করার মানসে প্লেটোর ফর্মূলা অনুযায়ী এক বিশেষ শ্রেণির মানুষ তৈরি করার ব্যাপক পরিকল্পনা করেছিলেন। তিনি জাতিতে জার্মান ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, জার্মান জাতিরই একমাত্র অধিকার ও যোগ্যতা আছে এ বিশ্বকে শাসন করার। তাই তিনি বিশুদ্ধ ও নির্ভেজাল জার্মান রক্তবিশিষ্ট জাতি গঠনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।

হিটলার বিংশ শতাব্দীতে জন্ম নিয়েও তার জন্মের আড়াই হাজার বছর পূর্বের দার্শনিকের চিন্তাধারা ও দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সারা বিশ্বে কী নিদারুণ ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল তা এক কথায় বর্ণনা করা অসম্ভব ব্যাপার। এ ঘটনা হতেই বোঝা যায় প্লেটোর দর্শন বিশ্বমানবসভ্যতার ওপরে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

প্লেটোর চিন্তা-চেতনা ফ্যাসিস্ট হলেও তিনি নিজে কিন্তু ক্ষমতালিপ্সু ছিলেন না। তিনি কখনো রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেননি এবং করার চেষ্টাও করেননি; বরং তিনি সত্যিকার অর্থেই রাষ্ট্র ও জনগণের কল্যাণ চিন্তা করতেন। কিন্তু তার উদ্ভাবিত ও বর্ণিত পদ্ধতির ওপর ভর করে মানব ইতিহাসে কী ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এবং কত হিটলার, মুসোলিনি, চসেস্কুর জন্ম হয়েছে, তা ইতিহাসের সচেতন পাঠকমাত্রই জানেন।

ক্রটিযুক্ত ও অপূর্ণাঙ্গ মানবরিচত দর্শনের ধারক-বাহকরা যে যুগে, যে দেশে অথবা যে পরিবেশেই জন্ম নিক না কেন, তাদের আদর্শিক সাদৃশ্য থাকার কারণে বর্ণ-ভাষা, স্থান ও কালের বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও তাদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটা অদ্ভুত সাদৃশ্য বিদ্যমান থাকে। যেমনটা হিটলার, মুসোলিনি, রাশিয়ার জার, স্ট্যালিন, লেনিন, তুরস্কের কামাল, ইউরোপের টিটো, চসেস্কু, প্রাচ্যে মার্কোসের মধ্যে দেখা যায়। এখানে ব্যক্তি মুখ্য নয়; মুখ্য হলো সেই দর্শন; যা এসব ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। আর এটা সর্বজনবিদিত যে, ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাস তার কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে। আমরা এ কথা এভাবেও বলতে পারি যে, ব্যক্তির কর্মকাণ্ড দেখেই বোঝা যায়, তার চিন্তা ও আদর্শের স্বরূপ কী।

পশ্চিমা সভ্যতার অন্যতম একটি মৌলিক ভিত্তি হলো Might is Right. অর্থাৎ জোর যার মুল্লুক তার। কিংবা বহুল আলোচিত সেই বিখ্যাত কথাটি Survival of the Fittest অর্থাৎ পৃথিবীতে টিকে থাকার অধিকার একমাত্র যোগ্যতম ও শক্তিধরেরই আছে। এখানে দুর্বলের কোনো স্থানে নেই।

এ মতবাদের ওপর ভিত্তি করেই হাল বিশ্ব রাজনীতি চলমান থেকেছে। বিশ্বমোড়ল যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, জার্মানি, ফ্রান্সসহ প্রায় সমগ্র ইউরোপই এ মতবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে সারা বিশ্বের দুর্বল রাষ্ট্র ও জাতিসমূহের ওপর আগ্রাসন চালিয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে উপনিবেশবাদ চালু রেখেছে এবং তাকে টিকিয়ে রেখেছে। পৃথিবীর আনাচে-কানাচে কলোনিয়াল স্টেট তৈরি করে তারা কোটি কোটি মানুষের ওপর শোষণ চালিয়েছে নির্মম ও বর্বরতম পদ্ধতিতে। তাদের দৃষ্টিতে এই কোটি কোটি বনি আদম দুর্বল, অযোগ্য। তাই এদের মানুষের মতো মর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার কোনো অধিকার নেই। মোড়লরা সবল বলে তারা বিশ্বের কোটি কোটি দুর্বলকে বেঁচে থাকার অধিকার পর্যন্ত দিতে রাজি নয়। এই দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই পৃথিবীতে দুর্বল ও অসহায় জাতিগুলো সবল ও শক্তিশালী জাতি দ্বারা যুগ যুগ ধরে নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত হয়ে আসছে।

এ ধারা কিন্তু আধুনিক বিশ্বেও বিন্দুমাত্র লোপ পায়নি; বরং সভ্যতার উন্নয়নের সাথে সাথে আরও বেশি জোরাল হয়েছে। আধুনিক সভ্যতার ধারক আমেরিকা বিশ্ববাসীর চোখের সামনেই রেড ইন্ডিয়ানদের নৃশংস ও নির্মমভাবে বিনাশ করেছে। একেবার হাল আমলে বসনিয়ায় মুসলমানদের, রুয়ান্ডায় তুতশিদের, ইরাকে কুর্দিদের, ফিলিস্তিনে ফিলিস্তিনিদের, মিন্দানাও ও কাশ্মীরে মুসলমানদের, প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধদেরসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংখ্যালঘু ও দুর্বল অসহায়দের নির্মূল করেছে (কে?)। এখনও সে ধারা পূর্ণোদ্যমে চলছে। তারা বিশ্বাস করে যে, শুধু তাদেরই এ বিশ্বে স্বদর্পে টিকে থাকার অধিকার আছে। অন্যদিকে দুর্বলদের নিজস্ব স্বকীয়তা ও স্বাধীন সত্তা নিয়ে চলার কোনো অধিকার নেই।

আধুনিক বিশ্ব সভ্যতায় পশ্চিমা সভ্যতার প্রভাব অনস্বীকার্য এক বাস্তবতা। বরং বলা চলে তারাই সভ্যতা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অধিষ্ঠিত হয়ে আছে। এই পশ্চিমা সভ্যতাটি যে চিন্তা-চেতনার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তার অনিবার্য পরিণতি হলো উপরোল্লিখিত অবস্থা। সে দুর্বলকে কখনোই সহ্য করে না, তার সঙ্গে উন্নত ব্যবহার তো দুরের কথা! দুর্বলের আলাদা স্বকীয় অস্তিত্বই সে বরদাশত করতে প্রস্তুত নয়। যে প্লেটোর চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে এই পশ্চিমা সভ্যতা গড়ে উঠেছে সেই প্লেটো তার Gorgias-এ ভয় দেখিয়ে, তর্জন-গর্জন করে, জোর খাটিয়ে অন্যের ওপর খবরদারি করার এক ফ্যাসিস্ট চরিত্র (Bully Boy) এঁকেছেন। তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, কেবল শক্তিমানেরই অধিকার আছে শাসন কর্তৃত্ব করার। আশ্চর্যের বিষয় হলো, তিনি একদিকে এ চিত্র এঁকেছেন, অন্যদিকে রাষ্ট্র প্রশাসনে সম্পদশালীদের অংশীদারিত্বের বিরোধিতা করেছেন।

আজকের বিশ্ব সভ্যতা মুলত পশ্চিমা সভ্যতা। এ সভ্যতা দুর্বলের ওপর কঠোর হতে খুবই তৎপর ও অতিমাত্রায় উৎসাহী। কিন্তু শক্তিমানের সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না; সে সাহস তার নেই। ন্যায্য স্বার্থ রক্ষায় এবং অন্যায়ের প্রতিবাদে থাকে নিশ্চুপ, নিথর। ক্ষেত্রবিশেষে অন্যায় ও জুলুমের সহযোগী হয়। যে প্লেটোকে আজকের পশ্চিমা দর্শনের জনক বলা হয়, সেই জনকই ছিলেন এমন সুবিধাবাদী চরিত্রের অধিকারী। তাহলে তার অনুসারীরা সবার প্রতি সাম্যের নজর দেওয়ার সেই চরিত্রগুণ কেমন করে অর্জন করবে, যা তাদের জনকের চরিত্রেই ছিল না।

খ্রিষ্টপূর্ব ৪০৪ সালে স্পার্টা (Sparta) নগরবাসী এথেন্স দখল করে নেয়। বিজয়ী বাহিনী এথেন্সকে শাসন করার জন্য ত্রিশ সদস্যের একটি কমিশন গঠন করে। নগর শাসন, উন্নয়ন, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের সকল ক্ষমতা এই কমিশনকে প্রদান করা হয়। এ কমিশনের অধিকাংশ সদস্যই ছিলেন স্থানীয় ধনাঢ্য ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ।

এথেন্সের শাসনক্ষমতার ওপর নিরঙ্কুশ অধিকারপ্রাপ্ত হয়ে এ কমিশন খুব শীঘ্রই মূর্তিমান উৎপীড়ক ও স্বেচ্ছাচারী শাসকগোষ্ঠী হিসেবে আবির্ভূত হয়। এই প্রজাপীড়ক, স্বেচ্ছাচারী শাসকগোষ্ঠী তাদের সকল ক্ষমতা ও সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজ নিজ ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ উদ্ধারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ইতিহাসের পাতায় আজও এই তিরিশ সদস্যবিশিষ্ট কমিশন কুখ্যাত হয়ে আছে 'Thirty Tyrant' নামে। মজার ব্যাপার হলো, এই ত্রিশ সদস্যবিশিষ্ট কমিশনের মধ্যে প্লেটোর এক মামা ছিলেন, যার নাম ছিল Critias। চোখের সামনে এই ত্রিশ সদস্যের কমিশন কর্তৃক অন্যায় অবিচার সংঘটিত হতে দেখেও প্লেটো মুখ খোলেননি। এমনকী তার পরবর্তী কোনো লেখায়ও এ শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা পর্যন্ত করেননি।

প্লেটোর হাজার বছর পরে আজ বিশ্বের দেশে দেশে, এমনকী আমাদের দেশেও দেখা যায় এই চিন্তা-চেতনার অনুসারীরা যখন রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে পান, তখন তারাও সেই কুখ্যাত 'Thirty Tyrant'-এর মতো প্রজাপীড়ক, স্বেচ্ছাচারী ও বেপরোয়া শাসকে পরিণত হোন। এসব জনদরদী ও তথাকথিত মানবতাবাদী নেতারা যখন তাদের চেয়ে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালীদের মুখোমুখি হন অথবা কোনো গন্ধ পান, তখন আর কোনো নীতিবোধ তাদের ভেতরে কাজ করে না। অনেক কিছু দেখেও তারা না দেখার ভান করে থাকেন। এর অনেক উদাহরণ আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে।

এদের কাছে নৈতিকতার কোনোই মূল্য নেই। এরা যেকোনো প্রয়োজনে, যেকোনো ক্ষেত্রে এবং যেকোনো সময়েই নৈতিকতার সংজ্ঞা পালটে ফেলতে পারে। তা ছাড়া নৈতিকতার কোনো উন্নত ও আদর্শ সংজ্ঞাও তাদের কাছে নেই। ফলে এ সভ্যতার ধারক-বাহকরা কখনোই উন্নত নৈতিকতার চর্চা করতে পারে না। Sir Karl Popper নৈতিকতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন–

> 'The Criteria of Morality is the Interest of the State, Morality is nothing but Political Hygiene.'
>
> 'রাষ্ট্রের স্বার্থই নৈতিকতা। নৈতিকতা রাজনৈতিক আচার-আচরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।'[৩]

অপরদিকে প্লেটো নৈতিকতার ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন-

> 'Morality is only the Self Interest of the Stronger'
>
> 'শক্তিমানদের ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষাই হলো নৈতিকতা।'[৪]

তাহলে অবস্থাটা কী দাঁড়াল? নিজেদের স্বার্থরক্ষা, ক্ষমতার্জন, খেয়াল-খুশি বাস্তবায়ন ও অর্জনে বৈধ-অবৈধ যে পন্থাই অবলম্বন করা হোক না কেন, রাষ্ট্রের কর্তাধরদের জন্য তা নৈতিক। তাকে অনৈতিক ও অপরাধ হিসেবে গণ্য করা যাবে না। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, হাসি-কান্না, ব্যথা-বেদনা ও চিন্তা-চেতনার কোনো মূল্যই নেই। শাসকদের কাছে অন্যায়, অনৈতিক বলে কিছুই থাকে না। তারা যাই করুক না কেন, তাই হলো ন্যায়, নৈতিক!

এই যদি হয় দর্শন, তাহলে সেই দর্শনের ফলশ্রুতিতে চেঙ্গিস, হালাকু, হিটলার, স্ট্যালিন ছাড়া আর কে আবির্ভূত হতে পারে? এই যদি হয় শাসক, ক্ষমতাধর ও শক্তিশালী গোষ্ঠীর চিন্তা, তাহলে তারা কেন উন্নত ও সর্বজনীন কোনো নৈতিকতা-দর্শনের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেবে?

ইতিহাস স্বাক্ষী, এই গোষ্ঠীর সম্মুখে যখনই কোনো উন্নত নৈতিকতা, আদর্শ ও দর্শনের কথা বলা হয়েছে, তখনই তারা এর বিরোধিতা করেছে। কারণ তারা জানে, তাদের সম্মুখে যে নতুন আদর্শ ও দর্শনকে পেশ করা হচ্ছে, তা কখনোই তাদের হীন স্বার্থকে রক্ষা করবে না। কেননা, তাদের স্বার্থ তাই, যা সমাজের আপামর জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থি। এরাই সমাজে লাখো-কোটি মানুষের রক্তের ওপরে গড়ে তোলে আভিজাত্যের প্রাসাদ। পৃথিবীতে কোনো উন্নত দর্শন এবং সর্বজনীন আদর্শ কখনোই এ ধরনের জুলুম ও স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেবে না। এ কথা তারা খুব ভালো করেই জানে। তাই যখনই তাদের সম্মুখে কোনো উন্নত দর্শন ও আদর্শের কথা বলা হয়েছে, তখনই তারা সর্বস্ব ক্ষমতা ও শক্তি দিয়ে তা ঠেকাতে উঠে-পড়ে লেগেছে। যারা এ উন্নত আদর্শের ধারক-বাহক হয়ে সর্বসাধারণের কাছে পয়গাম নিয়ে গেছে, তাদেরকেই তারা জানের দুশমনে পরিণত করেছে।

পৃথিবীতে মানবজাতির ইতিহাসের বয়স কম হয়নি। বিশ্ব ইতিহাসে প্রতিটি যুগে, প্রতিটি জাতির ইতিহাসেই এই বাস্তবতার সন্ধান পাওয়া যাবে। ইতিহাসের সচেতন পাঠকমাত্রই জানেন, সমাজের এসব আদর্শবান ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর ওপর কী নির্মম নিষ্ঠুরতা এবং অবর্ণনীয় পাশবিকতায় নির্যাতন চালানো হয়েছে। কত নির্মমতার সঙ্গে সমাজের বঞ্চিত জনতাকে শোষণ করা হয়েছে। তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি কিংবা তিল পরিমাণ দয়াও তারা প্রদর্শন করেনি।

তাদের আদর্শেই যখন এ রকম কোনো শিক্ষা দেওয়া হয়নি, তখন তারা কেন অসহায়, নিপীড়িত মানবগোষ্ঠীর প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে? কেন তাদের সম্মানজনক পৃথক স্বকীয় অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেবে? আর কেনই বা তাদের কল্যাণের জন্য নিজেদের স্বার্থ থেকে বিন্দু পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করবে? তাই এসব অসহায় মানবগোষ্ঠীর জন্য তারা কখনই কোনো ছাড় দেয়নি।

আর পৃথিবীর ভবিষ্যৎ দিনগুলোতেও এ দর্শনের ভিত্তিতে গড়ে উঠা সমাজ বা রাষ্ট্র কোথাও কোনো দয়া-মায়া বা ত্যাগ-তিতিক্ষার উদাহরণ খাড়া করবে, এটা এক কথায় অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার। যে আদর্শ, শিক্ষা, বিশ্বাস ও দর্শনের কোথাও এ ধরনের মানবতাবাদী এবং পরোপকারী কর্মকাণ্ড নিঃস্বার্থভাবে সম্পাদন করার পরামর্শ দেওয়া হয়নি, সেখানে কীভাবে এমনটা আশা করা যায়। সমকালীন বিশ্ব ইতিহাস হতে দু-চারটি ঘটনার উল্লেখ করলেই এ মন্তব্যের পক্ষে যথেষ্ট অকাট্য যুক্তি পাওয়া যাবে।

১৯৭১ সালে ফ্রান্স সরকার তার দেশের নাগরিকদের উন্নত সুযোগ-সুবিধা ও সেবা নিশ্চিত করার জন্য মানবাধিকার সনদ প্রণয়ন করে। তবে তারা একইসঙ্গে এ ঘোষণাও প্রদান করে যে, এ সনদে বর্ণিত সকল অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা শুধু ফ্রান্সের নাগরিকদের জন্য প্রযোজ্য হবে। ফ্রান্সের দখলে বা তাদের শাসনক্ষমতার আওতায় উপনিবেশসমূহের লোকজন এ আইনে বর্ণিত কোনো সুযোগ সুবিধা ও অধিকার পাবে না।[৫]

অপরদিকে ব্রিটেনের ম্যাগনাকার্টা শুধু ব্রিটিশ নাগরিকদের স্বার্থ ও অধিকারকে নিশ্চিত করে বিশ্বব্যাপী ইতিহাসের পাতায় পাতায় এ সনদের জয়গান গেয়ে বেড়িয়েছে। নিজেদেরকে বড়ো মানবতাবাদী ও মহান জাতি বলে প্রচার করেছে। অপর দিকে তারাই আবার ঘোষণা করেছে যে, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহের লোকজনের জন্য এ সনদ কার্যকর হবে না। অর্থাৎ তারা ম্যাগনাকার্টার আওতায় কোনো রকম সুযোগ-সুবিধা পাবে না।

এ সভ্যতার অন্যতম দুই স্বঘোষিত পুরোধা কেবল নিজেদের সকল প্রকার মানবীয় সুযোগ-সুবিধার হকদার মনে করলেও তাদের উপনিবেশসমূহের মানুষদের আদতে মানুষই মনে করেনি। তারা নিজেদের প্রয়োজনে সকল আইন-কানুন রচনা করে নিজেদের ক্ষমতা অর্জন, সংহত ও রক্ষণাবেক্ষণ করেছে। কিন্তু তাদের স্বরচিত ওইসব আইনে তাদেরই শাসন ক্ষমতার আওতার কোটি কোটি নিঃস্ব, গরিব, অশিক্ষিত উপনিবেশবাসীদের জন্য বিন্দুমাত্র ছাড় দেওয়ার কোনো সুযোগই রাখা হয়নি। এর একমাত্র কারণ এই যে, তারা তাদের আদর্শের মহান পিতার কাছ থেকে নৈতিকতার সংজ্ঞা হিসেবে এটাই শিখেছে যে, শক্তিশালী, ক্ষমতাবান ও কায়েমি স্বার্থগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষাই হলো সবচেয়ে বড়ো নৈতিকতা। তাই তারা সমগ্র বিশ্বব্যাপী এই উন্নত(?) নৈতিকতার বাস্তব নমুনা প্রতিষ্ঠা করেছে।

আরও দেখুন, বিশ্বের সবচেয়ে(?) সুশিক্ষিত ও উন্নত জাতি বলে সগর্বে পরিচয়দানকারী ব্রিটিশ সরকার শুধু শরীরের রং কালো হওয়ার কারণে নিগ্রো আফ্রিকানদের ওপরে কী অপমানকর বর্ণবাদী ও বীভৎস আইন চাপিয়ে দিয়েছিল!

সেখানে রাস্তার পার্শ্বে পাবলিক টয়লেটের ক্ষেত্রেও আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠ থাকত। যার একটিতে লেখা থাকত For Whites only, অর্থাৎ শুধু সাদা চামড়ার ব্রিটিশদের জন্য। আর পাশেই অপক্ষোকৃত অনুন্নত একটি টয়লেটের গায়ে লেখা থাকত For Dogs And Black only অর্থাৎ তাদের পোষা কুকুর ও স্থানীয় কালো নিগ্রোরা এ টয়লেট ব্যবহার করবে!

মানবতার জন্য কী জঘন্য, বর্বর ও অপমানজনক প্রথা! ভাবতেই লজ্জায় মাথা হেট হয়ে আসে। এ ধরনের চরম অপমানকর ও মানবতাবিরোধী আইন রচনা, চালু, এর লালন, প্রসার ও প্রয়োগ করেছিল আজকের বিশ্বের সবচেয়ে মানবতাবাদী(?) বলে পরিচিত এই ব্রিটিশ সরকার।

বিশ্ববাসী এ অপমানজনক আইনের বিরুদ্ধে ঘৃণা, ক্ষোভ ও আক্রোশে ফেটে পড়লেও বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে ব্রিটিশ সরকার যুগের পর যুগ ওই জঘন্য আইন চালু রেখেছে। সেইসঙ্গে এই আইনের প্রতিবাদকারী জনতাকে নির্মম অত্যাচারের মাধ্যমে হত্যা করেছে। উন্নত সভ্যতার দাবিদারগণ নির্লজ্জের মতো চোখ-কান বুঁজে এই মানবতাবিরোধী আইনের দ্বারাই তাদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষার্থে দেশ শাসন করেছে। তাদের সেই বর্ণবাদী আইনবিরোধী আন্দোলনের জীবন্ত কিংবদন্তি নেলসন ম্যান্ডেলা মাত্র কিছুদিন আগে পরলোকগত হয়েছেন। তিনি তাঁর জীবনের ত্রিশটি বছর কাটিয়েছেন কারাগারের লৌহ যবনিকার আড়ালে। তাঁর অপরাধ শুধু এই ছিল যে, তিনি ব্রিটিশ সভ্য(?) সরকারের এই জঘন্য বর্ণবাদী প্রথার বিরুদ্ধে আপসহীন ভূমিকা অবলম্বন করে প্রতিবাদ জানিয়ে গেছেন।

জাতিসংঘ ১৯৭৩ সালে উক্ত বর্ণবাদী আইন বাতিলের জন্য এক বিল নিয়ে আলোচনা করে। ওই বছরই ৩০ নভেম্বর তা সাধারণ অধিবেশনে সদস্যদের সামনে ভোটাভুটির জন্য বিলটি উপস্থাপন করে। তখন দুটো দেশ এই বিলের বিরুদ্ধে তাদের ভেটো পাওয়ার প্রয়োগ করে বিল পাশের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল। সেই দুটো দেশ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য! অর্থাৎ আজকের বিশ্বের স্বঘোষিত সবচেয়ে বড়ো দুই(?) মানবতাবাদী(?), সভ্য(?) ও উন্নত রাষ্ট্র।[৬]

আজকের বিশ্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মানবতার বৃহত্তম ঐক্য এবং এই ধ্যানধারণা আজ কল্পনা বিলাস বলেই মনে হয়। অথচ উন্নত ও কালজয়ী সভ্যতার জন্য মানুষের মধ্যে বৃহত্তম ঐক্য স্থাপন অপরিহার্য উপাদান। এটা ছাড়া সভ্যতা কোনোমতেই স্থায়িত্ব পেতে পারে না। কিন্তু বর্তমান সভ্যতা যে আদর্শ ও চিন্তাধারার ওপর ভিত্তি করে চলছে, তার দ্বারা মানবতার সর্বজনীন ও বৃহত্তম ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না।

বৃহত্তর মানবতার ঐক্য মানে হলো দুর্বল ও সবলের মধ্যে, ধনী ও গরিবের মধ্যে, সাদা ও কালোর মধ্যে, উঁচু ও নিচুর মধ্যে এবং প্রাচ্যবাসী ও পাশ্চাত্যবাসীর মধ্যে ঐক্য। এদের ভাষা-বর্ণ-গোত্র, দৃষ্টিভঙ্গি ও কালচারের মধ্যে পার্থক্য সত্ত্বেও মানুষ হিসেবে ঐক্য হতে পারে এবং মানবতার বৃহত্তম স্বার্থে এ ঐক্য হওয়া উচিত।

কিন্তু এ সভ্যতার আওতায় দুর্বলকে যখন সবলের কাছে আত্মহুতি দিতে হয়। ধনীরা যখন গরিবের জন্য বিন্দুমাত্র ছাড় দিতেও প্রস্তুত নয়, সাদারা যখন কালোদের সঙ্গে এক টয়লেটও ব্যবহার করতে প্রস্তুত নয়, তখন ঐক্য হবে কী করে? এ সভ্যতার প্রতিটি দুর্বল ব্যক্তি বা জাতিই নিজের বা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে সবল হওয়ার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। ফলে শক্তিমান ও দুর্বল উভয়ের মধ্যে সীমাহীন নিরন্তর প্রতিযোগিতা চলছে। তা থেকে বাঁচার কোনো সুযোগই অবশিষ্ট নেই। 'দুর্বল হলেই আমাকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে' এ ধারণা ও ভীতি সর্বদাই দুর্বল ব্যক্তি, জনগোষ্ঠী ও জাতিকে তটস্থ করে রাখছে। ব্যস্ত করে তুলছে শক্তিতে বলীয়ান হওয়ার জন্য। পার্শ্বে অবস্থিত সবল ও শক্তিশালী ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রকে সে সবসময় সন্দেহের চোখে দেখছে। ঠিক বনের গহীন পথে চলতে গিয়ে হরিণ কোনো বাঘের সামনে পড়লে যেমন করে দৃষ্টি মেলে থাকে।

অপরদিকে সবল রাষ্ট্র বা জাতি চিন্তা করছে, আমার সবল অস্তিত্বের পার্শ্বে দুর্বল রাষ্ট্র বা গোষ্ঠী এখনও টিকে আছে কী করে? এখনও কেন তারা সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক বা আদর্শিকভাবে আমার সত্তায় বিলীন হয়ে গেল না? তাহলে কি আমি সবল নই? আমার শক্তি-সামর্থ্যে কি কোনো ত্রুটি রয়ে গেছে? তাহলে কি নিজের শক্তিমত্তা, যোগ্যতা ও দাপটের পরিচয় দিতে পার্শ্ববর্তী দুর্বলের ওপর হম্বি-তম্বি, তর্জন-গর্জন শুরু করে দেবো? প্লেটো যেমনটা তার Gorgias Gi Bully Boy চরিত্রে এঁকেছেন?

তাকে এ রকম হতেই হয়। কেননা, তার মাথা-মগজের মধ্যে স্বীয় আদর্শের জনক ও পিতা প্লেটোর চিন্তা-চেতনা ঢুকে পড়েছে। আর এ চিন্তা-চেতনা ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিশ্বাসে আশ্রয় পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই জাতিতে জাতিতে, গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, গোত্রে গোত্রে বা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে এক ধরনের নিরবিচ্ছিন্ন ও চিরন্তন প্রতিযোগিতা চালু হয়ে যায়। ফলে প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে মানুষে মানুষে অনৈক্য আর হানাহানির পথ আরও বেশি প্রশস্ত হতে থাকে। সহিংসতার আরও বেশি বিস্তৃতি ঘটে। অনাগত ভবিষ্যতে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের আরও বেশি কার্যকর ক্ষেত্র তৈরি হয়। এ যুদ্ধ প্রতিনিয়তই চালু থাকে, এখনও আছে। আমাদের বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি, নিকট অতীত ইতিহাস ও ঘটনাপ্রবাহের দিকে নজর দিলে দেখব যে, নিরবচ্ছিন্নভাবেই এ যুদ্ধ চালু আছে।

যে মৌলিক দর্শনের ভিত্তির ওপর এ সভ্যতা স্থাপিত, তার অনিবার্য পরিণতিই হলো মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে সংঘাত ও যুদ্ধ। এ কারণেই এই সভ্যতা মাত্র এক শতাব্দীর মধ্যে আমাদেরকে দু-দুটো ভয়াবহ বিশ্বযুদ্ধ উপহার দিয়েছে। শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেই হতাহত হয়েছে ছয় কোটিরও বেশি মানব সন্তান। ঘর-বাড়ি ধ্বংস হয়েছে প্রায় পনেরো কোটি মানুষের। জন্মভূমি ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়েছে প্রায় আড়াই কোটি মানুষ। আর এ যুদ্ধে এত পরিমাণ সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে যে, তা যদি সমগ্র বিশ্বের মানুষের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করে দেওয়া হতো, তাহলে আগামীতে গোটা বিশ্বের মানুষ পুরো একশত বছর যাবতীয় মৌলিক প্রয়োজন মিটিয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারত। এ তথ্য আমার ব্যক্তিগত আন্দাজ-অনুমান ভিত্তিক নয়; বরং জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক প্রণীত রিপোর্ট অনুযায়ী প্রমাণিত।[৭]

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে খোঁজ নিয়ে দেখুন। আমি যখন এ লেখা লিখছি, তখনও ইরাক, আফগানিস্থান, বসনিয়া, মিন্দানাও, কাশ্মীর, ইয়ামেন, রুয়ান্ডা, আরাকান, স্পেন, দক্ষিণ আমেরিকা, লেবানন ও ফিলিস্তিনে যুদ্ধ চলছে। খুব নিকট ভবিষ্যতে এসব যুদ্ধ থেমে যাবে এবং সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে, এমন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না; বরং সমস্যা আরও বেশি জটিল ও ভয়াবহ হবে। সে সম্ভাবনা ও আশঙ্কাই বেশি। বর্তমান সভ্যতার আওতায় নিকট অতীতের ইতিহাসে একটা দিনও এমন পাওয়া যাবে না, যে দিনটা এ পৃথিবীতে যুদ্ধ ও সংঘাতহীন অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছে। বিনা যুদ্ধে সুখে-শান্তিতে কাটানোর মতো অঢেল সম্পদ, সুযোগ-সুবিধা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষতা সত্ত্বেও এ বিশ্ববাসী একটি দিনও শান্তিতে উৎকণ্ঠাহীন কাটাতে পারেনি। বিশ্ববাসীর সকল সুখ-শান্তি হরণকারী এসব সংঘাত ও যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে কেবল ব্যক্তি ও জাতিগত সংকীর্ণ স্বার্থের জন্যই। কোনো উন্নত আদর্শ প্রতিষ্ঠা বা মানবতার বৃহত্তম কল্যাণের জন্য এসব যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। এসব যুদ্ধ মানবতার কল্যাণের জন্য নয়; বরং শত্রুপক্ষকে সমূলে বিনাশ করার জন্যই সংঘটিত হয়েছে।

বর্তমান বিশ্বে উন্নত সভ্যতার ধ্বজাধারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ত্রিশ বছর ধরে দূরপ্রাচ্যের ভিয়েতনামে আগ্রাসী যুদ্ধ চালায়। *লন্ডন টাইমস* পত্রিকার সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী সে যুদ্ধে ৩৬ লাখ ১২ হাজার মানব সন্তান নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ১৬ লাখ শিশু এবং এতিম হয়েছে ৯ লাখ শিশু। আরও দুঃখজনক হলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ যুদ্ধে ভিয়েতনামের মাঠ, বন ও পরিবেশ চিরতরে ধ্বংস করে দিয়েও ক্ষান্ত হয়নি। ওপরন্তু সে স্থানকে মনুষ্য বসবাসের অনুপোযোগী হিসেবে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ১ কোটি ৯০ লাখ গ্যালন কেমিক্যাল বিষ সারা দেশে ছড়িয়ে দেয়!

লক্ষ্য খুবই পরিষ্কার; কোটি কোটি মানুষ যারা নিহত হলো, তাদের ভবিষ্যৎ বংশধররাও যেন অনাহারে-দুর্ভিক্ষে তিল তিল করে রোগে-শোকে মৃত্যুবরণ করে।

কী জঘন্য ও নির্মম প্রতিহিংসা তা কল্পনাও করা যায় না! নৈতিকতাহীন সভ্যতা মানুষের জন্য কতটা বিপর্যয়কর, ধ্বংসাত্মক, বিবেকবর্জিত ও কাণ্ডজ্ঞানহীন হতে পারে, তা প্রমাণে এই একটি ঘটনাই যথেষ্ট।

বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতা, যাকে উন্নত সভ্যতা বলে প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বের ছোটো-বড়ো অধিকাংশ দেশই ব্যস্ত, সেই সভ্যতার শিক্ষানুযায়ী রাজনীতি শুধু ক্ষমতা অর্জন এবং কোনো বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী, জাতি বা দেশের স্বার্থ রক্ষা ও আদায়ের মাধ্যম ছাড়া আর কিছুই নয়। রাজনীতির নামে ব্যক্তিস্বার্থ আদায়ের জন্য নীতি ও নৈতিকতা বিবর্জিত যেকোনো কাজ এবং মানবতাবিরোধী যেকোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা– এ সভ্যতা ও তার ধারক-বাহকদের দৃষ্টিতে অন্যায় কিছু নয়; বরং তা সফল রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবেই বিবেচিত হয়ে থাকে। অন্য মানুষ, গোষ্ঠী বা জাতির জন্য তা যতই বিপর্যয়কর ও ক্ষতির কারণ হিসেবে প্রমাণিত হোক না কেন।

এদের কাছে রাজনীতির মুখ্য উদ্দেশ্য, মানবতার কল্যাণ নয়; বরং যুদ্ধ। অর্থাৎ রাজনীতি এদের কাছে যুদ্ধের মতোই। যুদ্ধের মাধ্যমে যেমন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল ও ধ্বংস করা যায়, তাকে গোলাম বানানো যায়, তেমনি রাজনীতির মাধ্যমেও তারা প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করতে চায়। রাজনীতিকে তারা যুদ্ধেরই একটি পরিবর্তিত রূপ হিসেবে দেখে থাকে এবং যেকোনো মূল্যেই তারা এ যুদ্ধে জিততে চায়। খ্যাতিমান তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ক্লাসেউইজ (Clausewitz) তাঁর লেখা এক সামরিক নিবন্ধে লিখেছেন–

> 'War is Merely the Continuation of Politics by Other Means.'
>
> অর্থাৎ 'রাজনীতি আর কিছুই নয় পরিবর্তিত পন্থায় যুদ্ধের ধারাবাহিকতা মাত্র।'

অপর এক দার্শনিক ও রাজনীতিকে দেখেছেন এভাবে-

> 'The Continuation of War by Other Means.'[৮]

এখানেও পশ্চিমা দর্শনের আরেক ধারক-বাহক যুদ্ধকে রাজনীতি হিসেবেই দেখেছেন। এ আদর্শের ভিত্তিতে এবং এ আর্দশের ধারক-বাহক দ্বারা যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তা যেখানেই গড়ে উঠুক না কেন, মানুষের রক্ত আর অশ্রুর বন্যা বইয়ে ছেড়েছে। মানবতা, প্রেম, ভালোবাসা ও মানুষত্বকে এরা নির্মম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে উপহাস ও পদদলিত করেছে। এই আদর্শের সন্তানেরাই স্পেনে লাখো আদম সন্তানকে পুড়িয়ে মেরেছে। জার্মানি ও বসনিয়ায় লাখো মানব সন্তানকে জবাই করেছে। এরাই তো জেরুজালেম পদানত করার পর লাখো নারী-শিশু আর বৃদ্ধের রক্তে রাস্তা ঘাট ভাসিয়েছে। অথচ এই সেই জেরুসালেম, যেখানে মহাবীর সালাহউদ্দিন নগরবাসীদের হাতের মুঠোয় পেয়েও ক্ষমা করে দিয়েছিলেন এবং বিজয়ী ও বিজিত সকল নাগরিকের জন্যই সমান সুযোগ-সুবিধা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেছিলেন।

কমিউনিস্ট সভ্যতা : উদ্ভব ও পরিণতি

পৃথিবীতে আল্লাহ বা স্রষ্টাহীন ধ্যানধারণার ভিত্তিতে একটি সভ্যতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হয়েছিল। বর্তমান বিশ্বে তা কমিউনিস্ট আন্দোলন নামে পরিচিত। এ আন্দোলনের ভিত্তিতে গড়ে উঠা সমাজব্যবস্থাকে একটা সভ্যতা হিসেবে অভিহিত করা যুক্তি সংগত কি না, তা ভেবে দেখা দরকার। কারণ, মাত্র কয়েকটি দশক তা মানব সমাজে চালু রাখার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চলেছিল। এ প্রচেষ্টার শৈশবেই তা ভেঙে পড়েছে। তবুও এ নতুন আদর্শটি সারা বিশ্বে এবং চিন্তাবিদদের মন-মানসে ব্যাপক নাড়া দিতে সক্ষম হয়। সক্ষম হয় বিশ্ব সভ্যতাকে প্রবল এক ঝাঁকুনি দিতে।

উপস্থাপনে চমক ও নাটকীয়তা, ভিন্নমত দমনে সীমাহীন নৃশংসতা এবং ভবিষ্যতের ব্যাপারে কল্পনার রঙিন ফানুস রচনায় ব্যাপক দক্ষতার কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এ মতাদর্শের প্রতি বিশ্ব মানবতার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছিল। পশ্চিমা বিশ্বে গড়ে উঠা পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় শোষণ ও অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রতিবাদস্বরূপ অর্থনৈতিক বঞ্চনার অবসান, সমস্যার সমাধান এবং স্বাধীনতার চটকদার বুলি আওড়ে নিজ দেশে জারদের অত্যাচারে জর্জরিত মানুষের সহযোগিতা নিয়ে লেনিন কমিউনিস্ট আদর্শভিত্তিক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন এ আন্দোলনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠাতা। আর আদর্শিক প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩)। যিনি ধর্মকে আফিমের সঙ্গে তুলনা করে (Religion is the Opium of the People) মানুষের জীবন থেকে ধর্ম, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও রীতি-নীতিকে বিদায় করার এক ব্যাপক তোড়জোড় শুরু করেছিলেন। এরই অংশ হিসেবে ১৯২২ সালে মস্কোতে Godless Society বা খোদামুক্ত সমাজের গোড়াপত্তন করা হয়।

তার কিছুদিন পর ১৯২৫ সালে মস্কোতে এক অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় যে, পুরো রাশিয়া হতে ধর্মকে উচ্ছেদ করার অভিযান শুরু করতে হবে। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯২৯ সালে রাশিয়া তার রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে নাস্তিক্যবাদকে গ্রহণ করে। এর পরই পূর্ব ঘোষিত কার্যক্রম, অর্থাৎ ধর্ম ও ধর্মীয় মূল্যবোধ উচ্ছেদের অভিযান শুরু হয়। ১৯২৯ সাল থেকে নিয়ে পরবর্তী দশটি বছর ধরে অর্থাৎ ১৩৩৯ সাল পর্যন্ত প্রায় দশ লাখ লোককে হত্যা করা হয়। এ আন্দোলনের সূচনাকাল থেকে শুরু করে ধর্মহীন রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা পাওয়া পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে প্রায় পাঁচ কোটি মানুষকে হত্যা করা হয়। এর মধ্যে নিষ্ঠাবান মুসলমান, আলেম-উলামা মাশায়েখ, মসজিদের ইমাম, শিক্ষক, এ রকম মুসলমানের সংখ্যা ছিল প্রায় এক কোটি বিশ লাখ।

এক সাগর রক্ত আর অশ্রু, কোটি কোটি মানুষের হাহাকার আর আর্তচিৎকারের ওপর ভর করে গড়ে উঠা কমিউনিজম নামের এ মতবাদটি বিংশ শতাব্দীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ সময় ধরে মানবতার বুকের ওপরে জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে বসেছিল। মানবতার জন্য এত বড়ো হঠকারী ও মানবতাবিধ্বংসী মতবাদ সম্ভবত বিশ্ব ইতিহাসে আর দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না। পৃথিবী এ পর্যন্ত স্থায়ী-অস্থায়ী, ভালো-মন্দ যত মতবাদ দেখেছে ও শুনেছে, সেগুলোর মধ্যে কমিউনিজমই মানবতার জন্য সর্বপেক্ষা অবমাননাকর ও অকল্যাণজনক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

নিছক বস্তুবাদের ওপরেই কমিউনিজমের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। মানুষের ইন্দ্রিয় যার নাগাল পায় না, তার সবকিছুকেই এ মতবাদ অস্বীকার করে। এঞ্জেলস নিজেই বলেছেন, 'জড় পদার্থ বা বস্তুই পৃথিবীর একমাত্র আসল বিষয়। বিবেক, যা মানুষের দৃষ্টিতে দৃশ্যমান নয় এবং ইন্দ্রিয় যার নাগাল পায় না, তার ব্যাখ্যায় এই বস্তুবাদী আদর্শের ধারকরা বলেন, 'মানুষের বিবেক হচ্ছে তার ভেতরের বস্তু এবং তার পারিপার্শ্বিকতারই প্রকাশ।'[৯]

এ কথা মেনে নিলে তো বিবেকের উন্নত ও সর্বজনীন কোনো সংজ্ঞার অস্তিত্বই আর অবশিষ্ঠ থাকে না। কারণ, বস্তুর রূপ-গঠন-অবস্থা ও অবয়বের পরিবর্তন এবং অপরদিকে মানুষের পারিপার্শ্বিকতার উত্থান-পতন ও পরিবর্তন– এ উভয় অবস্থা অথবা দুটোর যেকোনো একটির প্রভাবে অতি স্বাভাবিকভাবেই মানুষের বিবেক বদলে যেতে পারে।

অর্থাৎ আজ যা বিবেকসম্মত, তাই আগামী দিনে বিবেকের বিচারে বর্জনীয় বলে পরিগণিত হতে পারে। বিশ্বের কোথাও একটি কাজ বিবেকসম্মত হিসেবে নন্দিত হলো। কিন্তু সময়, ব্যক্তি ও বস্তুর পরিবর্তন ও পারিপার্শ্বিকতাজনিত কারণে ওই একই কাজটি বিশ্বের অন্যত্র বিবেকহীন কাজ বলে নিন্দিত হবে। সত্য কথা বলা,

পরের ধন আত্মসাৎ না করা– এসবই বিবেকসম্মত কাজ। কিন্তু ওপরোল্লিখিত মতবাদে বিবেকসম্মত এই কাজ দুটোই অবস্থা ও পরিস্থিতির পরিবর্তনের কারণে কোথাও কখনো চরম বিবেকহীনতা বলে বিবেচিত হবে!

অর্থাৎ বিশ্বমানবতার সম্মুখে বিবেকের সর্বগ্রাহ্য, অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় কোনো মডেল থাকল না। ফলে চিন্তা ও কর্মের ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবীরূপে নৈরাজ্য সৃষ্টি হতে বাধ্য। আমরা ইতোমধ্যেই জেনেছি যে, সভ্যতা ধ্বংসের জন্য যে কয়টি ত্রুটি বা দুর্বলতা দায়ী, তার অন্যতম একটি হলো চিন্তার জগতে নৈরাজ্য।

অবাক করার বিষয় হলো, নৈরাজ্যবিশিষ্ট চিন্তা-চেতনা নিয়েই একটি নতুন সভ্যতা তৈরির প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে! এক বিখ্যাত কমিউনিস্ট তাত্ত্বিক WEBB-এর লেখা Communism নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে-

> 'যে কাজ সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য অপরিহার্য, তা ভালো হোক বা মন্দ হোক, ন্যায় হোক বা অন্যায় হোক, সেটি গ্রহণ করার নীতিই হচ্ছে সমাজতন্ত্রীদের ন্যায়-অন্যায় বিচারের মাপকাঠি।'[১০]

অর্থাৎ কমিউনিজম নামক এ আদর্শে নীতি-নৈতিকতার কোনো উন্নততর স্তর এবং চিরন্তন মডেল নেই। এর ফলে মানুষ স্বার্থপূজারি হতে বাধ্য। কারণ, স্বার্থই তার বিবেক। এ আদর্শ আর যাই করুক না কেন, কোনো উন্নত বিবেকসম্পন্ন চরিত্রের মানুষ তৈরি করতে পারে না। মানবতার জন্য এর চেয়ে আত্মবিনাশী অবস্থা আর কী হতে পারে!

এ মতবাদে মানুষের অস্তিত্ব, জীবন-রহস্য, বিশ্বজগৎ এবং বিশ্বজগতে মানুষের অবস্থান সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র দিক নির্দেশনা নেই। মানবাত্মা, এর উৎস, প্রকৃতি ও ইতিহাস সম্বন্ধে এ মতবাদ পুরোপরি অজ্ঞ। ফলে এ মতবাদ নিছক বস্তুগত লাভ ও জৈবিক ক্ষুধা নিবৃত্তির সংগ্রামে মানুষকে তার যাবতীয় শক্তি ও কর্মোদ্দীপনা নিয়োগ করতে বাধ্য করে। এখানে মানবীয় আবেগ-অনুভূতি, প্রেম-ভালোবাসা, মায়া-মমতা ও দায়িত্ববোধের কোনো মূল্য নেই, স্বীকৃতিও নেই। তারা মানুষকে একটি পুরোপরি যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই ভাবতে প্রস্তুত নয়। মানুষের ব্যক্তিগত ও মৌলিক আজাদি অধিকার ও স্বাতন্ত্র্যবোধের কোনো মূল্য তাদের কাছে নেই। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের প্রয়োজনে প্রতিটি মানুষকে তার সকল সুখ-শান্তি ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বিসর্জন দিতে হবে। ব্যক্তিস্বাধীনতাকে এখানে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। মানুষের স্বকীয়তা, বৈশিষ্ট্য, স্বাধীন অবস্থান ও অস্তিত্বকে করা হয়েছে একেবারেই গৌণ ও মূল্যহীন।

> 'The state is to come first and people have to fit in with the interests and needs of the state. There is to be censorship in the arts and in the material allowed into education. Nothing that threaten the state is to be permitted.'
>
> অর্থাৎ 'সবার আগে রাষ্ট্র এবং জনগণকে রাষ্ট্রের চাহিদা ও স্বার্থের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে। শিল্পকলা ও শিক্ষার বিষয়বস্তুতে এক ধরনের বিধিনিষেধ থাকতে হবে। রাষ্ট্রের প্রতি হুমকিস্বরূপ এমন কোনো কিছুরই অনুমতি দেওয়া যাবে না।'[১১]

এ মতবাদ ঘোষণা করে, বুর্জোয়া ও কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী সমাজ থেকে উৎখাত এবং সর্বহারাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে মানব প্রকৃতি ও সমাজব্যবস্থায় এক বিরাট ও যুগান্তকারী বিপ্লব আপনাতেই ঘটার কথা ছিল।

কিন্তু এখানে দুটো বিষয়ের জবাবদানে তারা অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়। প্রথমত, কোন সে স্থায়ী পদ্ধতি, যার ভিত্তিতে এ মহা পরিবর্তন সূচক বিপ্লবের যাবতীয় কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে? দ্বিতীয়ত, তাদের দৃষ্টিতে বুর্জোয়া ও কায়েমি স্বার্থবাদীদের উৎখাতের পরে যে গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসীন হবে, তারাও যদি পুনরায় ওই একই রকম বুর্জোয়া ও কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে, তবে তা প্রতিরোধ ও সংশোধনের রাস্তা কী?

এ দুটো মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সমাধান এই মতবাদের ধারক-বাহকদের কাছে না থাকার কারণেই বাস্তবে দেখা গেল, যে বুর্জোয়া কায়েমি শাসকগোষ্ঠী নিজেদের হাতে দেশ-সমাজ ও রাষ্ট্রের শাসন ক্ষমতা নিল। তারা নিজেরাই শেষ পর্যন্ত কোটি কোটি বনি-আদমের মাথার ওপরে বুর্জোয়া ও কায়েমি শাসকগোষ্ঠীর চেয়েও আরও বেশি ভয়ংকর হয়ে চেপে বসল। তাদের নিয়ন্ত্রণের জন্য কোনো উন্নত সত্তা, প্রতিষ্ঠান বা নৈতিক আদর্শ না থাকার কারণে তারা নিজেরাই ইতিহাসের নিকৃষ্টতম উৎপীড়ক ও অত্যাচারী শাসকের বেশে আত্মপ্রকাশ করল। যে গোষ্ঠীর নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে জনগণের মুক্তির নামে তারা ক্ষমতায় আসলো, অত্যাচার ও নিপীড়নের মাত্রা বিচারে পূর্বসূরিদেরকেও তারা ছাড়িয়ে গেল।

কার্ল মার্কস-এর আদর্শে প্রতিষ্ঠিত কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং উত্তরসূরি যোশেফ স্ট্যালিন ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত দশ বছরে মোট দশ লাখ লোককে হত্যা করে। এ ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে, যোশেফ স্ট্যালিন এক বছরে যত লোককে হত্যা করেছে, জার শাসনামলে একশত বছরেও তত লোককে হত্যা করা হয়নি। অথচ আশ্চর্য ও পরিতাপের বিষয় হলো,

এরাই জার আমলে পুঁজিবাদী সামন্ত প্রভু এবং ধনিক শ্রেণিদের শোষণ, নিপীড়ন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিল। তাদের জুলুম-শোষণ থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দেওয়ার প্রত্যয় ঘোষণা করেই কমিউনিস্ট আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলে এবং জনগণের সার্বিক সমর্থন আদায়ে সমর্থ হয়। জার আমলে অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক অবিচার ও রাজনৈতিক বঞ্চনায় ক্ষুব্ধ হয়ে সাধারণ জনতা কমিউনিস্ট নেতাদের সস্তা শ্লোগানে প্রতারিত হয়। তারা জার শাসকদের উচ্ছেদ করে তাদের সবংশে নির্মমভাবে হত্যা করে। এরপরেই কমিউনিস্ট আদর্শে এক নতুন সভ্যতার(?) গোড়াপত্তন হয়।

এ নৃশংসতম ঘটনা এজন্যই হতে পেরেছে যে, স্থায়ী সভ্যতার জন্য যে পাঁচটি মৌলিক গুণ বা বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি প্রয়োজন, তার প্রায় সবকটিই এখানে অনুপস্থিত ছিল। বিশেষ করে, উদার ও বিশ্বজনীনতা, মানবদরদ ও মানব হিতৈষী ধ্যানধারণা, উন্নত জীবনদর্শন ও বৃহত্তর ঐক্যের চেতনা। এই তিনটি মৌলিক বিষয়ের অভাবের কারণেই মূলত এ আদর্শের ধারক-বাহাকরা এ ধরনের জঘন্য হত্যাকাণ্ড ও নিপীড়ন চালাতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, নির্লজ্জের মতো স্বদর্পে এ ঘোষণাও করতে পেরেছে যে, তারা পৃথিবীতে শান্তি, সাম্য ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যাবতীয় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

তারা শক্তি ও প্রলোভনের সাহায্যে তাদের এই আদর্শকে গ্রহণ করার জন্য এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এই আদর্শের ভিত্তিতে নতুন শান্তির সমাজ(?) কায়েমের জন্য কত প্রাণান্তকর প্রচেষ্টাই না চালিয়েছে! বিশ্বের বিভিন্ন দেশের তরুণ-যুব সমাজ ও একশ্রেণির তথাকথিত বুদ্ধিজীবীকে অনুপ্রাণিত করে এই তথাকথিত উন্নত সমাজ গঠনের জন্য নামে-বেনামে কত আন্দোলেই না করিয়েছে। গোপনে গোপনে এসব আদর্শিক সন্তানেরা 'শ্রেণি শত্রু' খতমের নামে কত নিরীহ মানুষকে খুন করেছে, কত যুবককে বিভ্রান্ত করেছে, তার সঠিক হিসেব এ বিশ্ব কোনো দিনই পাবে না! কিন্তু এত কিছুর পরও তারা অন্য কোথাও তাদের কল্পিত রাজ্য প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, নিজেদের গড়া(?) স্বর্গরাজ্যটিও টিকিয়ে রাখতে পারেনি। ভেঙে পড়ার অব্যাবহিত পূর্বে এ রাষ্ট্রের কর্তাধররা নিজ দেশের জনগণের পেটের রুটি, শিশুর মুখের দুধ, আর প্রাণ রক্ষাকারী চিকিৎসাসামগ্রী, এমনকী ওষুধ-পথ্যও বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে ভিক্ষে করে নিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান হতে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার কর্জ করেও তার আর্থিক দেউলিয়াত্বকে ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। সেটা বিশ্ববাসী তাদের চোখের সামনেই দেখেছে।

কমিউনিস্ট আমলের সেই কঠোর সেন্সরপ্রথা আর নেই যে, দেশের ভেতরের সকল তথ্য, খবর, ঘটনা-দুর্ঘটনা বেমালুম চেপে রাখবে; বাইরের বিশ্বকে জানতে দেবে না। তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়ার সরকারি উদ্যোগে পরিচালিত সংস্কারমূলক কার্যক্রম 'পেরোস্ত্রয়কা'র আওতার উন্মুক্ত ও অবাধ তথ্য প্রবাহের বদৌলতে বিশ্ববাসী নিজ নিজ ঘরে বসেই অভুক্ত, অভাবে জরাজীর্ণ রুশবাসীর আর্তচিৎকার শুনেছে। ভুল আদর্শের ওপর ভিত্তি করে, আর গায়ের জোরে প্রতিষ্ঠিত একটি রাষ্ট্র ও তথাকথিত সভ্যতা বিশ্ববাসী তো দূরের কথা, নিজ দেশের জনগণের সকল মৌলিক চাহিদা তো নয়-ই, ক্ষুধা নিবারণের মতো আহারটুকুও জোগাতে ব্যর্থ হয়েছে। কোটি কোটি লোক রাস্তায়-রাস্তায় ভিক্ষা করেছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধরা তাদের শেষ জীবনে অসহায়াবস্থায় রাস্তার ফুটপাতে, পার্কে বা স্টেশনের প্লাটফর্মে রাত কাটিয়েছে। মাথা গোঁজার সামান্য ঠাঁইটুকুও পায়নি। শুধু তাই নয়, এ সভ্যতা তার নিজের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বটুকুও ধরে রাখতে পারেনি। বিনা প্রতিরোধে, বিনা বাধায়, একটি বুলেটও খরচ না করে এককালের স্বঘোষিত পরাশক্তি ভূলুণ্ঠিত হয়ে গেল! আর তারই পেট থেকে বের হয়ে এলো প্রায় অর্ধ ডজনেরও বেশি পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র। যাদেরকে একদিন সে গায়ের জোরে, রক্ত চক্ষু দেখিয়ে, লাখো লোককে হত্যা করে নিজের উদরস্থ করেছিল। এভাবেই তথাকথিত কমিউনিস্ট সভ্যতার করুণ পরিণতি ঘটল।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ : ধর্মহীন সভ্যতার দর্শন

ইউরোপে খ্রিষ্টান ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ তৎকালীন সমাজ-সভ্যতা, জ্ঞানী-গুণী, গবেষক ও বিরুদ্ধ মতের লোকদের ওপর কী নির্মম ও বীভৎস অত্যাচার চালিয়েছে, তা আমরা ভিন্ন অধ্যায়ে বিশদ তথ্য-প্রমাণসহ আলোচনা করব। গির্জা ও ধর্মের সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞানের এ প্রত্যক্ষ সংঘাত ও বাদ-প্রতিবাদের ফলে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে জন্ম নেয় নতুন এক অদ্ভুত মতবাদ, যার নাম হলো 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ'।

ধর্ম ও সমাজের মধ্যে জন্ম নেওয়া বিরোধের অনিবার্য ফল সম্বন্ধে আলোচনা করতে যেয়ে বিশ্ব বিখ্যাত ইসলামি ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাবিদ শহিদ সাইয়েদে কুতুব তাঁর লেখা *আগামী দিনের জীবন বিধান* নামক বইয়ে লিখেছেন–

> '... এই পর্যায়ে এসে শিক্ষিত সম্প্রদায় ও সংস্কারকগণ আর ধৈর্য রাখতে পারলেন না। তারা গির্জার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। গির্জার সাথে যা কিছু সংশ্লিষ্ট ছিল, সবকিছুই তারা বর্জন করলেন। গির্জার ধর্ম-বিশ্বাস অথবা শিক্ষা, গির্জার বিজ্ঞান অথবা নৈতিক মূল্যমান। খ্রিষ্টবাদের বিরুদ্ধে শত্রুতার দ্বারা এ কাজ শুরু হলো, পরে সব ধর্ম-বিশ্বাসের বিরুদ্ধেই এ বিদ্রোহ পরিচালিত হলো। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে খ্রিষ্টবাদের তথা সেন্ট পলের ধর্মের নেতৃবৃন্দের লড়াই শেষ পর্যন্ত সাধারণভাবে বিজ্ঞান ও ধর্মের লড়াইয়ে পরিণত হলো। বিপ্লবীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, ধর্ম ও বিজ্ঞান দুটো সমঝোতাবিহীন প্রবাহ এবং এ দুয়ের সহাবস্থান সম্ভব নয়। কোনো ব্যক্তি একই সময়ে যেকোনো একটিকেই গ্রহণ করতে পারে।'[১২]

আলোচনার ধারাবাহিকতায় কিছুদূর এগিয়ে তিনি আরও বলেন–

> '... ধর্মের কথা শুনেই এদের মন ঘৃণায় ভরে ওঠে এবং ধর্মযাজকরা যা কিছু বলে, তা ঘৃণা করতে এবং তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে মন উন্মুখ হয়ে ওঠে। এসব ব্যক্তির উত্তরসূরিদের মনেও এই অনুভূতি ও স্মৃতি উত্তরাধিকাররূপে এসে জমা রয়েছে।'[১৩]

এ থেকে সুস্পষ্টরূপে এ কথায় বোঝা যায় যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নামে যে মতবাদ, তা মূলত ধর্মকে অস্বীকার করার প্রবণতার মধ্য দিয়েই দৃষ্টি হয়েছে। মজার ব্যাপার হলো বিশ্বজুড়ে এ মতবাদের সমর্থকরা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রকাশ না করে; বরং ধূম্রজালের সৃষ্টি করে রেখেছে।

আসলে সোজা কথা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হলো ধর্মহীনতা বা ধর্মকে অস্বীকার করার নাম। এটা একটা সুস্পষ্ট প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ গোষ্ঠী ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ইংরেজি অনুবাদ করেছে 'Secular' হিসেবে। ল্যাটিন ভাষার 'Secykarus' হতে এই 'Secular' শব্দের উৎপত্তি। পুরোনো অভিধানগুলিতে এর অর্থ করা হয়েছে- Worldly, Civil, A Lifetime, nonreligious, temporal, earthly ইত্যাদি।

অথচ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে 'Secular' শব্দ দ্বারা 'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' অর্থ বোঝানো শুরু হয়ে গেল। William Geddi সম্পাদিত Oxford Dictionary-তে বলা হয়েছে–

> 'The belief that the state, morals, education etc should be independence of religion.'
>
> অর্থাৎ; 'রাষ্ট্র, নৈতিকতা, শিক্ষা প্রভৃতিকে ধর্ম থেকে স্বতন্ত্র রাখার বিশ্বাসই হলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ।'[১৪]

বিশ্ব সভ্যতায় কমিউনিজমের পরে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ-এর মতো বড়ো ছলনা ও প্রতারণাপূর্ণ মতবাদ আর দ্বিতীয়টি নেই। এটা এক অদ্ভুত গোঁজামিলপূর্ণ মতবাদ। উপস্থাপনায় যতই চমক থাকুক না কেন, এটা আসলে জাহেলিয়াতেরই ধারাবাহিকতা। ধর্মকে অস্বীকার করার চমকপ্রদ আধুনিক কৌশল মাত্র।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ইউরোপে রেনেসাঁসের যে স্রোত চলতে থাকে, তার ফলে গোটা ইউরোপের খ্রিষ্টসমাজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাদের অজ্ঞানতা ও পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে উঠতে থাকে। ক্রুসেড পরবর্তী সময়ে খ্রিষ্টানরা তাদের সমাজ সংস্কারে হাত দেয়। কারণ, ইতোমধ্যে মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে মুসলিম দেশসমূহের সমাজব্যবস্থা,

তাদের শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানে অগ্রগতি দেখে খ্রিষ্টান ইউরোপিয়ানদের চোখ খুলে যায়। তাদের নিজেদের দুর্বলতা ও পশ্চাৎপদতা সম্বন্ধে তারা সচেতন হয়ে ওঠে। ঠিক এসময়ে কর্ডোভা, সিসিলি, আন্দালুসিয়া, গ্রানাডা এবং বাগদাদের বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষাপ্রাপ্ত খ্রিষ্টান-ইউরোপীয় ছাত্ররা তাদের সমাজ সংস্কারে এগিয়ে আসে। এ প্রক্রিয়ার প্রথমেই তারা গির্জার সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

গির্জার মূর্খ যাজকবৃন্দ রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী, অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং সামাজিকভাবে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত ছিল। তারা নিজেদের বোধ-বিশ্বাস বিরোধী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো কথাই শুনতে রাজি ছিল না। প্রস্তুত ছিল না কোনো বিরুদ্ধ মতবাদ সহ্য করতেও। ফলে বিরুদ্ধ মতকে দমন করার জন্য তারা অত্যন্ত নির্মম ও কঠোরভাবে মাঠে নেমে পড়ে। এ ক্ষেত্রে তাদের প্রধানতম অস্ত্র ছিল ধর্ম।

ফলে অনিবার্যভাবে সমগ্র ইউরোপ জুড়ে ধর্ম বনাম রাষ্ট্র, মুক্তচিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা মুখোমুখি সংঘাতে দাঁড়িয়ে যায়। শহিদ সাইয়েদ কুতুব-এর উদ্ধৃতি হতে এর একটা চিত্র ইতোমধ্যেই আমরা পেয়েছি। ইতিহাস ঘাঁটলে সুস্পষ্টরূপে দেখা যায় যে, গির্জার পাদ্রিরা ইনকুইজিশন কোর্টের মাধ্যমে ধর্মের নামে তার বিরুদ্ধবাদীদের ওপরে কী বর্বর ও নৃশংস নির্যাতন চালিয়েছিল! সে নৃশংসতা চালু ছিল পুরো পঞ্চদশ ও ষোড়োশ শতাব্দীর বেশ কিছু দশক জুড়েই।

গির্জার এ নৃশংসতার বিরুদ্ধে গণ-মানুষের মনে ক্রমাগতভাবে ক্ষোভ জমতে থাকে। এক পর্যায়ে দীর্ঘ দুশো বছর ধরে চলে আসা এসব নৃশংসতার বিরুদ্ধে শুরু হয় গণ-আন্দোলন। একদিকে গির্জা তার শাসনক্ষমতা ছাড়তে প্রস্তুত নয়, অপরিদিকে জ্ঞানী-গুণী, শিক্ষিতশ্রেণি এবং সমাজ সচেতন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গরাও গির্জার এসব অশিক্ষিত ও মুর্খ যাজকশ্রেণির হাত থেকে সমাজ ও রাষ্ট্রকে রক্ষায় বদ্ধপরিকর। কারণ, গির্জার যাজকরা যেসব অদ্ভুত তত্ত্ব-তথ্যকে ধর্ম ও ধর্মের বিধান বলে চালিয়ে আসছিল এবং যা দিয়ে শাসনকার্য পরচিালানা করছিল, তা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-গবেষণায় ধারাবাহিকভাবে ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক বলে প্রমাণিত হচ্ছিল।

প্রতিদিনই গির্জার অজ্ঞানতা জনমানুষের কাছে উন্মোচিত হচ্ছিল। এমতাবস্থায় ধর্মবিরোধী এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে থাকে সমাজের সর্বস্তরে। প্রথমদিকে তা ছিল শুধু গির্জা ও তাদের কর্তৃত্ববিরোধী। কিন্তু পরবর্তী সময়ে পুরো আন্দোলনটিই ধর্মবিরোধী আন্দোলনে রূপান্তরিত হয়। ক্রমান্বয়ে একঘরে হয়ে পড়তে থাকে গির্জা। যাজকরাও প্রমাদ গুনতে থাকে।

এমনি সময়ে শিক্ষিত শ্রেণির মধ্য হতে সুচতুর কিছু ব্যক্তি মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬)-এর নেতৃত্বে এ দ্বন্দ্বাবসানে এগিয়ে এলেন। তারা একটি আপসের মাধ্যমে সাব্যস্ত করলেন যে, ধর্ম শুধু ব্যক্তির ব্যক্তিজীবনেই সীমাবদ্ধ থাকবে, রাষ্ট্রে ধর্মের কোনো কর্তৃত্ব থাকবে না। রাষ্ট্র ও পার্থিব জীবন হবে ধর্মের অনুশাসনমুক্ত। চার্চের হাতে রাষ্ট্র ও সমাজের যত প্রশাসনিক ক্ষমতা অছে, এখন হতে তা থাকবে রাষ্ট্রের কাছে এবং রাষ্ট্রের কর্তাধারা রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য চার্চের কাছে শপথ নেবেন।

ইতোমধ্যে একঘরে হয়ে পড়া যাজকশ্রেণি সর্বস্ব হারানোর চেয়ে কিছু হারিয়ে কিছু পাওয়াকেই শ্রেয় মনে করলেন। তাই আপাতত মুখ রক্ষার মানসে মার্টিন লুথার গংদের এ আপস প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হলেন। এ ছাড়া তাদের সম্মুখে দ্বিতীয় কোনো পথও খোলা ছিল না।

এভাবেই প্রথমবারের মতো রাষ্ট্র ও ধর্ম আলাদা আলাদা অবস্থানে এসে দাঁড়াল। ধর্মের নাগপাশ হতে মুক্ত হলো রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন। ধর্ম দূরীভূত হলো জাতীয় জীবনের সকল অঙ্গন থেকে; রইল শুধু ব্যক্তিগত জীবনে। ব্যক্তি যখন রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রের কোনো অঙ্গপ্রতিষ্ঠানের সাথে অথবা সমাজের কোনো বিশেষ কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চাইবে, তখন ধর্মকে বাইরে রেখে বা ধর্ম থেকে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে এগুলো করতে হবে।

অর্থাৎ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজেদের প্রতিটি কর্মকাণ্ডে ধর্মকে অস্বীকার করে চলতে বাধ্য। সেক্যুলার মতবাদের আওতায় কোনো ব্যক্তি নিজের লেন-দেন, চলা-ফেরা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা-দীক্ষা, বিচার-আচারসহ কোনো ক্ষেত্রেই ধর্মের বিন্দুমাত্র সংশ্লিষ্টতা রাখবে না। এটাই হয় যদি সেক্যুলারিজম শব্দের অর্থ, তাহলে বাংলায় এর অর্থ ধর্মনিরপেক্ষতা কী করে হয়? এর অর্থ তো নিখাঁদ ধর্মহীনতা বা ধর্মকে অস্বীকার করা।

বস্তুত এটাই হলো অকাট্য সত্য কথা যে, Secularism বলতে আজ যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বোঝানো হয়ে থাকে, তা আসলে একটি প্রতারণা ছাড়া আর কিছু নয়। ধর্ম ও আদর্শকে মেনে চলা বিশ্বের কোটি কোটি মানুষকে তাদের অজান্তেই নিজেদের ধর্মীয় বোধ-বিশ্বাস ও আবেগ-অনুভূতি থেকে কৌশলে দূরে সরিয়ে নেওয়ার সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র এটি। ধর্মবিরোধী গোষ্ঠী, বিশেষ করে ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী এ সূক্ষ্ম, প্রতারণাপূর্ণ ও ছদ্মবেশী পদ্ধতির কার্যকারিতা দেখে তাকে লুফে নিয়েছে। সেইসঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে, মুসলমান নামধারী কিছু দালালের মাধ্যমে।

যদিও মুসলমানসহ বিশ্বের অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের বিরাট একটা অংশ এর দ্বারা সাংঘাতিকভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে, সে কথা অস্বীকার করার কোনো পথ নেই; বরং এটিই আজ অতি বড়ো বাস্তবতা। তবে ক্রমান্বয়ে বিশ্ববাসীর কাছে পরিষ্কার প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে যে, সেক্যুলারিজম মানে ধর্মনিরপেক্ষতা নয়; বরং ধর্মহীনতা। আর এই ধর্মহীনতাই হলো 'সেক্যুলারিজম'-এর আসল তাৎপর্য। ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও সামাজিক ক্ষেত্রে যেখানেই সেক্যুলারিজমের চর্চা হয়েছে, সেখানেই দেখা গেছে ধর্মহীনতার প্রকোপ। সেখানেই ধর্মের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে ব্যক্তি, সমাজ সকলেই।

ধর্ম কী? এর উত্তর আমরা সকলেই জানি। ভিন্ন দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে আমরা ধর্মকে লাগামের সঙ্গে তুলনা করতে পারি। ঘোড়ার মুখে লাগাম লাগিয়ে মালিক যেমন তাকে নিয়ন্ত্রণ ও চালিত করে, তেমনি ধর্মও মানুষের প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে লাগামের কাজ করে। মানুষের প্রবৃত্তি বা নফসকে বিপথে যাওয়া ও চলা হতে বিরত রাখে, অন্যায়-অনাচার থেকে ফিরিয়ে রাখে এবং তাকে চালিত করে সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের পথে। ঘোড়ার মুখে লাগাম না থাকলে যেমন মালিকের পক্ষে তাকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না, তেমনি ধর্মের অনুশাসন মানুষের মধ্যে না থাকলে বা জাগরুক না হলে মানুষের পক্ষেও তার ভেতরের কুপ্রবৃত্তিসমূহ নিয়ন্ত্রণে করতে সম্ভব হয় না।

নিয়ন্ত্রণহীন মানুষ সমাজ-সভ্যতার জন্য যে কতটা ভয়ংকর ও ধ্বংসাত্মক, তার প্রমাণ কি বিশ্বের ইতিহাসে কম আছে? আমরা কি প্রতিদিন আমাদের চারপাশেই নিয়ন্ত্রণহীন প্রবৃত্তির, তথা ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের কর্মকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছি না? আসলে মানুষের পক্ষে (একক বা সামষ্টিক যেভাবেই হোক না কেন) নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হয় না। এটা তার সৃষ্টিগত বা মৌলিক সত্তার একটা দিক। তাকে কোনো না কোনো পক্ষের প্রতি ঝুঁকতে হয়। হয় সত্যের দিকে, নাহয় অসত্যের দিকে। হয় ন্যায়ের দিকে, আর নাহয় অন্যায়ের দিকে। এর মাঝামাঝি নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করাটা তার আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা একটা ছল মাত্র; সত্যকে পাশ কাটিয়ে চলার বা অস্বীকার করার ছল।

কাজেই যে মতবাদ প্রতারণার ওপরে প্রতিষ্ঠিত এবং যা মানুষের মৌলিক প্রকৃতির সাথে সংগতিপূণ নয়; বরং পুরোপুরি বিরোধী, তা যতই রং চড়িয়ে, সাজিয়ে, গুছিয়ে উপস্থাপন করা হোক না কেন, তা বৃহত্তম মানবসমাজ কর্তৃক পরিত্যাজ্য হতে বাধ্য। তাই আমরা এ কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, বর্তমানে প্রচলিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এ বিশ্বে কোনো দিনই স্থায়িত্ব পাবে না। এই মতবাদের ভিত্তিতে কোনো দিনও কোনো সভ্যতা গড়ে উঠবে না, টিকেও থাকবে না; যতই প্রচেষ্টা চালানো হোক না কেন!

বর্তমান বিশ্ব সভ্যতায় নারী

পশ্চিমা সভ্যতায় আজ একটা সমস্যার নাম 'নারী'। এ সমস্যা তাদের নিজেদের হাতে গড়া। এ সমস্যাকে তারা নারী অধিকার এবং নারী স্বাধীনতাজনিত সমস্যা বলে আখ্যায়িত করে থাকে। এই সমস্যা, তার স্বরূপ ও প্রকৃতি পর্যালোচনার আগে আমরা অতি সংক্ষেপে পশ্চিমা সভ্যতা যে সভ্যতার গর্ভ থেকে এসেছে, তাতে নারীর অবস্থান ও মূল্যায়ন কী পর্যায়ে ছিল, তা আলোচনা করে দেখব।

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে, আজকের এই সভ্যতা ও দর্শন মূলত প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা ও দর্শনেরই মানসপুত্র। এ সভ্যতার প্রায় প্রতিটি বোধ-বিশ্বাস, কাজ-কর্ম প্রাচীন গ্রিক সভ্যতার। বিশেষ করে তিনজন গ্রিক দার্শনিক; সক্রেটিস, প্লেটো ও অ্যারিস্টটল-এর চিন্তাধারা দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত।

প্রাচীন গ্রিক সভ্যতা, তার শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সমাজব্যবস্থার জন্য একসময় এ বিশ্বে অত্যন্ত প্রতাপের সঙ্গে টিকে ছিল। গ্রিক সভ্যতার আওতায় প্রথম দিকে নারীরা ছিল উন্নত নৈতিক ধ্যানধারণায় উজ্জীবিত। তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের পরিধি নিজ নিজ গৃহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল। তারা সংসার ও পরিবারের জন্য পুরোপুরি নিবেদিতপ্রাণ ছিল। গৃহে শান্তি ও স্থিতি থাকার কারণে প্রতিটি পুরুষ নিজ নিজ অবস্থানে অবস্থান করেই দেশ ও সভ্যতা গঠনে উদ্যম, দায়িত্ববোধ ও নিষ্ঠার সঙ্গে কার্যকর ভূমিকা পালনে সমর্থ হয়েছিল।

এ কথাটা আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, গ্রিক সভ্যতায় প্রতিটি সদস্যের কম-বেশি অবদানের কারণেই সে সভ্যতা ক্রমোন্নতির দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এক সময় সাফল্য ও সমৃদ্ধির শিখরে আরোহণ করতে পেরেছিল। কিন্তু সেখানে নারী ছিল শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত। গৃহে তাদের যত অবদানই থাকুক না কেন,

সমাজ বা রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ অবদান রাখার কোনো সুযোগই তাদের ছিল না। তাদের কোনো স্বাধীনতা ছিল না, মর্যাদাও ছিল লুণ্ঠিতাবস্থায়। গ্রিক সমাজে নারীরা উত্তরাধিকারবিষয়ক অধিকার হতে বঞ্চিত ছিল। সারা জীবন তারা পুরুষদের দাসী-বাঁদির ন্যায় জীবন কাটাতে বাধ্য হতো। নারীর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত; তার বিয়ের ব্যাপারে নিজস্ব এখতিয়ার ছিল না। পুরুষ অর্থাৎ পরিবারের কর্তা তার জন্য যে স্বামী নির্বাচন করত, তাকেই স্বামী হিসেবে মেনে নিতে সে বাধ্য ছিল। এ ব্যাপারে দ্বিতীয় কোনো কথা বলার সুযোগ ও অধিকার তার ছিল না। এ বৈবাহিক সম্পর্ক পছন্দ হোক বা না হোক, এটাই ছিল তার নিয়তি। একে পরিবর্তন বা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ তার ছিল না।

হ্যাঁ, তালাকের সুযোগ সে সমাজে ছিল বটে, তবে তা কাগজে কলমে নামে মাত্র। কার্যক্ষেত্রে এর প্রয়োগ ছিল অত্যন্ত সীমিত। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে স্ত্রী তালাক চাইতে পারত, তবে স্ত্রী কর্তৃক তালাক চাওয়াটাকে পুরুষ তার নিজের জন্য অত্যন্ত অবমাননাকর ভাবত। তাই তালাক চাওয়ার জন্য আদালতে যাওয়ার পথে স্বামী বিভিন্নভাবে তাকে বাধাগ্রস্ত করত। পথিমধ্যে স্বামী ওত পেতে থাকত। আদালতে যাওয়ার পথ হতে বলপূর্বক তাকে ধরে এনে অন্তরীণ করে রাখা হতো। আদালত পর্যন্ত তাকে পৌঁছতেই দিত না।

পুরুষের কাছে নারী ছিল গৃহের অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তির ন্যায় একটি সম্পত্তি মাত্র! সে ইচ্ছে করলে স্ত্রীকে বাজারে বিক্রি করে দিতে পারত। নারী তার সম্পত্তির ভোগ দখল নিজের ইচ্ছামতো করতে পারত না। হস্তান্তরের অধিকারও তার ছিল না; বরং এ ক্ষেত্রেও সে ছিল পরিপূর্ণভাবে পুরুষের খেয়ালখুশির ওপর নির্ভলশীলা। পুরুষই নারীর সম্পত্তি ভোগ করত, প্রয়োজনে হস্তান্তর করত। নারী শুধু নামমাত্রই তার সম্পত্তির মালিক ছিল। স্পার্টাবাসী অবশ্য নারীর উত্তরাধিকার তালাক, সম্পত্তি দখল ও হস্তান্তরের ক্ষেত্রে বেশ নমনীয় ভূমিকা পালন করেছিল। স্পার্টা দীর্ঘদিন ধরে প্রলম্বিত ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এ রাষ্ট্রের পুরুষ নাগরিকরা বেশির ভাগই বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকত। ফলে বাধ্য হয়েই সে সমাজের বেশিরভাগ নারী সমাজ গৃহস্থালীর যাবতীয় কার্যাদির পাশাপাশি সামাজিক ও প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করা শুরু করেছিল। তারা ঘরের বাইরে আসত এবং আর্থিক লেন-দেন ও সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় করতে পারত। অন্যান্য ছোটোখাটো সামাজিক আচার-আচরণ ও কর্মকাণ্ডে সরাসরি অংশ নিত, যা পার্শ্ববর্তী গ্রিস ও এথেন্সের নারীরা কল্পনাও করতে পারত না।

খ্রিষ্টপূর্ব ৪০৪ সালে স্পার্টাবাসী এথেন্স আক্রমণ করে এবং দীর্ঘস্থায়ী ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে তারা তা দখল করে সেখানে শাসনকার্য পরিচালনা করতে থাকে।

এর ফলে স্পার্টার নারীদের মতো গ্রিস ও এথেন্সের নারীরাও পূর্বের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশি অধিকার ভোগ করার সুযোগ পেল। ক্রমেই তারা স্বাধীনচেতা হয়ে উঠতে লাগল। তারা তাদের ঘরের ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ অথচ প্রশান্তিময় অঙ্গন ছেড়ে বৃহত্তম পরিমণ্ডলে নেমে এলো।

আর এর ফলে খুব দ্রুত ও নিয়ন্ত্রণহীনভাবেই তারা উচ্ছৃঙ্খলতার পথে ছুটে চলল। পুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশার কারণে অচিরেই সমাজের বিভিন্ন স্তরে ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ল। এক পর্যায়ে তারা এ ঘৃণ্যকর্ম ব্যভিচারকে আর পূর্বের মতো অন্যায় মনে করল না। সারা সমাজ জুড়ে পতিতালয়ের আধিক্য দেখা দিলো। আর এসব পতিতালয়গুলো খুব শীঘ্রই সাহিত্য, রাজনীতির আখড়া বনে গেল। সমাজের উঁচু তলার লোকদের মধ্যে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও বিলাসিতা মহামারির ন্যায় ছড়িয়ে পড়ল। সমাজের নেতৃস্থানীয় পুরুষ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা ব্যাভিচারে জড়িয়ে পড়ার কারণে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নারীরা রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক বিষয়ে তাদের প্রভাব বিস্তার করল। তাদের অঙ্গুলি নির্দেশে অনেক ন্যায়ও অন্যায়ে পরিণত হতে লাগল। তাদেরই প্রভাবে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো প্রতিনিয়তই পরিবর্তিত হতে থাকল। ফলে প্রশাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হলো।

যৌন অনাচার এতটাই ব্যাপকতা লাভ করল যে, সমাজে অচিরেই সমকামিতার প্রাদুর্ভাব ঘটল এবং তা সমাজের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর নিকট আর ততবেশি নিন্দনীয় বিবেচিত না হয়ে অনেকটা সহনীয় বলে পরিগণিত হতে লাগল। মাছের পচন যেমন তার মাথা থেকে শুরু হয়, তেমনি গ্রিক সভ্যতার পতনও শুরু হয়েছিল শীর্ষ পর্যায়ে আসীন ব্যক্তিবর্গের নৈতিক মান ও দৃষ্টিভঙ্গির পতনের মাধ্যমে। নারী স্বাধীনতা ও নারী অধিকারের রূপ নিয়ে শুরু হওয়া কর্মকাণ্ডের শেষ পরিণতি হিসেবে অনাচার, ব্যভিচার আর যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার মতো ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে শত শত বছর ধরে শান-শওকতের সঙ্গে টিকে থাকা একটি সভ্যতা তার ভেতর থেকেই ধ্বসে পড়ল।

গ্রিক সভ্যতা তার উন্নতি ও সমৃদ্ধির চরম শিখরে আসীন হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচার, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও নৈতিকতাহীন হয়ে পড়ে। আদর্শহীনতার মতো সভ্যতা বিধ্বংসী রোগে আক্রান্ত হয়ে তার ভেতরের আত্মিক শক্তি হারিয়ে ধ্বংসের পথে যখন দ্রুত ধাবমান, ঠিক তখনই তারই সূতিকাগারে জন্ম নিতে শুরু করল অপর এক বিখ্যাত সভ্যতা; ইতিহাসে যাকে আমরা রোমান সভ্যতা বলে জানি। প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ জনাব আবদুল হামিদ সিদ্দিকির মতে,

'রোমান সভ্যতা পরিবর্তন পরিবর্ধনসহ গ্রিক সংস্কৃতিরই ক্রমপ্রবাহ।'[১৫]

এই রোমান সভ্যতা আধুনিক ইউরোপ বা বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতা গঠনে এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। রোমান সভ্যতা ও দর্শনে নারীর প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল, তা পর্যালোচনার জন্য যৎকিঞ্চিৎ আলোচনাই যথেষ্ট। রোমান সমাজে নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের সূত্রপাত হতো তার জন্মলগ্ন থেকেই। জন্মদাতা পিতার এ অধিকার ছিল যে, তিনি ইচ্ছে করলে সদ্যভূমিষ্ট যেকোনো শিশুকে তার পরিবারের নবাগত সদস্য হিসেবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন। এ ব্যাপারে তার পূর্ণ এখতিয়ার ছিল, যা সামাজিকভাবে স্বীকৃত ও পালিত হতো। আর কোনো শিশুকে প্রত্যাখ্যান করার পদ্ধতি ছিল এ রকম; শিশুটিকে কোনো খোলা ময়দানে বা উপসনালয়ের বেদিতে রাখা হতো। ছেলে হলে পরিবর্তী সময়ে কেউ ইচ্ছা করলে তাকে গ্রহণ করত, নচেৎ শিশু ক্ষুধায়, পিপাসায়, গরমে কিংবা শীতে ধুঁকে ধুঁকে মরত।[১৬]

বলাই বাহুল্য, প্রত্যাখাত শিশুদের প্রায় সকলেই ছিল কন্যা শিশু! জন্ম মুহূর্ত হতে শুরু হওয়া এ বৈষম্যের পরও যেসব নারী শিশু বেঁচে থাকত অথবা পরিবার কর্তৃক প্রত্যাখাত হতো না, তারা ছিল সমাজে সবচেয়ে নির্যাতিতা ও অবহেলিতা শ্রেণির মধ্যে গণ্য। নারীর কোনো স্বাধীনতা ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ বা স্বকীয়তার প্রশ্ন ছিল অবান্তর। তার মৌলিক অধিকার বলতে কিছুই ছিল না। পরিবার প্রধানের ইচ্ছা ও বাসনাই নারীর অবস্থান ও ভাগ্য নির্ধারণ করত। পরিবার প্রধান তার নিজের স্ত্রী-কন্যা, পুত্রদের স্ত্রী, কন্যা এমনকী তার পৌত্রদের স্ত্রী-কন্যাদেরকেও বিক্রি করে দিতে পারত! শুধু তাই নয়, তাদের হত্যা করার সামাজিক অধিকার ও ক্ষমতাও তার হাতে ছিল। বলা চলে, নারীর জীবন ও সতীত্বের নিরাপত্তার বিন্দু পরিমাণও কোনো নিশ্চয়তা ছিল না।

নারীর অর্থনৈতিক জীবন ছিল আরও বেশি করুণ ও বিপর্যস্থ। নারীর কোনো অর্থনৈতিক অধিকার পরিবার ও সমাজে স্বীকৃত ছিল না। সে আর্থিকভাবে পুরোপুরি পরিবারের পুরুষের ওপর নির্ভরশীল ছিল। তার ছিল না কোনো পৃথক অর্থনৈতিক অস্তিত্ব। কোনো নারী অর্থ উপার্জন করলে বা অর্থ-সম্পত্তির মালিক হলেও সে সম্পত্তি পরিবারের একটা বাড়তি সম্পদে পরিণত হতো। এরপর পরিবার প্রধান মারা গেলে তার অধীনতা থেকে সকল পুরুষ সদস্যগণ মুক্তি পেলেও কন্যা সন্তানরা কখনোই মুক্তি পেত না; বরং তাকে অন্য কোনো পুরুষের অভিভাবকত্বে আসতে হতো।

এ সভ্যতায় নারীর ওপর পুরুষের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা থাকার কারণে নারীদের নিয়ে পুরুষেরা যা খুশি তাই করেছে। নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো তাদের শাসন করেছে, তাদের জন্য বিধান রচনা ও প্রয়োগ করেছে।

রোমান সভ্যতার উন্নতির চরমতম একটা পর্যায়ে এসে সমাজের শাসক ও ধনাঢ্যশ্রেণির মধ্যে নারী নিয়ে যথেচ্ছ আচরণের এ প্রক্রিয়া সীমা ছাড়িয়ে যায়। শিক্ষিত-এলিট ও শাসকশ্রেণির মধ্যে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা মহামারির ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে। সমাজের উঁচু তলার বাসিন্দাদের বাসগৃহ, মিলনায়তনসহ অন্যান্য পাবলিক সেন্টারগুলো যৌনতায় এমনভাবে ছেয়ে যায় যে, তা বহু শতাব্দী ধরে আলোচিত হতে থাকে।

ক্রমান্বয়ে এ যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজের উঁচু তলা হতে খুব দ্রুতই সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। পুরো রোমান সভ্যতাই বলা চলে যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও নীতি নৈতিকতাহীনতার স্রোতে প্রবল বেগে ভেসে চলল নিশ্চিত এক ধ্বংসের দিকে।

আমরা ইতঃপূর্বে আলোচনা করেছি এবং জেনেছি যে, যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা ও নীতিহীনতা একটি সমাজ ও সভ্যতা ধ্বংসের অন্যতম কারণ। এখানেও তাই ঘটল অনিবার্যভাবেই। যৌনতা ও ব্যভিচার শুরু হওয়ার সাথে সাথেই শুরু হলো রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংস প্রক্রিয়া। ধ্বংসের এ প্রক্রিয়া যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে, ঠিক তখনই আবির্ভাব ঘটে খ্রিষ্টবাদের।

খ্রিষ্টবাদ মামুলি কোনো ধর্ম ছিল না। এটি ছিল মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কর্তৃক প্রদত্ত বিধিবিধান, যা তিনি তাঁর রাসূল ও নবি হজরত ইসা (আ.)-এর মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন। আজ গোটা বিশ্ব সেই বিধিবিধানকে খ্রিষ্টবাদ বলে জানে। আজকের এই খ্রিষ্টবাদ ও হজরত ইসা (আ.) কর্তৃক প্রচারিত শিক্ষা, এ দুয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান।

ইসা (আ.) ছিলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কর্তৃক নির্বাচিত সম্মানিত নবি। তিনি পৃথিবীতে অবস্থানকালীন সময়ে প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর একত্ববাদ তথা তাওহিদের শিক্ষাই প্রচার করেছেন, অন্য কিছু নয়। সাম্য-সুবিচার আর মানবতার উন্নত রূপ তুলে ধরে হজরত ইসা (আ.) যে শিক্ষা ও দর্শন প্রচার করেন। তার আত্মিক শক্তি এতটাই প্রবল ছিল যে, শাসকশ্রেণি, ইহুদি ধর্মগুরু ও কায়েমি স্বার্থবাদীসহ সকল শ্রেণির যাবতীয় বাধা ও প্রতিরোধ সত্ত্বেও এ শিক্ষা এক স্থান হতে অন্য স্থানে দ্রুততার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে থাকল। শক্তিশালী রোমান সাম্রাজ্যও এ শিক্ষাকে দমিয়ে রাখতে পারল না, প্রতিরোধ করতে পারল না। ফলে এর বিস্তৃতি দিন দিন বাড়তে থাকল। ইসা (আ.) নিজে ও তাঁর অনুসারীরা সকল নির্যাতন, নিপীড়ন ও জুলুমের মুখেও অবিচল থেকে এ শিক্ষাকে প্রচার করতে থাকলেন।

হজরত ইসা (আ.)-এর ঊর্ধ্বারোহণের পরেও খ্রিষ্ট ধর্ম ও তার অনুসারীদের ওপর জুলুম নির্যাতনের এ প্রক্রিয়া সমানভাবে চালু থাকে। রোমান সম্রাট নিরো তো খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচারের অপরাধের(?) শাস্তি হিসেবে প্রাণদণ্ড প্রদানের সরকারি ঘোষণা দিয়ে বসলেন। কিন্তু ইতোমধ্যেই রোমান সাম্রাজ্য ও সভ্যতা নৈতিক ও আত্মিক দিক থেকে ভেতরে ভেতরে যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছিল। একটা সভ্যতাকে ধারণ করে রাখার মতো শক্তি তাদের মধ্যে আর অবশিষ্ঠ ছিল না। এমনকী তাদের সেই যোগ্যতাও আর ছিল না, যা দিয়ে তারা নিজেদের সভ্যতাকে কয়েক শতাব্দী ধরে উন্নতি আর সমৃদ্ধির শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। এ সভ্যতা তার ভেতর হতেই ক্রমান্বয়ে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছিল।

ফলে খ্রিষ্টধর্মের প্রতিরোধ কার্যক্রমে ভাটা পড়ল। এ প্রতিরোধ কার্যক্রম তারা বেশি দিন চালিয়ে যেতে পারেনি। কারণ, ধ্বংসন্মুখ সে সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য নৈতিক ও আত্মিক শক্তির বড়ো প্রয়োজন ছিল। তাই তারা খ্রিষ্টবাদের শিক্ষাকে নিজেদের আত্মিক ও নৈতিক শক্তি অর্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার শুরু করল। যখন দেখি, ৩১২-৩১৩ খ্রিষ্টাব্দে কন্সটান্টাইন ও লিসিনাস শাসকদ্বয় খ্রিষ্টবাদকে বৈধ ধর্ম বলে স্বীকৃতি দিয়ে রাজকীয় ডিক্রি জারি করে এ কথার সত্যতা আমাদের কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়।

এটা ছিল খ্রিষ্টবাদের জন্য এক বিপ্লবাত্মক ঘটনা। ফলে পরবর্তী মাত্র কয়েকটি শতাব্দীর মধ্যে রোমান সাম্রাজ্য কখন যে বদল হয়ে গেল অর্থাৎ খ্রিষ্টবাদে বিলীন হয়ে গেল, তা যেন টেরই পাওয়া গেল না। সামাজিক, রাষ্ট্রিয় ও ব্যক্তিজীবনে এর যে সুদূরপ্রসারী ও ব্যাপক প্রভাব পড়ল, তার বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ এখানে নেই। তবুও দ্বিতীয় শতাব্দীতে জাস্টিন মাটার-এর একটি বক্তব্য থেকে তার কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যায়। উক্ত বক্তব্যটি প্রখ্যাত গবেষক ও চিন্তাবিদ জনাব আব্দুল হামিদ সিদ্দিকি তাঁর লেখা *পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎস* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এভাবে–

> 'খ্রিষ্টান হওয়ার আগে আমরা লাম্পট্যে আনন্দ পেতাম, এখন আনন্দ পাচ্ছি পবিত্র জীবনযাপনে। আমরা জাদু চর্চায় অভ্যস্ত ছিলাম। আমরা এখন মহান প্রভুর, যাকে কেউ জন্ম দেয়নি তাঁর প্রতি উৎসর্গীকৃত। আমরা আগে টাকা-পয়সা ও অন্যান্য সম্পদের খুব কদর করতাম, এখন আমরা ওসব নিঃস্ব সম্বলহীনদের সাথে ভাগ করে নিই। আগে আমরা একে অপরকে ঘৃণা ও হত্যা করতাম এবং ভিন্ন জাতির কোনো আগন্তুককে আমাদের গেটের ভেতরে প্রবেশ করতে দিতাম না। কিন্তু ইসার আগমনের পর আমরা শান্তিতে বসবাস করছি। আমরা আমাদের দুশমনদেরও কল্যাণ কামনা করি।

> যারা আমাদের অন্যায়ভাবে ঘৃণা করে আমরা তাদের মন জয় করতে চাই, যাতে ইসার মহান শিক্ষাকে গ্রহণ করে, তারা আমাদের সঙ্গে বিশ্ব-বিধাতার পুরস্কার লাভের আশা করতে পারে।'[১৭]

ওপরের এই একটি মাত্র উদ্বৃতিই এ কথা প্রমাণে যথেষ্ট যে, তৎকালীন রোমান সমাজের চিন্তা-চেতনায়, ধ্যানধারণায় হজরত ইসা (আ.)-এর প্রচারিত শিক্ষার কী সুগভীর প্রভাব পড়েছিল।

এ সময়টাতে নারী তার অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা পেতে শুরু করে। তারা সম্মানের আসেন আসীন হতে শুরু করে। কিন্তু এ মানব সভ্যতার দুর্ভাগ্য যে, এই ধারা খুব বেশি দিন নিরবচ্ছিন্নভাবে চালু থাকতে পারেনি। অচিরেই ইসা (আ.)-এর শিক্ষাকে বিকৃত করা হলো। চিন্তার জগতে পুনরায় এক গভীর নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতার জন্ম হলো। ফলে পুনরায় নারীর ভাগ্যে দুর্গতি অবমাননা ও চরম গ্লানী নেমে এলো। নারীত্বের অবমাননা সর্বকালের সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে গেল।

প্রথম যুগের খ্রিষ্টান ধর্ম যাজকরা ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ সকলেই রোমান সাম্রাজ্যের পতন যুগে নারীদের অবাধ চলাফেরা, তাদের চরিত্রহীনতা ও যৌন উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে শিহরিত হলেন এবং এ অবস্থার জন্য তারা নারীদেরকেই দায়ী করলেন। তারা নারীকে নিজেদের জীবন থেকে বর্জন করা শুরু করলেন এবং অন্যদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহ জোগাতে থাকলেন।

এ ধর্মীয় গোষ্ঠী এ কাজে ধর্মকে ব্যবহার করল। ধর্মের শিক্ষাকে পুরোপুরি পরিবর্তন করে, বিকৃত করে তারা ঘোষণা করল যে, অবিবাহিত পুরুষরা আল্লাহর কাছে বেশি সম্মানিত। তারা ঘোষণা করল, নারী হলো শয়তানের প্রবেশদ্বার! নারী হচ্ছে আল্লাহর বিধানভঙ্গকারী এবং আল্লাহর চেহারা (পুরুষকে) বিস্মৃতকারী।

এ তো ছিল শুরু মাত্র। খ্রিষ্টবাদে দীক্ষিত ইহুদিগণ কর্তৃক যত বেশি এ ধর্মের বিকৃতি ঘটতে থাকল, চিন্তার নৈরাজ্যও তত বেশি প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকল। পঞ্চম শতাব্দীতে এসে খ্রিষ্টজগৎ চিন্তা করতে শুরু করল; নারীর আত্মা আছে কি না! প্রায় সমকালীন সময়েই এ বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে যে, একমাত্র মসিহের মাতা মরিয়ম ব্যতীত আর কোনো নারী-ই দোজখ থেকে মুক্তির নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত আত্মার অধিকারিণী নয়!

এর আরও পরে এসে ৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ফ্রান্সে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় নারীকে 'মানুষ' বলে বিবেচনা করা হবে কি না, তা খতিয়ে দেখার জন্য। উক্ত সম্মেলনে অনেক চিন্তা(?) গবেষণা করার পর এ রায় ঘোষণা করা হয় যে, নারী মানুষ বটে, তবে তার সৃষ্টির একমাত্র উদ্দেশ্য হলো, পুরুষের সেবা করা।

ইতিহাসের এ প্রান্তে এসে উক্ত ঘোষণার ফলে নারীকে কেন্দ্র করে এক নাটকীয় ও নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা হলো। অপরদিকে প্রায় একই সময়ে আরবের মক্কায় হজরত মুহাম্মদ ﷺ কর্তৃক ইসলামের সুমহান শিক্ষা প্রচার ও বাস্তবায়ন শুরু হলো। বিশ্বের ইতিহাসে নারী তার জীবনের সবচেয়ে উন্নত অবস্থান, মর্যাদা ও নিরাপত্তা পেল। সেইসঙ্গে উন্নত, শাশ্বত লক্ষ্য এবং এর পাশাপাশি বাস্তব মূল্যায়ন দেখতে পেল।

ইসলাম নারীকে কতটা মূল্যায়ন করেছে, এটি সে আলোচনাক্ষেত্র নয়। আমরা আমাদের পূর্ব আলোচনার ধারা অব্যাহত রেখে বলতে চাই যে, ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত ৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বোল্লেখিত সম্মেলন ও তার ঘোষণা পশ্চিমা বিশ্ব তথা তৎকালীন পৃথিবীর মানুষের চিন্তা ও চেতনায় এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। উক্ত ঘোষণার ফলে পুরুষ ভাবতে শুরু করল; নারী শুধু তাদের সেবা ও সন্তুষ্টিবিধানের জন্যই সৃষ্ট। ফলে নারী সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি দ্রুত পালটে গেল। সে নারীর রক্ষক ও একমাত্র অধিকর্তা হয়ে বসল। তাদের নিকট নারী শুধু কামনা নিবৃত্তির উপাদান ও উপলক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হতে লাগল।

ফ্রান্সে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনের রেশ তেরোশত বছর পরে এসেও আমরা দেখতে পাই। ব্রিটিশ আইনে ১৮০৫ সাল পর্যন্ত স্ত্রীকে বেঁচে দেওয়ার অধিকার স্বামীর ছিল। আর বিক্রির জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক বেঁধে দেওয়া মূল্য ছিল; মাত্র ছয় পেন্স!

তারও অনেক পরে, এই তো মাত্র কয়েক দশক আগে, ১৯৩১ সালে জনৈক ইংরেজ তার স্ত্রীকে মাত্র পাঁচশো পাউন্ডে বিক্রি করে দেয়। ইটালিতেও ওই একই সময় পর্যন্ত এ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। তখন পর্যন্ত সারা ইউরোপ সংশয়ের মধ্যে নিমজ্জিত ছিল। তারা নিরলস গবেষণায়(?) ব্যস্ত থাকত, এটা বোঝার জন্য যে, সত্যিই নারীর আত্মা আছে কি না। থাকলে তা কীসের আত্মা? মানুষের, না অন্য কোনো জন্তুর আত্মা! এ রকম চিন্তা-চেতনা যখন মন-মগজে ভরে আছে, ঠিক তখনই শুরু হলো শিল্প বিপ্লব।

শিল্প বিপ্লব ছিল সভ্যতার জন্য বৈপ্লবিক এক ঘটনা। এর ছোঁয়ায় পুরো ইউরোপের চেহারাই পালটে গেল। শহর-গ্রামের পার্থক্য দিনকে দিন কমে আসতে লাগল। নিত্য নতুন আবিষ্কার হতে থাকল, ফলে স্থাপিত হতে থাকল নতুন নতুন কল-কারখানা। এসব কল-কারখানাগুলোতে উৎপাদনের জন্য দরকার পড়ল অধিক পরিমাণ শ্রমিকের। ইউরোপের পুরুষ জাতি যেহেতু কোনো দিনই নারীর ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে রাজি ছিল না, তাই তারা এসব কল-কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য ঘর থেকে দলে দলে টেনে আনল নারীদের। বিনিময়ে তারা মজুরি প্রদান ও শ্রমের ক্ষেত্রে নারীর সঙ্গে প্রতারণা করল।

বেশি খাটিয়ে নিয়ে মজুরি দিত সামান্য। পাশাপাশি জৈবিক ক্ষুধা নিবৃত্তির সেই পুরোনো প্রবৃত্তি তো চালু থাকলই। অপরদিকে চিরবঞ্চিতা ইউরোপীয় নারীসমাজ খালি হাতের চেয়ে অন্তত কিছু পাওয়ার প্রত্যাশায় স্বল্প মজুরিতেই শ্রম প্রদান করে যেতে থাকল। যদিও এই শ্রম প্রদান ছিল তাদের শক্তি ও ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, তবুও বাইরের মুক্ত দুনিয়া ছেড়ে তারা আর ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে ফিরে যেতে চাইল না।

এর ফল হলো আরও মারাত্মক। নারীরা স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছৃঙ্খলতায় নিজেদেরকে ভাসিয়ে দিলো। ফলে পরিবার ব্যবস্থা একটা বড়ো ধরনের ধাক্কা খেলো। তার ওপর আবার মরার ওপরে খাঁড়ার ঘা হয়ে দেখা দিলো বিশ্বযুদ্ধ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কোটি-কোটি পুরুষ নিহত, পঙ্গু বা নিখোঁজ হলো। ফলে স্বাভাবিকভাবেই বিধবা হলো কোটি কোটি নারী। অবিবাহিতা রয়ে গেল আরও কোটি কোটি নারী। পরিবারগুলো হয়ে গেল পুরুষশূন্য।

এ রকম অবস্থার জন্য ইসলামে যে বহু বিবাহের ব্যবস্থা রয়েছে, তা বিকৃত খ্রিষ্টীয় বিশ্বাসে না থাকায় এসব নারীদের জীবনে নেমে এলো সীমাহীন দুর্ভোগ। খুব স্বাভাবিকভাবেই তারা বাঁকা পথ অবলম্বন করল এবং নিজ উদ্যোগেই যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার পথে পা বাড়াল। এমনই একটি সময়ে ফ্রান্সে পুরুষশূন্য বাড়ির সদর দরজায় দেখা গেল 'নৈশকালীন অতিথি চাই' লেখা সাইনবোড! নারীত্ব যে কতটা অধঃপতিত ও অবমাননাকর অবস্থায় নেমে গেল, এটি তারই একটি সাইনবোর্ড মাত্র!

যা হোক, নারী তখন বাধ্য হয়েই অফিস-আদালত, কল-কারখানায় আরও বেশি করে কাজে অংশগ্রহণ করতে লাগল। এর পাশাপাশি কল-কারখানার মালিক বা অফিসের বস কর্তৃক শারীরিক ও অর্থৈনেতিক পীড়ন, শোষণ ও বঞ্চনার ধারাও অব্যাহত থাকল; বলা চলে তার আরও বিস্তৃতি ঘটল।

অতিরিক্ত দৈহিক শ্রমে ক্লান্ত, হতশ্রী, সংসার হতে বিতাড়িতা, পরিত্যক্তা এবং প্রেম-ভালোবাসা, সম্মান ও স্বীকৃতি হতে বঞ্চিতা নারী এক পর্যায়ে রুখে দাঁড়াল। পুরুষের মধ্য হতে একটি দল এ পর্যায়ে এসেও তাদের ভোল পালটে নারীর নিখাঁদ শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে তাকে উত্তেজিত ও প্ররোচিত করতে থাকল। অধিকার আদায়, অর্থনৈতিক বঞ্চনা হতে মুক্তি, স্বাধীনতা ও সমঅধিকার-এর মতো যতসব চটকদার শ্লোগানে তাদেরকে প্রভাবিত করল। শুরু হলো বাদ-প্রতিবাদ, অসহযোগ ও হরতালের মাধ্যমে অধিকার আদায়ের এক আন্দোলন।

ইতিহাসে এ আন্দোলনই 'নারীবাদী আন্দোলন' 'নারী অধিকার আন্দোলন' 'সমঅধিকার আন্দোলন' বা 'নারী স্বাধীনতা আন্দোলন' হিসেবে পরিচিত এবং আজ অবধি একই গতিতে চালু আছে। কিন্তু এটা কি আসলেই নারীর অধিকার ও সম্মান প্রতিষ্ঠা বা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে পরিচালিত আন্দোলন ছিল?

বস্তুত এটি ছিল নিছক এক প্রতারণা মাত্র। চটকদার বুলি আর শ্লোগানের আড়ালে ইন্দ্রিয় দাসত্বে লিপ্ত লম্পট শ্রেণির পুরুষ কর্তৃক নারীকে শোষণ-শাসন ও ভোগ করার আধুনিক কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। পুরুষ জাতির এ অংশটি নারীর ভরণ-পোষণ ও নিরাপত্তার দায়িত্ব বহন করতে রাজি নয়; তা তার মা, স্ত্রী-কন্যা, বোন যেই হোক না কেন। তবে স্বার্থ, সেবা আদায় এবং ভোগ করার ক্ষেত্রে তারা পুরোমাত্রায় তৎপর। বলা চলে অতিমাত্রায় তৎপর।

অথচ নারীকে তারা চরম প্রতিযোগিতামূলক বাজারে এনে সবল পুরুষের পাশে দাঁড় করে দিয়েছে। পেটের খাবার, পরনের বস্ত্র ও রোগের চিকিৎসা-পথ্য, অর্থাৎ নারীর নিজ সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য যাবতীয় প্রয়োজন তার নিজেকেই উপার্জন করে নিতে বাধ্য করেছে। ঘরের প্রশস্থ অঙ্গনকে নারীর জন্য 'জেলখানা' 'বন্দিশালা' আখ্যা দিয়ে ক্ষুদ্র আঙিনার প্রতি তাকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। বাইরের বৃহত্তম আঙিনায় নেমে আসার জন্য অব্যাহত ও ক্রমাগতভাবে উৎসাহ জুগিয়েছে। 'স্বাধীনতা' ও 'সমঅধিকার'-এর প্রলোভনে তাকে প্রলোভিত করেছে এবং প্ররোচিত করেছে তা অর্জনে।

পাশ্চত্য সভ্যতা বিগত তিনশত বছর ধরে সারা বিশ্বের শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সকল ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। সমাজ-সভ্যতার নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় তারা অবস্থান করছে। বলতে গেলে সর্বত্রই তাদের একচ্ছত্র প্রতাপ। তাদের সমাজ থেকেই জন্ম নেয় 'নারী মুক্তি আন্দোলন' 'নারী স্বাধীনতা আন্দোলন' বিষয়ক ধ্যানধারণা। নারীর সমঅধিকার বিষয়ক চটকদার বুলিগুলোও খ্রিষ্ট-সমাজের। যতদিন এই খ্রিষ্ট সমাজ ইসা (আ.)-এর আনিত ঐশী বিধান তথা অপরিবর্তিত শিক্ষা মেনে চলেছে, ততদিন সে সমাজে নারী স্বাধীন ছিল। তার প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা অক্ষুণ্ন ছিল। তার পছন্দ-অপছন্দ, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ভালো লাগা, মন্দ লাগার মূল্য ছিল। ফলে সে তার ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সর্বক্ষেত্রে অপরের চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত-ফয়সালার নিষ্পেষণে নিষ্পিষ্ঠ হওয়ার যন্ত্রণা থেকে মুক্ত থেকেছে। তার অর্থনৈতিক অধিকার ও ক্ষমতা অক্ষুণ্ন থেকেছে। স্বাতন্ত্র্যবোধও বজায় থেকেছে পূর্ণ মাত্রায়। তখন তার নিজের সম্পদের ওপরে একচ্ছত্র অধিকার ও কর্তৃত্ব বজায় ছিল।

সে ছিল পরিবারের মুল কেন্দ্রীয় চরিত্র, যাকে ঘিরে স্বামী-সন্তানেরা আবর্তিত হতো। সংসারে তারই কর্তৃত্ব চলত। বাইরের দুনিয়ার শত ঝামেলা, কুটিল সমাজনীতি, যুদ্ধের ময়দানের জটিল সমরনীতি, নিজের ভরণ-পোষণের চিন্তা, এসব থেকে সম্মান, ভালোবাসা, স্নেহ, শ্রদ্ধা দ্বারা সে এতটাই সুরক্ষিত ছিল যে, কোনো অশুভ শক্তি কখনো তাকে পরাধীন করার বা তার প্রকৃতিগত স্বাধীনতা ও অধিকার খর্ব করার কথা কল্পনাও করত না। এ ধরনের অবস্থা খ্রিষ্টীয় সমাজে হজরত ইসা (আ.)-এর শিক্ষা বিকৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত টিকে ছিল।

তবে উল্লেখিত অবস্থার পরিপূর্ণ ও ব্যাপক উন্নততর স্তরের প্রকাশ ও বাস্তবায়ন ঘটেছে ইসলামি সমাজে। ইসলামি শিক্ষা ও দর্শনের আওতায়। এ আসমানের নিচে বিশ্ব আর কখনো অন্য কোনো শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সভ্যতার আওতায় নারীর এতটা উন্নততর অবস্থান, সম্মান-মর্যাদা ও মূল্যায়ন দেখেনি, যতটা সে দেখেছে ইসলামি সমাজব্যবস্থার আওতায় এবং এর শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে। বিগত তিনশত বছর ধরে পশ্চিমা সভ্যতার ধারক-বাহকরা পরিবার ও সমাজে নারীর অবমাননা তো করেছেই, পাশাপাশি মুসলিম সমাজেও সেই প্রতারণামূলক পদ্ধতিতে নারীকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা চালিয়েছে, ক্ষেত্র বিশেষে তারা সফলতাও অর্জন করেছে।

পশ্চিমা বিশ্ব কোনো দিনই নারীকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেনি। দেখেছে অত্যন্ত নীচু, আত্মাহীন ও শয়তানের উৎস বা প্রবেশদ্বার হিসেবে। নারী সংসর্গ এড়িয়ে যাওয়াটা তাদের কাছে বিবেচিত হতো সম্মানের ব্যাপার হিসেবে। মায়ের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। এ রকম হৃদয়বিদারক কিছু ঘটনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ জনাব আবদুল হামিদ সিদ্দিকি। তাঁর লেখা *পশ্চাত্য সভ্যতার উৎস* নামক গ্রন্থে এভাবে বর্ণিত আছে যে–

> 'এক মায়ের সাত সন্তান তাকে পরিত্যাগ করে নির্জনবাসে চলে যায়। মা একবার সন্তানদের দেখতে যান। ওরা তখন তাদের প্রকোষ্ঠ থেকে বের হয়ে গির্জার দিকে যাচ্ছিল। মা তাদেরকে দেখে ফেলেন। তাঁকে দেখেই সন্তানরা দৌড়ে প্রকোষ্ঠে ঢুকে পড়ে। কম্পিত পদে মা তাদের নিকটে পৌছার আগেই এক ছেলে এসে গৃহদ্বার বন্ধ করে দেয়। বাইরে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা কান্নায় ভেঙে পড়েন। সেইন্ট পোম্যান দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বলেন, "আপনি তো বুড়ো মানুষ, এমনভাবে কান্নাকাটি ও হা-হুতাশ করছেন কেন?" মা ছেলের কণ্ঠস্বর চিনে বললেন, "ও হে ছেলে, আমি তোমাদের এক নজর দেখতে চাই।

আমি দেখলে তোমাদের কী ক্ষতি হবে? আমি কি তোমাদের মা নই? আমি কি তোমাদের দুধ পান করাইনি? আমি অতি বুড়ো, তোমার কণ্ঠস্বর শুনে আমার অন্তর তড়পাচ্ছে।" সন্তানেরা গৃহদ্বার খুলতে রাজি হয়নি। তারা মাকে জানাল যে, মৃত্যুর পরে তাদের সঙ্গে দেখা হবে।'[১৮]

অপর এক ঘটনার উদ্ধৃতিতে তিনি আরও একটি হৃদয়বিদারক দৃশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন-

'সাইমন স্টাইলটস আব্বা-আম্মার একমাত্র পুত্র সন্তান ছিলেন। তিনি বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। আব্বা-আম্মা শোকে কাতর হয়ে পড়েন। অল্পকাল পরেই আব্বা মারা যান, শোকাতুরা আম্মা বেঁচে রইলেন। ২৭ বছর পর ছেলের অবস্থানস্থলের খবর পেয়ে তিনি তার সঙ্গে দেখা করতে যান। তিনি ভেতরে যাওয়ার অনুমতি পাননি। আম্মা বললেন; "ছেলে, তুমি একী করলে? আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করেছি। তুমি আমার অন্তর গুঁড়ো করে দিলে! আমি তোমাকে স্নেহচুম্বন দিয়েছিলাম, তার পরিবর্ততে তুমি আমাকে এই দুঃখ দিলে! আমি তোমার লালন-পালনের জন্য কতই না কষ্ট করেছি, আজ তুমি আমার সঙ্গে এই নির্দয় আচরণ করলে!" সেন্ট সংবাদ পাঠান যে, তিনি শিগগিরই তাঁর ছেলেকে দেখতে পাবেন। তিন দিন তিন রাত ধরে আম্মা অনুনয় বিনয় করতে থাকেন। অবশেষে অসহ্য দুঃখ বেদনার ভারে মাটিতে পড়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।'[১৯]

শুধু মায়ের বেলায়-ই যখন এতটা অবজ্ঞা আর নির্মম উপেক্ষা, তখন অন্য নারীর বেলায় কতটা অবমাননা হতে পারে, তা সত্যিই অকল্পনীয় বিষয়। আর বাস্তবে হয়েছেও তাই। নারীকে পূর্ণ মাত্রায় ভোগ এবং সীমাহীন শোষণ করার অশুভ অভিপ্রায়ে পুরুষরা সমঅধিকার-এর লোভনীয় চটকদার বুলির মাধ্যমে তাদের রাস্তায়, কল-কারখানায় নিজেদের পার্শ্বে নামিয়ে আনে। কিছু অবশ্যম্ভাবী পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে পুরুষ কর্তৃক প্ররোচিত ও প্রলোভিত হয়ে নারী-সমাজের একটা অংশ অধিকার আদায় এবং অধিকার প্রদানের কথা বলে নারীকে ঘরের বাইরে টেনে আনলেও তাকে কখনোই পুরুষের ন্যায় সমান অধিকার দিতে পারেনি। অধিকার আদায়ের জন্য নারীকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। এগোতে হয়েছে অনেক রক্তক্ষয়ী বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে দিয়ে। কিন্তু তাদের সেই অধিকার আজ পর্যন্ত আদায় হয়নি। আমাদের পরবর্তী আলোচনায় আমরা সে ইতিহাস ও ফলাফল সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্লেষণ করব।

নারীবাদী আন্দোলন : সূত্রপাত ও ফলাফল

১৭৯২ সালে ব্রিটিশ লেখিকা Mary Wollstone Craft একটি বই লেখেন, যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল নারীর সমঅধিকার। এই *Vindecation of The Rights of Women* বই-এ তিনি পুরুষের তুলনায় নারীর দুর্বল হওয়ার ধারণাকে যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেন এবং মহিলাদের জন্য ব্যাপক অধিকার দাবি করেন। তার উক্ত বই সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে ব্রিটিশ নারী অধিকার আন্দোলনের নেত্রী Elizabeth Curry মন্তব্য করেছেন–

> 'In it she argued that women's dependence on men was not natural and inevitable, as most people then thought, she said that dependence was created by the way women were treated and educated from the time they were born.'
>
> অর্থাৎ 'তিনি এতে যুক্তি দেখান যে, নারী পুরুষের ওপরে প্রকৃতিগতভাবেই নির্ভরশীল এবং তা অখণ্ডনীয় বলে আজ পর্যন্ত অধিকাংশ মানুষ যা ভাবত, আসলে তা ঠিক নয়। তিনি বলেন; জন্ম মুহূর্ত থেকে যে দৃষ্টিতে নারীকে দেখা হয় ও তার শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়, তারই ফলশ্রুতিতে এ ধরনের নির্ভরশীলতা গড়ে ওঠে।'[২০]

এর অনেক পর ১৯০৩ সালে ইংল্যান্ডের Mrs. Emmeline Pankurst নাম্নী এক মহিলা তার দুই কন্যাসহ নারীর ভোটাধিকার আদায়ের জন্য একটি নারীসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। অন্যান্য নারীদের উজ্জীবিত ও সংঘবদ্ধ করে তারা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির প্রয়াস চালান। তারা সভা-সমিতি, আলোচনা সভা, প্রতিবাদ মিছিল, বিক্ষোভ অনুষ্ঠানের আয়োজন করার মাধ্যমে দাবি আদায়ের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন।

ব্রিটেনের ইতিহাসে নারীর ভোটাধিকার আদায়ের এ আন্দোলন Suffragette Movement নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। এ আন্দোলনের নেতৃবর্গ ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী Lioyd George-এর সঙ্গে তাদের দাবি-দাওয়া নিয়ে আলোচনা করেন। তারা পার্লামেন্ট সদস্যদের বরাবর হাজারো চিঠি পাঠান এই দাবি-দাওয়ার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে।

কিন্তু কোনো ফল না হওয়ায় অল্প দিনের মধ্যেই এসব নারীরা হিংসাত্মক পথে আন্দোলন শুরু করে। তারা বিভিন্ন রাজনৈতিক জনসভাগুলোতে হাজির হয়ে হই-হুল্লোড়, চিৎকার শুরু করে। পোস্ট অফিস, শূন্য বাড়ি, জাদুঘর এবং তাতে রক্ষিত আর্ট কালেকশন ও চিত্রকর্মসমূহকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে থাকে। তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে পুলিশ তাদের গ্রেফতার করে জরিমানা ধার্য করে। কিন্তু তারা জরিমানা প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে বাধ্য হয়ে পুলিশ আন্দোলনকারীদের জেলখানায় পাঠায়।

রাজনৈতিক কারণে তারা কারাবরণ করলেও জেলখানায় তাদের সঙ্গে ক্রিমিনাল দাগি কয়েদিদের ন্যায় আচরণ করা হয়, যা তাদেরকে আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে। এসবের প্রতিবাদে তারা জেলখানাতেই অনশন ধর্মঘট শুরু করে। সরকার তাদের জোর করে খাদ্য খাওয়ানোর চেষ্টা করে; কিন্তু ব্যর্থ হয়। ইতোমধ্যেই এসব ঘটনা ও এতদসংক্রান্ত খবরাদি ব্রিটেনের পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত প্রচারিত হতে থাকে। জনমত সরকারে বিপক্ষে চলে যেতে থাকে, যা সরকারের মাথাব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এরই মধ্যে ১৯১৩ সালে ব্রিটেনের বহুল জনপ্রিয় ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা Durby-তে অংশ নেওয়া ব্রিটেনের রাজার ঘোড়ার সামনে Emily Davidson নামের নারী অধিকার আন্দোলনের এক কর্মী নিজেকে ছুড়ে মারে এবং দ্রুত গতিতে ধাবমান ঘোড়ার পায়ে পিষ্ঠ হয়ে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করে।

আর যায় কোথায়! ছবিসহ এ খবর ব্রিটেনের পত্র-পত্রিকাগুলেতে প্রচার হয়ে পড়লে নারীদের ভোটাধিকারসহ সমঅধিকার আদায়ের আন্দোলনে নতুন গতি সঞ্চায় হয়। এ আন্দোলনের তেজ ও জনসমর্থন দুটোই বেড়ে যেতে থাকে। ঠিক এমন সময়ে ১৯১৪ সালে বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোলে নারী অধিকার আন্দোলন সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে পড়ে। কিন্তু এই যুদ্ধই আন্দোলনকারীদের জন্য এক অমূল্য সুযোগ হিসেবে দেখা দিলো। Elyzabeth Curry-এর ভাষায়–

> 'It was later realised that the war had done more to change the status of women in society than all the years of campaigning and violence by the Suffragettes.'
>
> অর্থাৎ 'পরবর্তী সময়ে এটা উপলব্ধি করা গেল যে, বছরের পর বছর আন্দোলন ও রক্তক্ষয়ী প্রতিবাদ দ্বারা সমাজে নারীর অবস্থানগত যে পরিবর্তন সাধন করা যায়নি, যুদ্ধের কারণে তার চেয়ে অনেক বেশি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।'[২১]

এর কারণ হিসেবে তিনি বর্ণনা করেন–

> 'Large numbers of men went away to fight in the war and women were needed to take over the jobs left by the men. For the first time women worked as ticket collectors and guards on the trains. They sorted and delivered letters and they ran the bus services.'
>
> অর্থাৎ 'বিপুল সংখ্যাক পুরুষ যুদ্ধে চলে গেল এবং সেসব পুরুষগণ কর্তৃক ফেলে যাওয়া কাজ সম্পাদনের জন্য মহিলাদের প্রয়োজন হয়ে পড়ল। এই প্রথমবারের মতো মহিলারা টিকিট কালেকটর এবং রেলগাড়ির গার্ডের দায়িত্ব পালন করল। তারা চিঠি বিলি-বণ্টন ও বাস সার্ভিসও চালু রাখুন।'[২২]

সমাজে এসবের একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ল। নারীজাতির এক বিরাট অংশ গৃহকোণ ছেড়ে বাইরে এসে সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব আঞ্জাম দিলো। নারীরা তাদের দাবি আদায়ে পূর্বের তুলনায় আরও বেশি সচেতন হলো। তাদের ভেতরে জন্ম নিল আত্মপ্রত্যয়, আস্থা ও বিশ্বাস। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ মহিলাদের পালিত ভূমিকার প্রশংসা করলেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী Lioyd George। এ সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থ হতেই তুলে ধরা হলো–

> 'By the end of the war nearly a million women were doing jobs outside the home and the Prime Minister Lloyd George praised them in a public speech, saying that without the help of women, Britain would have been unable to win the war.'
>
> অর্থাৎ 'যুদ্ধ শেষ হওয়াকালীন সময় নাগাদ প্রায় দশ লাখ মহিলা বাড়ির বাইরে কাজ করছিল এবং প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ প্রকাশ্যে জনসভায় তাদের প্রশংসা করে বললেন; নারীদের সহায়তা ছাড়া ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধে জেতা সম্ভব হতো না।'[২৩]

এ ঘটনার পরে সমাজে, বিশেষ করে সবশ্রেণির ব্রিটিশ পুরুষের চোখে মহিলাদের সম্মান বেড়ে গেল। ১৯১৮ সালে পার্লামেন্টে তিরিশ বছরের ওপর সকল মহিলার ভোটাধিকার প্রদান করে আইন পাশ করা হলো। এরপরেও তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের বয়স ত্রিশ হতে কমিয়ে পুরুষের ন্যায় একুশ বছরে নিয়ে আসতে আন্দোলনকারীদের আরও দশটি বছর সময় লেগেছিল।

আটলান্টিকের অপর পাড়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৮৭ সালে সর্বপ্রথম Susan B. Anthony নাম্নী এক মহিলা আমেরিকার সংবিধান পরিবর্তনের মাধ্যমে নারী ভোটাধিকার প্রদানের জন্য দাবি জানান। কিন্তু ওয়াশিংটনে আমেরিকান সরকার তার দাবির প্রতি কর্ণপাতই করেনি।

বিংশ শতাব্দীর একেবারে শুরুর দিকে পুনরায় এ সংক্রান্ত দাবি-দাওয়া উত্থাপিত হতে থাকে। ১৯০৮ সাল নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চারটি অঙ্গরাজ্য নারীদের ভোটাধিকার প্রদানে সম্মত হলেও তারা বাস্তবে এ সংক্রান্ত আইন রচনায় ব্যর্থ হয়। সেখানে নারী অধিকার আদায়ের আন্দোলনে নতুন গতি প্রদানের লক্ষ্যে ব্রিটেনের নারী অধিকার আন্দোলনের নেত্রী পূর্বোল্লেখিত Mrs Punkhurst-এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। ১৯১৮ সালে Alice Paul নাম্নী অপর এক ব্রিটিশ নারী অধিকার আন্দোলন কর্মী, নারী অধিকার আন্দোলনে নতুন ও কার্যকর পন্থা উদ্ভাবনের জন্য আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন।

অনেক বাদ-প্রতিবাদ, বাক-বিতণ্ডার পর ১৯১৮ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট Woodrow Willson নারী অধিকারের প্রতি তার সমর্থন ঘোষণা করেন। মার্কিন সংসদের নিম্নকক্ষে নারীদের ভোটাধিকার প্রদান করে একটি আইন পাশ করে, কিন্তু তা সিনেট কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়। এর এক বছর পরে সিনেট উক্ত আইন পাশ করলেও ভোটাধিকার পেতে মার্কিন মহিলাদের অপেক্ষা করতে হয়েছিল ১৯২০ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত।

ফ্রান্সের নারীরা এ অধিকার অর্জন করেছিল ১৯৪৬ সালে। অপর দিকে সুইজারল্যান্ড তার নারীদের ভোটের অধিকার প্রদান করেছে এই তো সেদিন, মাত্র ১৯৭১ সালে। ভোটাধিকার প্রাপ্তিকে নারীবাদীরা তাদের জন্য একটা বড়ো ধরনের বিজয় হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। নারী অধিকার আদায়ের ক্ষেত্রে এ ঘটনাকে একটি মাইলফলক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তাতেও কিন্তু নারী তার সমঅধিকার পায়নি। নারী তার ভোটাধিকার আদায়ে সফল হওয়ার কারণে আত্মবিশ্বাসী হয়ে এবার রাজনীতি ও প্রশাসনে পুরুষের পাশাপাশি অংশগ্রহণের জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু পুরুষ নারীকে তার কাঙ্ক্ষিত আসন ছেড়ে দেয়নি।

প্রদান করেনি সমাজ, সভ্যতা, প্রশাসনসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার। যদিও এই সমান অধিকার ও স্বাধীনতার কথা বলেই তারা নারীকে ঘর থেকে বাইরে টেনে এনেছে এবং তার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে অসহনীয় গুরুভার ও দায়িত্ব!

মুক্তি, স্বাধীনতা ও সমঅধিকারের স্বপ্নে বিভোর হয়ে জীবনের সবচেয়ে প্রিয় ঠিকানা; ঘর, পরিবার এবং জীবন সবকিছু ত্যাগ করেও সে সমাজ ও প্রশাসনে তার প্রতিপক্ষ(!) পুরুষের স্বীকৃতি পাচ্ছে না। এ প্রসঙ্গে বড়ো আক্ষেপ করেই Elyzabeth Curry তার উক্ত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

> 'Even if a woman is prepared to give up her family life and all her spare time to follow a political career, she still faces great prejudice because most people find it difficult to accept a woman in power over them.'
>
> অর্থাৎ একজন নারী তার রাজনৈতিক ক্যারিয়ার গঠনের জন্য নিজের জীবনের মূল্যবান সময়, তার ঘর, পরিবার ত্যাগ করা সত্ত্বেও কুসংস্কারবশত বিরাট বাধার সম্মুখীন হয়। কারণ, অধিকাংশ মানুষই তাদের ওপরে কর্তৃত্বকারী হিসেবে একজন নারীকে মেনে নিতে পারে না।'[২৪]

উল্লেখিত সত্যের বাস্তব প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই বর্তমান বিশ্বে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠান(?) ব্রিটেনের প্রশাসন ও রাজনীতিতে। ১৯৮২ সালের এক তথ্যে দেখা যায় যে, ব্রিটেনের পার্লামেন্টে ৬৩৫ সদস্য সংখ্যার মধ্যে মাত্র ১৯ জন মহিলা সংসদ সদস্য রয়েছেন। সমান অধিকারের নমুনা দেখুন! মাত্র শতকরা তিনজন মহিলা সংসদ নিয়ে পুরো ব্রিটিশ নারী জাতিকে তাদের সমান অধিকারের আকাঙ্ক্ষায় সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওই একই সময়ে মহিলা সংসদ সদস্যার হার ছিল শতকরা মাত্র ৪জন।

আশা করি এ সংক্ষিপ্ত ও তথ্যবহুল আলোচায় নারী কতটুকু সমান অধিকার প্রাপ্ত হয়েছে, তা পরিষ্কার হয়েছে। আসলে লম্পট প্রেমিক যেমন সরলমনা কিশোরীকে ভালোবাসা, উন্নত জীবন এবং ভবিষ্যৎ সুখের মিথ্যা প্রলোভনে ফেলে এক সময় প্রতারণা করে নিজ কামনা পূরণের মাধ্যমে কিশোরীর সর্বস্ব লুণ্ঠন করে, ঠিক তেমনি পুরুষ হতাশা-বঞ্চনা ও দারিদ্রভারে জর্জরিত, নিষ্পেষিত নারী সমাজের এক বড়ো অংশকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, পারিবারিক সুখ-শান্তি, সামাজিক সম্মান ও প্রভাব, সর্বোপরি উন্নত জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রলোভন দেখিয়ে সংসারের শান্ত, সুশীল ও স্নিগ্ধ ছায়া থেকে বের করে এনে শত কুটিল লোলুপ দৃষ্টি আর হাড়ভাঙা পরিশ্রমের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

প্রকৃতিগতভাবে প্রাপ্ত নারীর স্নেহময়ী সত্তাকে তারা নিষ্পেষিত করেছে সীমাহীন দায়িত্বের বোঝা কাঁধে তুলে দিয়ে। নারী তার অধিকারটুকু আদায়ের জন্য দ্বারে দ্বারে ঠোকর খেয়ে বেড়িয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রতিটি পদে সে ভিন্ন ভিন্ন পথ ও পদ্ধতিতে প্রতারিত ও অপমানিত হয়েছে।

এটা বড়োই আশ্চর্যের বিষয় যে, যে পুরুষ নারীর সম্মান ও অধিকারকে ভূলুণ্ঠিত করেছে, সেই পুরুষই আবার তাকে মাঠে নামিয়ে দিয়েছে তার হৃত সম্মান ও অধিকার আদায়ের জন্য!

নারী কার কাছ থেকে এই অধিকার ও সম্মান আদায় করবে? সেই পুরুষের কাছ থেকেই নয় কি, যে পুরুষ তাকে প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে এবং এখনও করে চলেছে! পুরুষ যদি সত্যিই নারীর অধিকার প্রদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আন্তরিক হয়, তাহলে ঘরে, পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর অধিকার ভূলুণ্ঠিত না করে তার প্রাপ্য অধিকার তাকে বুঝিয়ে দিলেই তো হয়! সমাজ ও রাষ্ট্রের আইন প্রণয়ন, প্রয়োগ ও পরিচালনার কর্তৃত্ব তো নারীর হাতে নয়; বরং পুরুষের হাতে। পুরুষ কিন্তু এ সহজ কাজটি করেনি। কারণ, তা করলে তো নারীকে আর ঘরের বাইরে টেনে আনা যাবে না। ঘরের বাইরে, যেখানে পুরুষের কর্মক্ষেত্র বিচরণ সেখানে নারীর সার্বক্ষণিক উপস্থিতি না থাকলে ইন্দ্রিয়দাস পুরুষের শান্তি হবে কী করে?

ঘর থেকে বের হয়ে আসা নারীর পক্ষে আর সহজে ঘরে ফেরা সম্ভব হয়নি। পথে নেমে একবার পথ হারিয়ে ফেললে, সহজে সেই পথটি ফিরে পাওয়া আসলেই কঠিন। ঘর নরীর কাছে এক সোনার হরিণ হয়ে দেখা দিলো। সে অর্থ পেল, অর্থের জোরে সমাজে পজিশন পেল। কিন্তু হারাল গৃহের শান্ত, স্নিগ্ধ আর সম্মানের সেই আসনখানি, যা একজন নারীর সারা জীবনের স্বপ্ন হয়ে থাকে।

নারী যখন গৃহ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। প্রকৃতপক্ষে তখনই শুরু হলো আজকের এ গর্বিত সভ্যতার(?) পতন প্রক্রিয়া। উদ্দাম গতিতে ধাবমান তথাকথিত প্রগতিবাদীরা এটুকু না বুঝলেও সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ কিন্তু ঠিকই শিউরে উঠেছেন। কারণ, তারা জানেন যে, নারীর প্রকৃত কর্মস্থল থেকে সে বিচ্যুত হলে এর পরিণতি কী হতে পারে। অতীত ইতিহাসে এর অনেক অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রখ্যাত মনীষী আরনল্ড টয়েনবি ঠিকই বলেছেন–

> 'দুনিয়ার পতনযুগ সাধারণত তখনই সূচিত হয়েছে, যখন নারী ঘরের চার দেয়াল ডিঙিয়ে বাইরে পা রেখেছে।' ২৫

একটি সমাজ সভ্যতা অগণিত পরিবারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। মানববংশ বৃদ্ধি এবং তাদের দৈহিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক সকল ধরনের বিকাশ ঘটে পরিবারকে কেন্দ্র করে। আর এই পরিবার দুজন মানব-মানবীর যৌথ সম্মিলন, যুগপৎ সমঝোতা, বিশ্বাস এবং ভালোবাসার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। পারস্পরিক প্রেম, ভালোবাসা ও বিশ্বাস হলো এই দুজনকে অটুট বাঁধনে বেঁধে রাখার মূল সূত্র।

নারী ঘরের বাইরে এসে আর্থিকভাবে স্বচ্ছল ও সাবলম্বী হওয়ার ফলে বেপরোয়া মানসিকতার শিকার হয়। ফলে সংসারের মূল সূত্র; বিশ্বাস ও আস্থার বদলে দানা বাঁধে পারস্পরিক অবিশ্বাসের। অনিবার্যভাবেই বিপর্যস্থ হয় পরিবার ব্যবস্থা। এ সত্যেরই প্রতিধ্বনি করেছেন পশ্চিমা জগতের বিখ্যাত দার্শনিক বারট্রান্ড রাসেল। তিনি বলেন–

> 'সরকার নারীদেরকে কাজে নিয়োগ করার কারণে পরিবার ধ্বংস হতে চলেছে। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, নারী অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হলেই শাশ্বত ও ঐতিহ্যগত নৈতিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং কোনো একজন মাত্র পুরুষের কাছে বিশ্বস্থ থাকতে চায় না।' [২৬]

একদিকে পারস্পরিক অনাস্থা, সন্দেহ-সংশয় এবং ভালোবাসা ও হৃদয়বৃত্তির অভাব, অপরদিকে সমাজের প্রতিটি স্থানে যেকোনো সময় যৌনক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা সহজলভ্য হওয়ায় পরিবার ব্যবস্থা মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। পশ্চিমা সমাজব্যবস্থায় নারীর তালাকের কোনো অধিকার না থাকায় (১৯৭০ সালের আগ পর্যন্ত) প্রেম-ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধহীন দুজন নর-নারী নিজেদের মনে পরস্পরের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণা পুষে রেখে সমাজে বৈধ স্বামী-স্ত্রী পরিচয়ে একই ছাদের নিচে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর বাস করতে বাধ্য হচ্ছে! এর চেয়ে মর্মান্তিক ও কষ্টদায়ক ঘটনা আর কী হতে পারে?

শত শত বছর ধরে নারী এভাবেই জুলুম-নির্যাতন ও অবজ্ঞার শিকার হয়ে অবরুদ্ধ মানসিক যন্ত্রণায় তড়পাতে থাকে। কত লাখো কোটি অসহায় নারী যে এভাবে মানসিক যন্ত্রণায় ধুঁকে ধুঁকে মরেছে, তার কে হিসাব দেবে? এই তো মাত্র কিছুদিন আগে ১৯৭১ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সর্বপ্রথম তালাকের অনুমতি দিয়ে আইন পাশ করা হলে প্রথম এক বছরের মধ্যেই ১২ (বারো) লাখ পরিবারের স্ত্রী তালাক পেয়েছে। কী নিদারুণ কষ্টকর এক স্মৃতি! ২৪ লাখ নারী পুরুষ তালাকের সুযোগ পেয়ে যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল! অপরদিকে ইটালিতে ১৯৭০ সলে তালাকের আইন পাশ হওয়ার সাথে সাথে এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই দশ লাখ তালাকের আবেদন জমা পড়ে।[২৭]

এ থেকেই বোঝা যায়, পশ্চিমা সভ্যতার এ দুটো উন্নত দেশে ২২ লাখ দম্পতি, অর্থাৎ ৪৪ লাখ নারী পুরুষ কী সাংঘাতিক মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে তাদের পারিবারিক জীবন অতিবাহিত করছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা পঞ্চাশটি বিয়ে তাদের প্রথম বিবাহ বার্ষিকীর পূর্বেই ভেঙে যায়। ১৯৯২ সালে এক বছরে ১ লাখ ৫০ হাজার নারী ধর্ষিতা হয়। সেখানে চার কোটি নারী পতিতাবৃত্তির মতো জঘন্য পেশায় নিয়োজিত। সভ্যতা গর্বিত, নারী অধিকার ও নারী স্বাধীনতার বিশ্বব্যাপী ফেরিওয়ালা, তথাকথিত উন্নত স্বর্গরাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গালে এ যেন চপেটাঘাত।

১৯৯৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন্মনিরোধ ও গর্ভপাতের সর্বোচ্চ ও সহজলভ্য সুযোগ থাকার পরেও ৩৩ লাখ (তেত্রিশ লাখ) অবৈধ জারজ শিশু জন্ম নিয়েছে। নারী স্বাধীনতা ও সমঅধিকারের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেওয়া ১ লাখ ৭০ হাজার নারী এ বছর ধর্ষিত হয়েছে।[২৮] American Medical Association- কর্তৃক প্রকাশিত এক রিপোর্টে এ ব্যাপারে বলা হচ্ছে–

> 'Around Three Fourth Million of Women are raped every year in the USA, and most of them (61%) are eighteen or under eighteen. In every 45 second at least one incidence of rape is occuring in the USA.'
>
> অর্থাৎ 'প্রায় সাড়ে সাত লাখ নারী প্রতি বছর ধর্ষিতা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং তাদের অধিকাংশেরই (শতকরা ৬১ জন) বয়স আঠারো বা তার নিচে। প্রতি ৪৫ সেকেন্ডে অন্তত একটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটছে আমেরিকায়।'

এত আন্দোলন, বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্ক যেখানে সংঘটিত হয়েছে, যে দেশে শিক্ষিতের হার শতকরা একশত, যেখানে প্রাচুর্য আর সম্পদের ছড়াছড়ি, যেখানে নারী পুরুষের সমঅধিকার, নারী স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা হয়েছে বলে দাবি করা হয়, ঘটা করে প্রচার করা হয়, বাহবা কুড়ানো হয়, সেখানেই এই অবস্থা! সেখানেই নারীর ইজ্জত আর জীবনের কোনো গ্যারান্টি নেই! এ কথা ভাবতে সত্যিই অবাক লাগে।

উন্নত বিশ্বের দেশসমূহে নারী যে শুধু ঘরের বাইরে পথে-ঘাটেই আক্রান্ত হয় তা নয়; বরং নারী তার ঘরের কোণেও নিরাপদ নয়। তার স্বামী, তার ভালোবাসার পাত্রটিও সাক্ষাৎ যমদূত হিসেবে আবির্ভূত হয়। আমেরিকায় প্রতি সেকেন্ডে একজন নারী এবং প্রতি বছরে দশ লাখ নারী শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয় তাদের স্বামী অথবা লিভ টুগেদার করা প্রেমিকের হাতে।

বছরে প্রায় চার হাজার নারী শারীরিক নির্যাতনের কারণে মৃত্যুবরণ করে। নারী সেখানে তার পরমাত্মীয় নিজ পিতার কাছেও নিরাপদ নয়। যে দেশে লম্পট বাবা নিজের ঔরসজাত ১৩ বছর বয়েসী কন্যাকে ধর্ষণ করে, সে দেশে সমাজে অন্যান্য পুরুষ সদস্যদের নিকট নারী কতটা নিরাপদ হতে পারে, তা সহজেই বোধগম্য।

এরই প্রতিফলন আমরা গোটা পশ্চিমাজগৎ তথা সমগ্র ইউরোপজুড়ে দেখতে পাই। ইটালিতে প্রতি ঘণ্টায় একজন কুমারী নারী তার সতীত্ব হারাচ্ছে। ফ্রান্সে প্রতি রাতে দশ হাজার নারী পঞ্চাশ হাজার পুরুষের যৌনতার শিকার হয়।[২৯]

ব্রিটেনে এক হাজার স্কুলছাত্রীর মধ্যে জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে যে, তাদের মধ্যে (তাদের নিজস্ব স্বীকারোক্তি অনুযায়ী) একজন ছাত্রীও তার সতীত্ব বজায় রাখেনি। অতি সম্প্রতি এক তথ্যে জানা গেছে যে, লন্ডনে প্রতি বছর চুয়াত্তর হাজার নারী তাদের ওপরে দৈহিক নির্যাতনের কারণে ঘর ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। (Inter regional Crime and Justice Research Institute কর্তৃক ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রদত্ত তথ্য)

ব্রাজিলে একমাস সামাজিক উৎসব পালনের কারণে কুড়ি হাজার অবৈধ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এ ছাড়া কত নারী যে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ধর্ষণ ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়, তার কোনো সঠিক হিসাব পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। অস্ট্রিয়াতে প্রতি পাঁচজন গৃহবধুর মধ্যে একজন নির্যাতনের কারণে ঘর ছেড়ে আসতে বাধ্য হয়। রাশিয়ায় ১৫ বছরের নিচে কিশোরীদের মধ্যে প্রতিবছর গর্ভপাতের সংখ্যা তিন হাজার। প্রতি বছরে তালিকাভুক্ত গর্ভপাতের সংখ্যা হচ্ছে ত্রিশ লাখ।[৩০]

কী সাংঘতিক অনাচার! ভাবলেই গা শিউরে ওঠে। উদারহণ টানলে এর পরিধি শুধু বেড়েই যাবে। কারণ, এ রকম হাজারো উদাহরণ টানা সম্ভব। জীবনের এহেন ক্লেদাক্ত দিক তামাম উন্নত বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

এসব তথ্য থেকে এ কথা পরিষ্কার যে, নারী স্বাধীনতা, সমঅধিকার আর নারী মুক্তি নিয়ে যুগ যুগ ধরে পরিচালিত আন্দোলন এবং তাদের সফলতার(!) গালভরা বুলি আর চটকদার জীবনের প্রচার প্রপাগান্ডার আড়ালে লুকিয়ে আছে এক করুণ ও বীভৎস দৃশ্য, এক কদাকার মিথ্যা। কিন্তু সভ্যতার দাবিদাররা এরূপ মিথ্যা ও কল্পিত সাফল্যের আড়ালে করুণ ও ভয়াবহ চিত্রকে কতদিন লুকিয়ে রাখবে? এখন তা আপনাআপনিই প্রকাশ হতে শুরু করেছে, আর সমগ্র বিশ্ব হতবাক হয়ে তা দেখছে!

পশ্চিমা জগতের এক বিখ্যাত চিন্তাবিদ স্যামুয়েল স্মাইলাম-এর কথায় তাদের হাহাকার ফুটে উঠেছে। তিনি বলেন–

> 'যে বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক বিধান নারীকে পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলার অনুমতি দিচ্ছে, সে বিধান দেশের সমৃদ্ধি যতই বাড়িয়ে দিক না কেন, পারিবারিক জীবনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।'

এ হলো এক সরল ও অকপট স্বীকারোক্তি। আত্মদহনে জ্বলে জ্বলে অনেক অনুশোচনার সাক্ষী হলো এ ধরনের স্বীকারোক্তি। শুধু যে তাদের পারিবারিক জীবনের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছে তা নয়; বরং তার চেয়েও বেশি। বলা চলে তাদের পারিবারিক জীবন বলতেই কিছু নেই। পরিবারগুলোতে এখন শূন্যতা ও হাহাকার। ধু ধু মরুভূমির মতো জনমানবহীন, যেখানে হতাশা আর অবরুদ্ধ কান্নাসহ দীর্ঘশ্বাসের তপ্ত হাওয়া ছাড়া কোনো সবুজ বাগানের স্নিগ্ধ সুশীতল ছায়া নেই। তাদের পরিবারগুলোতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নারী পুরুষের পাশে এখন আর কেউ নেই। কথা বলার জন্য বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা এখন আর কাউকে পায় না। পাশে নিত্য সহচর প্রভূভক্ত কুকুরগুলো তাদের দিকে করুণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। ভাষা থাকলে হয়তো কুকুরগুলো মানুষের এ হেন মর্মান্তিক অবস্থায় সান্ত্বনা দিত, প্রবোধ দিত। কিন্তু তাদের ভাষা না থাকার কারণে এসব অসহায় নারীপুরুষগুলো কোনো সান্ত্বনার বাণীও শুনতে পায় না!

সবাই আত্মকেন্দ্রিক, ব্যস্ত। কথা বলার ফুরসৎ কোথায়? ব্যক্তিস্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরশীলতার ধারণায় উজ্জীবিত। আত্মসম্মানবোধের দ্বারা তাড়িত প্রাণপ্রিয় সন্তানরা নিজ নিজ জীবন ও প্রয়োজন নিয়ে যার যার অঙ্গনে ব্যস্ত। একটু ফিরে তাকানোর সময়ও নেই। অসহায় পিতা-মাতাকে কোনো বিশেষ উপলক্ষ্যে হয়তো সুদূরের কোনো শহর হতে Long Distance Call-এ বড়োদিন বা জন্মদিবসের লগ্নে দু-একটা গতবাঁধা বুলি আওড়ে শুভাশীষ জানাল। নিঃসঙ্গতার জ্বালায় জ্বলে অঙ্গার হওয়া হৃদয়ের জন্য এগুলো সান্ত্বনার বাণী নয়; বরং জ্বলন্ত আগুনে ঘি ঢালারই নামান্তর। অসহায় বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা একটু সান্ত্বনার বাণী শোনার জন্য, একটু কথা বলা, মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য, মানুষের সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকে। তারা শেষ পর্যন্ত ছুটে যায় মনোচিকিৎসকের কাছে, মনস্তত্ত্ববিদদের কাছে। এ বিষয়টি Elizabeth Curry তার লেখায় ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবে–

> 'In America, most rich women seek help from psychologists, paying large amounts of money for the sort of talk and company which used to be provided by other members of the family.'[৩১]

অর্থাৎ 'আমেরিকাতে অধিকাংশ বিত্তশালী প্রচুর অর্থ খরচ করে মনস্তত্ত্ববিদদের শরণাপন্ন হন, এমন কিছু কথা ও সাহচর্য পাওয়ার জন্য, যা পরিবারের অন্যান্য সদস্য/সদস্যাদের কাছ থেকেই পাওয়া যাওয়ার কথা।'

একাকীত্বের এ জ্বালা অর্থ আর সম্পদ দ্বারা দূর করার চেষ্টাও ব্যর্থ হতে বাধ্য, আর তা হয়েছেও। ফলে এই একাকীত্ব মহিলাদের (মূলত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে) মনস্তাত্তিকভাবে পর্যুদস্থ করে ফেলেছে। Ellizabeth Curry-এর ভাষায়-

'Loneliness heas cauesd many women to develop psychological problems and some have turned to alcohol or drugs for comfort.'[৩২]

অর্থাৎ 'নিঃসঙ্গতা অনেক নারীর ক্ষেত্রে মানসিক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এদের কিছু সংখ্যক মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে অথবা ড্রাগস-এ আসক্ত হয়েছে শুধু একটু প্রশান্তি পাওয়ার আশায়।'

এটা হলো সমস্যার অন্য একটি দিক; এক ভয়াবহ চিত্র। এখানে রয়েছে আরও একটি বিভীষিকাময় ন্যাক্কারজনক দিক, যা পশ্চিমা সভ্যতাকে কুরে কুরে খাচ্ছে এবং ভেতর থেকেই শেষ করে দিচ্ছে। এ দিকটি মানবজীবনের জন্য স্থায়ী অভিশাপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। নারীকে তার বহু কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়ে অধীনতা বরণ করে নিতে হয়েছে শরাবের। যা তার নিজ সত্তা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নিঃশেষে ধ্বংস করে দিচ্ছে। American Society পরিচালিত জরিপের ফলাফল হিসেবে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দশ মিলিয়ন অর্থাৎ এক কোটি অ্যালকোহলিক রয়েছে। এখানে আমরা অ্যালকোহলিক-এর সংজ্ঞা যদি দেখি, তাহলে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, যারা কখনো কখনো অনিয়মিত মদ্যপান করে, যারা শারীরিক ও মানসিক কোনোভাবেই মদের ওপরে নির্ভরশীল নয়, তারা উল্লেখিত সংখ্যা ও অ্যালকোহলিক পরিচয়ের মধ্যে গণ্য হয় না। অ্যালকোহলিক-এর সংজ্ঞাটি দেখুন-

'Alcoholism is an illness characterized by significant impairment that is directly associated with persistent and excessive use of Alcohol, usually as an escape from stress. Impairment may involve Physiological, Psychological and Social dzsfunction.'[৩৩]

ওপরের সংজ্ঞাটিতে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে ক্রমাগত (Persistent) এবং মাত্রাতিরিক্ত (Excessive) এই দুটো বৈশিষ্টের সঙ্গে আরও থাকতে হবে শারীরিক, মানসিক অসংলগ্নতা এবং সামাজিকভাবে কর্মক্ষমহীনতা। এক কথায় অ্যালকোহলিক হিসেবে চিহ্নিত হতে হলে নিম্নোক্ত কয়টি শারীরিক ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে। যথা–

১. মদের ওপর সার্বক্ষণিক নির্ভরশীলতা

২. শারীরিকভাবে পঙ্গু (কম-বেশি)

৩. মানসিকভাবে বিপর্যস্থ (গ্রাম বাংলার ভাষায় কম-বেশি পাগল) এবং

৪. সামাজিকভাবে অক্ষম

দেখা যাচ্ছে এখন এই চারটি বৈশিষ্ট্য সম্বলিত মানুষের সংখ্যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক কোটি। তাহলে এ কথা বুঝতে খুব বেশি অসুবিধা হয় না যে, উল্লেখিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী নয় এবং এখনও কোনোরকম শারীরিক মানসিক ও সামাজিক জটিলতার সৃষ্টি হয়নি, এমন মদ্যপায়ীর সংখ্যা কত? উক্ত সমীক্ষার আরও কিছু দিক আছে যা প্রকৃত অর্থেই ভয়াবহ। যেমন দেখুন;

আইনসিদ্ধ না হওয়া সত্ত্বেও ৭-১২ বছর বয়েসী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৪৭জন মদপানে অভ্যস্ত। যেহেতু এই বয়েসী ছেলেমেয়েরা আইনসিদ্ধভাবে মদ পেতে এবং পানশালাতে যেয়ে পান করতে পারে না, তাই তারা লুকিয়ে বা গোপনে তাদের গাড়িতে বসে (উক্ত সংখ্যার মধ্যে শতকারা ৪০ জন) পান করে থাকে এবং সড়ক ও মটর দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়।

American National Institution of Alcoholism কর্তৃক দেওয়া তথ্য অনুযায়ী শতকরা একষট্টি (৬১)টি হত্যাকাণ্ড ঘটে মদপানজনিত কারণে, মদাপায়ীদের দ্বারা। আরও ভয়ংকর বিষয় হলো, প্রতি বছর এই হার ৭-১০ ভাগ হারে ক্রমবর্ধমান।

- ৪১% মারামারির ঘটনা মদপানজনিত কারণে ঘটে থাকে।
- ৩৪% ধর্ষণের ঘটনা ঘটে এ কারণে।
- আত্মহত্যার ৩০% ঘটে মদপানের কারণে।
- ৬০% শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটে থাকে মদপানের কারণে।
- ৭৫% সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে থকে মদপানের কারণে।
- ৫৫% গাড়িচালক মদপানের কারণে হতাহতের শিকার হয়।

- সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের মধ্যে রয়েছে ৩০% নিরীহ পথচারী, যারা মাতাল গাড়িচালকের শিকার।
- মদ্যপ কর্মচারীরা গড়পড়তা হিসেবের চেয়েও ২২ দিন বেশি তাদের কাজে অনুপস্থিত থাকে, ফলে উৎপাদন খাত ক্ষতির শিকার হয়।
- কল-কারখানায় মদ্যপ কর্মচারীদের দ্বারা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা ১০০% বেড়ে যায়।
- মদ্যপানে অভ্যস্ত নয় এমন সাধারণ শ্রমিকদের তুলনায় মদ্যপায়ী শ্রমিক গড়ে ১২ (বারো) বছর পূর্বে অবসর গ্রহণ করে থাকে। অর্থাৎ মদ্যপায়ী শ্রমিকের জীবনে কর্মক্ষম কর্মোপযোগী সময় অনেক কম।[৩৪]

অতি সম্প্রতি আমেরিকান এক গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জরিপে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। সে দেশে আঠারো বছর বা তদুর্ধ্ব নাগরিকদের মধ্যে ১৫.১ মিলিয়ন মদপানজনিত সমস্যায় আক্রান্ত।

বিগত ২০১০ সালে আমেরিকায় মদপানের পেছনে এক বছরে ২৪৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থ অপচয় হয়েছে।

আতঙ্কের বিষয় হচ্ছে ১২ বছর থেকে ১৭ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েদের মধ্যে শতকরা আড়াই ভাগেরই মদপানজনিত সমস্যা রয়েছে।

পনেরো বছর বা তার নিচের বয়সের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ৩৩% মদপানের কথা স্বীকার করেছে।

আমেরিকার কলেজ পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে (যাদের বয়স ১৭ থেকে ২২ বসরের মধ্যে) ৫৮% মদপান করে থাকে বলে নিজেরাই তথ্য দিয়েছে।

বিগত ২০১৫ সালের তথ্যানুযায়ী ৫.২%জন উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েরা মদপানজনিত সমস্যার কারণে চিকিৎসা নিয়ে থাকে।

মোটমুটি শতকরা কুড়িজন ছাত্র-ছাত্রীই মদপানজনিত সমস্যায় ভুগছে।

প্রতি চারজন ছাত্র-ছাত্রীর একজন, অর্থাৎ ২৫% জানিয়েছে যে মদপানজনিত কারণে তাদের লেখাপড়া ও একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়েছে।

বিগত ২০১৪ সালে আমেরিকায় ৯৯৬৭ জন মানুষ মদপানজতি কারণে গাড়ি দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছে।

পুরো বিশ্বে ২০১২ খ্রিষ্টাব্দে মোট তেত্রিশ লাখ লোক (৩.৩ মিলিয়ন) মারা গেছে মদপানজনিত কারণে।

ওই একই বছর, অর্থাৎ ২০১২ সালের এক জরিপে দেখা গেছে যে, পুরো আমেরিকায় শতকরা দশজন বাচ্চা এমন মা-বাবার সঙ্গে বসবাস করে, যাদের মদপানজনিত সমস্যা রয়েছে।

বিশ্বে অকাল মৃত্যুর কারণ হিসেবে মদ্যপানের স্থান পঞ্চম।[৩৫]

উক্ত রিপোর্টে অত্যন্ত আশঙ্কার সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে মহিলাদের মধ্যে মদপান ও মদপানজনিত পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে মাহিলাদের মধ্যে গর্ভপাতের হার যেমনি বেড়েছে, তেমনি জন্মগত বিকলাঙ্গ শিশুর জন্মের হারও অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে।

সম্মানিত পাঠক, চোখ বুঁজে উপরোল্লিখিত তথ্যগুলো একবার কল্পনা করে দেখুন। কোনো সুস্থ-শান্তিপিয়াসী মানুষ, সভ্য সমাজের কোনো সদস্য কি এমন একটি কদাকার সমাজের চিত্র কল্পনা করতে পারে?

এ কারণেই নারী স্বাধীনতা, নারীমুক্তি আর নারী অধিকার কায়েমের দেশে এসব গালভরা বুলির অন্তঃসারশূন্যতা বুঝে উঠতে সাধারণ নারীগোষ্ঠীর সময় লাগেনি। তাদের কাছে এখন নারী স্বাধীনতার ধ্যানধারণা পালটে গেছে। বলা চলে, অনেক মূল্য দিয়ে অনেক কিছু হারিয়ে পুরো পশ্চিমা সভ্যতায় স্বাধীনতা ও সমঅধিকার প্রাপ্ত নারীদের চেতনা ফিরে আসতে শুরু করেছে। এরই প্রতিফলন দেখি যখন একজন শীর্ষস্থানীয় নারীবাদী নেত্রীকে গলা ফাটিয়ে বলতে শুনি-

> 'Bringing up childeren is a career in itself. The women who stay at home to bring up their childern are the ones who are truly liberatead.'[৩৬]
>
> অর্থাৎ- 'সন্তান লালন-পালন করাটা নিজেই একটা ক্যারিয়ার, একটি পেশা। যে মহিলা তার ঘরে অবস্থান করে সন্তান লালন-পালনের জন্য সেই প্রকৃত স্বাধীন।'

বহু বছর পর, বহু অশ্রু, প্রাণ, সম্মান আর ইজ্জতের বিনিময়ে, ঘরের সুখ আর শান্তির বিনিময়ে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে এসেছে এ স্বীকারোক্তি। এরাই তো সন্তান লালন-পালন করাটাকে দেখেছে নারীর জন্য দাসত্ব হিসেবে। তারা সংসার থেকে,

সংসারে নারীর স্বতঃসিদ্ধ ও প্রকৃতি প্রদত্ত দায়িত্ব ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন এই জন্য যে, তারা আর দাসত্ব করতে রাজি নন। পুরো পশ্চিমা বিশ্বে, পশ্চিমা দর্শনে নারীকে এ লক্ষ্যে এখনও অনুপ্রাণিত, উজ্জীবিত করা হয়, যেন সে সংসারের ঘানি টানা হতে নিজেকে মুক্ত করে নেয়!

দীর্ঘ আলোচনার পর আমি কোনো মন্তব্য না করে শুধু এটুকুই স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, নারীর মনে দাসত্বের এ ধারণা সৃষ্টি করেছেন যিনি, তিনি কে? তিনি হলেন পশ্চিমা দর্শনের জনক প্লেটো। তিনি তার বিখ্যাত বই *Republic*-এ নারীর গৃহস্থালী কাজকর্ম ও সন্তান লালন-পালনকে দাসত্ব হিসেবে অবিহিত করে লিখেছেন–

> 'There are to be state Nurseries for Children. so Women will be relieve of Domestic Slavery.'[৩৭]
>
> অর্থাৎ 'রাষ্ট্রীয় (ব্যবস্থাপনায়) শিশু পরিচর্যা কেন্দ্র থাকতে হবে, যেন মহিলারা গৃহস্থালী দাসত্ব হতে মুক্ত হতে পারে।'

পাঠক, আজ হতে আড়াই হাজার বছর পূর্বে জন্ম নেওয়া প্লেটো ঘরকন্না, গৃহস্থালী কাজকে নারীর জন্য দাসত্ব হিসেবে দেখেছেন। আজও বিশ্বের কোটি কোটি আধুনিক ও প্রগতিশীল প্লেটোর মানস সন্তানরা গৃহকোণকে একইভাবে নারীর জন্য দাসত্ব হিসেবে দেখে থাকে। একেই না বলে আদর্শিক সন্তান!

জন্মই যখন আজন্ম পাপ

'বন্যরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে' সঞ্জীব চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কত সুন্দর করেই না পশু আর মানুষের ঠিকানা তুলে ধরেছেন। প্রকৃতি কর্তৃক নির্ধারণ করে দেওয়া এ চিরাচরিত ঠিকানাটি কিন্তু আমাদের তথাকথিত উন্নত সভ্যতা ধরে রাখতে পারেনি। আধুনিক সভ্যতার ধারক দাবিদাররা বনের পশুকে নিজ সন্তানের চেয়ে বেশি আদর, দরদ ও সোহাগ দিয়ে তুলে নিয়েছে নিজ কোলে। আর নিজ আত্মজ, ফুলের মতো শিশুদের মাতৃকোল থেকে নামিয়েছে পথে-প্রান্তরে। আধুনিক এই সভ্যতার কোনো উম্মাদ লেখক অনাগত ভবিষ্যতে হয়ত লিখতে বাধ্য হবেন 'বন্যরা ক্রোড়ে সুন্দর, শিশুরা পথে প্রান্তরে...'

আজ পশ্চিমা বিশ্বে অবস্থাটা অনেকটা এমনই দাঁড়িয়েছে। পিতৃ-মাতৃহীন অবস্থায় লাখো শিশু পথে-প্রান্তরে দিন কাটাচ্ছে। তারা জানে না তাদের বাবার পরিচয়, জানে না মায়ের পরিচয়। চিন্তা করুন, একটি শিশু তার জন্মের পরেও সারাটি জীবন বাবার মুখ দেখল না! বাবা বেঁচে থাকা সত্ত্বেও তার আদর-সোহাগ, শাসন জুটল না। পেল না মায়ের কোলের উষ্ণতা। মায়ের আঁচলের উষ্ণ কোমল পরশ তার কপালে জুটল না। এর চেয়ে মর্মান্তিক ও বেদনাদায়ক ব্যাপার আর কী হতে পারে? অথচ এসব তথাকথিত আধুনিক, সভ্য ও মানবতাবাদী লোকেরা নিজেদের ঔরসজাত সন্তানের চেয়েও তাদের পোষা কুকুরদের প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়ে থাকে। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের তথাকথিত উন্নত ও আধুনিক সভ্য দেশসমূহের রাস্তাঘাটে অহরহ চোখে পড়বে যে, বাবা-মা রাস্তায় চলার সময়ে দুধের শিশুকে বিশেষ ধরনের ঠ্যালাগাড়িতে করে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, আর তাদের যেকোনো একজনের কোলে ঠাঁই করে নিয়েছে প্রিয় পোষা কুকুর। হায়রে হতভাগ্য মানব সন্তান! এই আধুনিকতার উত্তাপে মায়ের কোলের প্রিয় উষ্ণতাটুকুও তাদের কপালে জুটছে না!

এ সভ্যতা একজন শিশুকে তার জীবনের সূচনালগ্ন থেকেই বঞ্চিত করা শুরু করেছে। জন্মের পরপরই প্রথমত তাকে মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত করেছে। মায়ের দুধ নবজাতকের জন্য স্রষ্টার প্রদত্ত অতি স্বাভাবিক মৌলিক অধিকার; যা সমগ্র জীব-জগৎ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আদায় ও প্রদান করে থাকে। অথচ সৃষ্টির সেরা বলে স্বীকৃত মানব জাতি তার নিজ আত্মজ, নিষ্পাপ শিশুকে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। মায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকায় জন্ম মুহূর্ত থেকেই মা-শিশুর মধ্যে প্রতিনিয়তই আদর-ভালোবাসা, দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতা, দেওয়া নেওয়া চলতে থাকে। এ ধারা গতিশীলভাবে।

মায়ের সান্নিধ্যে থাকার ফলে যেকোনো মানব সন্তানের মনোজগতে দয়া-মায়া, মমতা-সহমর্মিতা ও দায়িত্বাবোধের সুকোমল অনুভূতিগুলোর উন্মেষ ঘটে। এই মহৎ গুণাবলিগুলোর বিকাশ এবং চর্চার প্রাথমিক সূচনা কোনো স্কুল বা কলেজে হয় না; বরং তার শৈশবে মায়ের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যেই এসবের ভিত্তি রচিত হয়। মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে পারিবারিক পরিবেশে একত্রে বসবাস করে আদর-যত্নে লালিত-পালিত হওয়ার সুবাদে শৈশব হতেই তাদের মধ্যে এক ধরনের Healthy Interpersonal Relationship গড়ে ওঠে। ফলে তারা একে অপরের জন্য কষ্ট সইতে, ত্যাগ তিতিক্ষা করতে শেখে। বর্তমানে পশ্চিমা বিশ্বে পারিবারিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় যে পরিবারগুলো কোনো রকমে টিকে আছে, সেগুলোতে উল্লেখিত Healthy Interpersonal Relationship বা পারস্পারিক মজবুত সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। তাই স্নেহ-ভালোবাসা, দয়া-মায়া, ত্যাগ-তিতিক্ষার মতো মহৎ মানবীয় গুণাবলি এই প্রজন্মের জনগোষ্ঠীর মধ্যে মারাত্মকভাবে কম। ফলে তারা পিতা-মাতা, দাদা-দাদি, নানা-নানি, ভাই-বোনদের মতো আপনজনদের প্রতিও দয়াশূন্য নির্মম আচার-আচরণ করছে। সমাজের অন্যান্য লোকদের প্রতি তো কথাই নেই।

মার্কিন মুল্লুকে এই তো মাত্র সেদিন বকুনি দিয়েছিলেন বলে তেরো বছরের এক কিশোর তার বাবা-মাকে উপর্যুপরি ছুরিকাঘাতে নির্মম পৈশাচিকতায় নিজ হাতে হত্যা করে। শুধু তাই নয়, এই ছেলেটি পিতা-মাতাকে হত্যা করার পরও বিন্দু পরিমান অনুশোচনায় ভোগেনি; বরং এ জঘন্য হত্যাকাণ্ডের পরদিন সে দশ বছর বয়সী ছোটো বোনকে নিয়ে দোকানে যায়। সেখান থেকে একটা কুঠার কিনে আনে। ঘরে ফিরে এসে সে ওই কুঠারটি দিয়েই ছোটো বোনটিকে কুপিয়ে হত্যা করে। কী জঘন্য ও নির্মম পৈশাচিকতা! এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, ওই তরুণ খুনিকে কোনোভাবেই মানসিক ভারসাম্যহীন ছিল না। কারণ, মনোবিজ্ঞানীদের পরীক্ষায় সে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক হিসেবে ঘোষিত হয়েছে। তা ছাড়া হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পূর্বেও কোনো দিনই তার মানসিক রোগ কিংবা তার লক্ষণ দেখা যায়নি।

অপর একটি ঘটনায় সুসান স্মিথ নাম্নী ২৩ বছরের এক মহিলা তার তিন বছর বয়সী মাইকেল ও ১৪ মাস বয়সী আলেকজান্ডার নামের দুই পুত্রকে নিজ হাতে পূর্ব পরিকল্পনানুয়ায়ী অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় হত্যা করে। কারণ, এ শিশু সন্তানদ্বয় ওই মহিলার বয়ফ্রেন্ড-এর সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করার পথে সবচেয়ে বড়ো বাধা হয়ে দেখা দিয়েছিল। সেই বয়ফ্রেন্ড ২৩ বছর রয়স্কা সুসান-এর দায়িত্ব নিতে উৎসাহী হলেও তার দুই মাসুম শিশু সন্তানের দায়িত্ব নিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে মমতাময়ী(?) মা সুসান স্মিথ পথের কাঁটা সরাতে অতি সহজ পথই(?) বেছে নেয়। নৃশংসভাবে হত্যা করে নিজ সন্তানকে। পরবর্তী সময়ে পুলিশের তদন্ত টিমের নিকট তার এ অপরাধ অকপটে স্বীকার করে।

যে দুটো ঘটনা এখান উল্লেখ করা হলো, তা কোনো বিছিন্ন ঘটনা নয়; বরং পশ্চিমা সভ্যতার প্রতিদিনকার চালচিত্র। মা-বাবা ও সন্তানের মধ্যে দয়া-মায়া, ভালোবাসা ও আবেগের ঘাটতি হলে যে কতটা মানবতা বিধ্বংসী নির্মম ঘটনার জন্ম দিতে পারে, এ দুটো উদাহরণ থেকেই বোঝা যায়।

একটি শিশুর মানসিক, শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ঘটে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায়। এটা যে শিশুর বোধশক্তি জন্মানোর পরে ঘটে তা নয়; বরং জন্ম মুহূর্ত থেকেই এ প্রক্রিয়া চালু হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সর্বশেষ ফলাফলে দেখা যায় যে, একটি শিশু অতি শৈশবেই তার মাকে চিনতে পারে। মায়ের কণ্ঠস্বর ও সান্নিধ্য শিশুকে আলোড়িত ও উদ্দীপ্ত করে এবং সে মনোদৈহিকভাবে সাড়াও দেয়। এ কারণেই চিকিৎসাবিজ্ঞানীগণ জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুকে তার মায়ের কোলে দেওয়ার কথা বলে থাকেন। মায়ের শরীরের সঙ্গে শিশুর শারীরিক সংস্পর্শ ও উষ্ণতা বিনিময়ের মাধ্যমে মা ও শিশু উভয়ের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। চিকিৎসাবিজ্ঞানের ভাষায় এর নাম 'Bonding Process'।

জন্মলগ্ন থেকেই দুগ্ধ দানকারিণী মা সন্তানের প্রতি সর্বদা স্নেহের দৃষ্টি রাখেন। শিশুর ছোটো-বড়ো যেকোনো সুবিধা-অসুবিধা কাছ থেকে দেখার জন্য উদ্গ্রীব থাকেন। কোনো ত্রুটি চোখে পড়া মাত্রই সমাধা করার জন্য দরদমাখা উৎকণ্ঠায় ত্বরিত পদক্ষেপ নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বিষয়টা শিশুর কচি মনে এক গভীর ছাপ ফেলে। পাশাপাশি মনের ভেতর ঠাঁই করে নেয় তার কষ্টে বিচলিত হওয়া মায়ের জন্য মমতা ও শ্রদ্ধার এক অনাবিল স্বর্গীয় আবেগ। দিনের পর দিন স্নেহ, মমতা আর আবেগের এ অনুভূতি মা ও শিশুকে এক সুদৃঢ় পারস্পরিক বন্ধনে বেঁধে রাখে। শিশু তার শৈশব থেকেই মাকে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ ও আপনজন হিসেবে ভাবতে শেখে। যা পরবর্তী জীবনে মা-বাবার প্রতি দায়িত্ববান হতে প্রাথমিক ও অতি গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদ রচনা করে দেয়।

কিন্তু এর বিপরীতে যদি শিশু তার মায়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ ও নিবিড় উষ্ণতা থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে সে গভীর হতাশা, নিরাপত্তাহীনতা এবং আবেগজনিত শূন্যতার মাঝে পড়ে যায়। সে বিশ্বকে এক আত্মকেন্দ্রিক, নির্মম ও বৈরী আবাসস্থল হিসেবে চিনতে থাকে। ছোটোকাল থেকেই তার ভেতরে এক ধরনের বঞ্চনা কাজ করে। যা পরবর্তী সময়ে তার মনে আক্রোশ ও প্রতিশোধস্পৃহার জন্ম দেয়। কিন্তু বড়োই দুর্ভাগ্য আমাদের, বিশ্বের এই গর্বিত সভ্যতা(?) এ ব্যাপারে বড়োই অসচেতন।

জন্মের পরপরই তারা সন্তানদের পাঠিয়ে দিচ্ছে বেবি কেয়ার সেন্টারে অথবা বেবি সিস্টারের কাছে। জন্মের পর থেকেই শিশুকে মায়ের উষ্ণ সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করছে। মায়েরা নিজেদের শারীরিক কাঠামো ও অবয়ব আকর্ষণীয় রাখার জন্য পেটের সন্তানকে বুকে জমে থাকা প্রাকৃতিক নেয়ামত ও অমৃত সুধা থেকে সচেতনভাবেই বঞ্চিত করছে। মায়ের দরদ, মমতা ও স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়ে এসব শিশু সন্তান ডে কেয়ার সেন্টার, বেবি-কেয়ার সেন্টার, নার্সারিজ, বেবি-সিস্টার অথবা বাড়ির আয়ার কাছে পয়সার বিনিময়ে লালিত-পালিত হচ্ছে। তাদের মেকি হাসি এবং কৃত্রিম দরদ শিশুর হৃদয়কে স্পর্শও করে না। ফলে হৃদয় ও আবেগে সৃষ্টি হচ্ছে বিরাট এক শূন্যতার। এ পরিস্থিতিতে শিশুর হৃদয় ও মনের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে না। ভালোবাসাসহ সকল মানবীয় সুকুমারবৃত্তি ক্ষোভ, বঞ্চনা ও সীমাহীন হতাশার নিচে চাপা পড়ে যায়। এ সত্যেরই প্রকাশ ঘটছে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায়। মনের মধ্যে সঞ্চিত হচ্ছে হতাশা ও বঞ্চনাজনিত ক্ষোভ।

তারা ক্ষোভকে আর চেপে রাখতে পারছে না। মরিয়া হয়ে গণ্ডি থেকে বের হয়ে আসতে চাইছে। কিন্তু এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার কোনো সঠিক ও গঠনমূলক পথ-পদ্ধতি তাদের জানা নেই। তাই সমস্ত ক্ষোভ ও আক্রোশকে প্রকাশ করছে ভয়ংকর সব পন্থায়। তারা মৃত্যুদূত হয়ে আত্মপ্রকাশ করছে নিজ নিজ অঙ্গনে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের জোজুর জেনকিনস নামে ১৭ বছর বয়সী এক তরুণ তার মা-বাবা, দাদিসহ চার-চারজন আপনজনকে লৌহদণ্ড দিয়ে আঘাত ও ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। এখানে হাসপাতালগুলোতে বাইশ হাজার শিশুকে পরিত্যক্তাবস্থায় পাওয়া গেছে। হাসপাতালে চিকিৎসা শেষে ছাড়পত্র প্রদান করার পরও তাদের বাবা-মা তাদের নিয়ে যায়নি। ফেলে গেছে রাস্তার ছেলে হিসেবে।

এসব তথ্য শুনে, আমরা যারা সন্তানের পিতা-মাতা, তাদের বুকটা ব্যথায় কুঁকড়ে যায়, চোখ জ্বালা করে ওঠে। এরই নাম আবেগ। এই আবেগ থেকেই স্নেহ-মমতা ও দয়া-মায়ার উৎপত্তি। অথচ পশ্চিমা সভ্যতায় এই আবেগেরই চরম সংকট।

সেখানে সন্তান মায়ের পেটে জন্ম নেয় বটে, তবে মায়ের ভালোবাসা পেতে হয় আয়ার নিকট থেকে। সেটিও আবার টাকার বিনিময়ে। টাকার বিনিময়ে যে স্নেহ ভালোবাসা পাওয়া যায়, তা আর যাই হোক মায়ের ভালোবাসার বিকল্প হতে পরে না। তা মেকি এবং মেকিই থেকে যায়। আর এই মেকি মায়া-মমতায় বেড়ে ওঠা সন্তানরাই আজ পশ্চিমা বিশ্বের ঘাড়ে সাক্ষাৎ যম হয়ে চেপে বসেছে! প্রতিটি বাবা-মা ও নাগরিকই আজ তটস্থ, শঙ্কিত ও আতঙ্কিত! সামাজবিজ্ঞানীর এ সমস্যা থেকে উত্তরণের পথ বের করতে তৎপর।

অথচ সেখানে জন্ম মুহূর্ত থেকেই শিশুকে তার প্রকৃতিদত্ত জন্মগত মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। পশ্চিমা তথাকথিত উন্নত বিশ্বে একটি শিশুর জন্ম ও তার পরবর্তী জীবনের বাস্তব চিত্র এঁকেছেন মাসিক পৃথিবী, মে/১৯৯৭ সংখ্যায় জনাব শহিদুল ইসলাম ভূঁইঞা 'মার্কিন মুল্লুক : জীবন যেখানে ক্লেদাক্ত' নামক এক নিবন্ধে। তাঁর সেই নিবন্ধ হতেই খানিকটা তুলে ধরছি–

> '... একটি শিশুর জন্ম থেকে শুরু করা যাক। সর্বাধুনিক একটি হাসপাতালে শিশুটির জন্ম মুহূর্তে মা তার পাশে থাকলেন। কিছুদিন পরে তারা বাসায় ফিরল, কিন্তু শিশুটি তার মায়ের মায়ের কোলে আর ফিরল না। এখন তার আলাদা ঘর, আলাদা খাট। কেঁদে বুক ভাসালেও মা তাকে খাবার দিতে আসবে না। এতে নাকি তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ হবে। এবার শিশুটি একটু বড়ো হলো। তাই তাকে আর বাবা মায়ের কাছে নয়, বেশির ভাগ সময়ই থাকতে হচ্ছে বেবি-কেয়ার বা বেবি-সিস্টারদের কাছে। চার পাঁচ বছর বয়স হওয়া মাত্র সে দেখল যে, তার বাবা-মা আলাদা হয়ে গেছেন (শতকরা ৮০ ভাগ সম্ভবনা)। এই ঘটনায় সে যেন শক না পায়, এজন্য ব্যবস্থা করা আছে। স্কুলের পাঠ্য তালিকায় বাবা-মা আলাদা হয়ে গেলে কী করতে হবে, তা উল্লেখ করা আছে।'

পরিবারের এই ভাঙ্গন, বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ, এ সম্পর্কে কোমলমতি শিশু ও কিশোরদের যতই জ্ঞান ও মানসিক সহায়তা (Psychlogical Support) দেওয়া হোক না কেন, তাতে কিন্তু তাদের মনোদৈহিক প্রতিক্রিয়া এবং তার সুদূরপ্রসারী চারিত্রিক প্রতিক্রিয়ায় ভাটা পড়ছে না; বরং এটা একজন শিশু কিশোরের পুরো ব্যক্তিত্ব ও চারিত্রিক বিকাশে দারুণ প্রভাব ফেলছে। এ কচি বয়সেই তাদের চরিত্রে সমাজবিরোধী প্রবণতার জন্ম নিচ্ছে। এক মনোবিজ্ঞানী এভাবে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন-

One of the most commom clinical findings on male antisocial personalities is the report of a poor rtelationship with their fathers.' [৩৮]

অর্থাৎ- 'সমাজবিরোধী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের মধ্যে সবচেয়ে অধিক লক্ষ্যণীয় চিকিৎসা উপাত্তসমূহের মধ্যে একটি হলো, তাদের পিতাদের সঙ্গে তাদের খারাপ সম্পর্ক।'

জন্ম মুহূর্ত হতে বাবা-মা তথা পুরো পরিবার কর্তৃক নিদারুণভাবে উপেক্ষিত-অবহেলিত এসব শিশুরা তাদের শৈশব-কৈশোর থেকেই পুরো সমাজের প্রতি যেন মারমুখো হয়েই তৈরি হয়ে উঠছে। এটা আর কিছুই নয়, এটা হলো তাদের পুঞ্জিভূত হাতাশা আর ক্ষোভের প্রকাশ মাত্র। পাশ্চাত্য সমাজ ও সভ্যতার ছেয়ে যাওয়া শিশু কিশোরদের এ অপরাধ প্রবণতা বর্তমানে তাদের সম্মুখে সর্বগ্রামী প্লাবনের ন্যায় ধেয়ে আসছে। পশ্চিমা বিশ্ব, সেখানকার চিন্তাশীল সামাজিক নেতৃবৃন্দ এ সমস্যা সমাধানের জন্য দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। শিশুদের মধ্যে জন্ম নেওয়া অপরাধ প্রবণতা যাকে 'কিশোর অপারাধ বা Juvenile Delinquency' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। তার কারণ হিসেবে একটি অকাট্য, অখণ্ডনীয় বাস্তব সত্য কথা বলেছেন ইহুদি পরিবার থেকে ধর্মান্তরিতা হয়ে আসা নওমুসলিম মহিলা, প্রখ্যাত লেখিকা মরিয়াম জামিলাহ। তিনি তার এক লেখায় বলেছেন-

'Juvenile Delinquency is the Inevitable Concequences of the destruction of Home and Family.'[৩৯]

অর্থাৎ 'শিশু কিশোরদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা হলো ঘর ও পরিবার ধ্বংসেরই অনিবার্য পরিণতি।'

কাজেই এ কথা সহজেই স্বীকার করতে হয় যে, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক দিক থেকে সুস্থ, মৌলিক মানবীয় গুণাবলি দ্বারা গুণান্বিত এবং দায়িত্ববোধসম্পন্ন মানুষ গড়তে হলে একজন মানুষের শৈশব কৈশোর বাবা-মা উভয়েরই সান্নিধ্যে থেকে কাটানো উচিত। অফুরন্ত স্নেহ, ভালোবাসা, সহচার্য; মাতৃস্নেহ, বাবার কঠোর-কোমল আদর ও দায়িত্ববোধ সন্তানের প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হয় বলে এগুলো অতি সহজেই শিশুর হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়।

হৃদয়ের আবেদনে হৃদয় সাড়া দেয়। শিশুর কচি হৃদয় বাবা-মায়ের দেওয়া স্নেহ ভালোবাসা ও প্রীতির প্রতিদান দিতে চায়। তার কোমল হৃদয়ও তখন একই বৃত্তি ও বোধ নিয়ে এগিয়ে আসে। এভাবেই তার হৃদয়ের আবেগ-অনুভূতি শাণিত হতে থাকে এবং তা প্রকাশের পথ খুঁজে পায়।

প্রায় দেখা যায়, একজন মা কোলের কচি শিশুকে আদর করলে ওই শিশুও মায়ের হাতের আঙুল ধরে, চুল ধরে অথবা মায়ের নাক ও গালে নিজের কচি মুখ ঘসে স্নেহ ও আদরের সাড়া দিয়ে থাকে। এটাকে নিছক একটা শিশুসুলভ বা উদ্দেশ্যহীন চপলতা ভাবা বোকামি। এটা শিশুর মানসিক সাড়া (Emotional Response)-এর প্রমাণ।

এভাবেই জন্মের পর অর্থাৎ মায়ের কোল থেকেই শিশু সুস্থ ভালোবাসা প্রকাশ করতে শেখে এবং শিশু ও তার পিতা-মাতার মধ্যে একটা সুস্থ সম্পর্ক (Healthy Interpersonal Relationship) গড়ে ওঠে। যে শিশু তার বাবা-মায়ের সঙ্গে একটা সুস্থ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে, সে ভবিষ্যত সমাজ সভ্যতার যেকোনো স্থানে, যেকোনো সদস্যের সঙ্গে এ ধরনের সুস্থ সর্ম্পক গড়ে তুলেতে সক্ষম হয়।

বর্তমান পশ্চিমা সভ্যতায় এই প্রাণ শক্তিরই অভাব। সেখানকার শিশুরা এ ধরনের সুস্থ পারস্পরিক সর্ম্পক গড়ে তুলতে ব্যর্থ হচ্ছে। কেননা, তারা জন্মের পর পরিবার ও বাবা-মায়ের সান্নিধ্য পাচ্ছে না। প্রশিক্ষণ পাচ্ছে না তাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে। তাদের হৃদয়বৃত্তি ও আবেগ-অনুভূতির সুষ্ঠু বিকাশ ঘটছে না। ফলে তারা এক ধরনের আবেগীয় নির্লিপ্ততায় ভুগছে এবং মন-মগজে জমে থাকা প্রচণ্ড আত্মাভিমান ও হতাশা বঞ্চনাকে প্রকাশ করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠছে। জড়িয়ে পড়ছে প্রতিশোধমূলক কর্মকাণ্ডে। চারপাশে চেনা-অচেনা যাকেই পাচ্ছে তার ওপরেই চড়াও হচ্ছে। ড. জর্জ ম্যলির ভাষায়-

> 'Many Psychological ailments in young people are due to memories of babyhood for which their mother bears the blame. Lying, Torturing dumb animals, Delinquency appear in young people who have lacked a mother's care.
>
> অর্থাৎ 'কিশোরদের মনস্তাত্বিক ব্যাধির অনেকগুলোরই কারণ তাদের শৈশবের স্মৃতি, যার জন্য তাদের মায়ের ওপরেই দোষটা বর্তায়। যেসব তরুণ মায়ের স্নেহমাখা যত্ন লাভে ব্যর্থ হয়েছে। তাদের মধ্যেই মিথ্যা বলা, বাকশক্তিহীন পশুকে নিগ্রহ করা এবং অপরাধস্পৃহা দেখা যায়।'[৪০]

এ ধরনের নিগ্রহ যে তারা শুধু বাকশক্তিহীন পশুদের প্রতিই চালায় তা নয়; বরং তারা কোনো উপযুক্ত কারণ ছাড়াই সমাজে আত্মীয়-অনাত্মীয় যেকোনো ব্যক্তির ওপরেই আক্রমণ চালায়। ১২ বছরের এক কিশোরীর হাতে কোনো কাজ না থাকায় একাকীত্ব ঘোচাতে সে পিতার বন্দুক নিয়ে তিনজনকে খুন করে। ১৯ বছরের তরুণ খুন করলে কেমন লাগে শুধু এইটা উপলব্ধি করার জন্য একজনকে গুলি করে হত্যা করে।

কী সাংঘাতিক ভয়াবহ অবস্থা! চিন্তা করুন; শিশুরা বিনা কারণে মানুষ খুন করছে! শিশু-কিশোরদের মধ্যে অপরাধের এ প্রবণতা (Juvenile Delinquency) ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধির দিকে যাচ্ছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগীয় এক রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, ১৯৮৩ সালে যেখানে কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত অপরাধের সংখ্যা ছিল ৮৩,৪০০টি, সেখানে ১৯৯২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১,২৯,৬০০টিতে। ১৯৮৪ সালে কিশোরদের দ্বারা সংঘটিত হতাকাণ্ডের সংখ্যা ছিল ৯৬৯টি আর ১৯৯১ সালে এ সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ২২০২টিতে। আর এখন পর্যন্ত শুধু বৃদ্ধিই পেয়েই চলছে।

এসব শিশু-কিশোররা যেমনি নিজ পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের ওপর চড়াও হয়ে তাদেরকে হত্যা করেছে, তেমিন ঘরের বাইরেও এ রকম বীভৎসতা চালাচ্ছে। তারা স্কুল সহপাঠী ও শিক্ষক-শিক্ষিকার ওপর চড়াও হচ্ছে এবং নির্বিবাদে তাদেরকে হত্যা করছে। শিশু-কিশোরদের এ ধরনের ভয়াবহ প্রাণঘাতী ও আগ্রাসী রূপ জন্ম থেকে তাদের প্রতি নির্মমতা, অবজ্ঞা ও অনাদরেরই অনিবার্য পরিণতি।

এ থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে চাইলেও বর্তমান সভ্যতার নিস্তার নেই, প্রেত্বাত্মার মতো তাকে তাড়া করে ফিরবে। কারণ, আধুনিক ও উন্নত বলে গর্বিত এ সভ্যতার একটি শিশু পরিবার থেকেই নির্যাতনের মুখোমুখি হচ্ছে। আমরা ইতঃপূর্বে দেখেছি যে, একটি শিশু জন্ম মুর্হূত থেকেই তার মায়ের উষ্ণ কোলের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বেবি-সিস্টারের কাছে বাজারে গুঁড়ো দুধ খেয়ে দিন কাটাচ্ছে। অথছ শুধু নিজের শরীর ও সৌন্দর্য ঠিক রাখার ঠুনকো অজুহাতে তার মা তাকে বঞ্চিত করছে।

এ তো গেল নির্মমতার একটি দিক মাত্র। নির্মমতার আরও একটি ভয়ংকর দিক হলো, শিশুদের শারীরিকভাবে নির্যাতন বা শারীরিকভাবে আঘাত করা। পাশ্চাত্যের সভ্য ও উন্নততম আধুনিক পরিভাষায় Baby Battering, Child Abuse। এ সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে নারীবাদী লেখিকা, গবেষক ও নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের নেত্রী Ellizabeth Curry বলেন-

> 'Women and men may become so angry at a crying child that they will hit it very hard and injure it. This is known as Baby Battering and sometimes children have to be taken away from their parents because they are in physical danger.'[৪১]

অর্থাৎ 'ক্রন্দনরত শিশুর প্রতি নারী-পুরুষ (অর্থাৎ পিতা-মাতা) এতটাই ক্রোধান্বিত হতে পারে যে, তারা তাকে (শিশুকে) শক্ত আঘাত ও আহত করতে পারে। কখনো কখনো (এ অবস্থায়) তাদের পিতা-মাতার নিকট হতে শিশুকে সরিয়ে নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। কেননা, এমতাবস্থায় তারা (শিশুরা) শারীরিকভাবে ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।'

ওপরের উদ্ধৃতিতে শুধু সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। তবে এটা সম্ভাবনা নয়; বরং বাস্তবতা। পুরো পশ্চিমা বিশ্বে, এমনকী একই আদর্শে গড়ে ওঠা প্রাচ্য দেশসমূহেও শিশুদের জীবন সাংঘাতিকভাবে বিপন্ন। তারা নিজ বাবা-মা ও আত্মীয়স্বজনের হাতে বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছে। ভাবতে বড়োই আশ্চর্যবোধ হবে যে, এসব নিষ্পাপ ফুলের মতো শিশু যারা কোনোভাবেই নিজেদের আত্মরক্ষায় সমর্থ নয়, সেসব অসহায় শিশুদের ধরে ধরে নির্যাতন করা হয়, হত্যা করা হয়। এই একটি অমানবিক দিকই উক্ত সফল(?) উন্নত সভ্যতাকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। ১৯৯৫ সালের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিদিন কুড়িজন শিশু বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারায়।[৪২]

এ তো শুধু শিশু হত্যার ঘটনা। এ ছাড়াও তাদের প্রতি অত্যাচার ও নির্দয় ব্যবহারের ঘটনা তো রয়েছেই। এ প্রবণতা যে শুধু মার্কিন সমাজে, তা নয়; বরং সমগ্র পশ্চিমা সভ্যতায়ই মহামারির ন্যায় ছড়িয়ে পড়েছে। এই হার ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। শান্তি পিয়াসী প্রতিটি মানুষের বুক দুরুদুরু কম্পমান। এক প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানীর দেওয়া তথ্যে এই ঘটনার ভয়বাহ ও হৃদয়বিদারক চিত্র ফুটে উঠেছে।

'Incredibely from 1.2 million children in the United States are Kicked, Beaten or Punched by their parents every year.'[৪৩]

অর্থাৎ 'প্রতি বছর যুক্তরাষ্ট্রে অবিশ্বাস্যভাবে দশ থেকে বিশ লাখ শিশু তাদের পিতা-মাতা কর্তৃক লাথি, পিটুনি বা মুষ্ঠাঘাতের শিকার হয়।'

পুঁজিবাদী, বস্তুবাদী ও ভোগবাদী সমাজব্যবস্থায় একজন মানুষের কাছে নিজ কামনা-বাসনা পূরণ করাটাই আসল কথা। এ বিশ্বের সবকিছুকেই সে ভোগের উপকরণ হিসেবে দেখে, এমনকী তা যদি কোনো ব্যক্তিও হয়। তার চিন্তা-চেতনা, মন-মগজ পুরোপুরিই নিজ স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকে। সেখানে প্রেম-ভালোবাসা, দয়া-মায়া ও মহত্ত্বের মতো বিষয়গুলো একবারেই অবান্তর। আমরা এর উজ্জ্বল প্রমাণ পাই, যখন শুনি আপন পিতা তার ৬ মাসের শিশু কন্যাকে খাটের সঙ্গে বেঁধে ধর্ষণ করার মতো কলঙ্কজনক ঘটনার জন্ম দিচ্ছে।

এই ঘটনায় আমাদের বিবেক ডুকরে কেঁদে ওঠে। আমাদের সারা শরীর, মন ঘৃণা আর ক্ষোভে কাঁটা দিয়ে ওঠে, যখন এক কিশোরী কন্যাকে অবলীলায় অশ্রুসজল নয়নে সাংবাদিকদের কাছে বলতে শুনি 'I was first raped by my Father!'

কোথায় আছি আমরা? আমরা ধ্বংসের কোনো অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছি? ধন-সম্পদ ও শিক্ষায় আলোকিত একটি বিশ্ব সভ্যতার কি এটাই পরিচয়? আমাদের মনের শান্তি ও পেটের ক্ষুধা উধাও হয়ে যায়, যখন শুনি একজন পিতা ইনসুরেন্স কোম্পানির নিকট হতে অধিক পরিমাণ ইন্সুরেন্সের অর্থ আদায়ের জন্য নিজ গৃহে নিজ হাতে অগ্নিসংযোগ করে নিজেরই পাঁচ পাঁচটা সন্তানকে জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যা করেছে।[৪৪]

পাশ্চ্যত্যে একটি শিশুর জন্য নিজ ঘর বা পিতা-মাতার কোল যেমন নিরাপদ নয়, তেমনি নিরাপদ নয় স্কুল, খেলার মাঠ, বাজার বা রেস্তোরাঁও। মানুষ গড়ার কারখানা বলে পরিচিত স্কুলেও শিশুরা নিরাপদ নয়। সেখানেও তারা নিজের সহপাঠী, স্কুলের কর্মচারী, এমনকী মানুষ গড়ার কারিগর বলে স্বীকৃত শ্রদ্ধার আসনে আসীন শিক্ষক দ্বারাও যৌন নিপীড়নের শিকার হয়। ভয়ানক ব্যাপার হলো, যৌন নিপীড়নের হাত থেকে ছেলেশিশু পর্যন্ত রেহাই পায় না।

আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন অব উইমেন ইউনিভার্সিটি কর্তৃক পরিচালিত এক জরিপের ফলাফলে দেখা যায় যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে অষ্টম শ্রেণি থেকে একাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি ৫ জনের মধ্যে ৪ জনই (অর্থাৎ শতকরা ৮০ জন) স্কুল জীবনেই যৌন হয়রানির শিকার হয়। ওই সংগঠনের চেয়ারম্যান বলেছেন, আমেরিকার স্কুলগুলোতে যৌন হয়রানির মতো ভয়ংকর বিষয়গুলো মহামারি আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায় প্রতিদিনই শ্রেণিকক্ষে যৌন হয়রানির লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছে। শতকরা ৩২ ভাগ ছাত্র-ছাত্রী ও শতকরা ১০ ভাগ ছাত্র তাদের শিক্ষক ও স্কুল কর্মচারীদের দ্বারা যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে।[৪৫]

বস্তুত যৌনতা ও যৌন হয়রানির এ চিত্র সেখানে কোনো অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নির্বিশেষে পশ্চিমা ধারায় গড়ে ওঠা সমগ্র বিশ্বে এ ধারা অবলীলায় চলছে। এটাই বর্তমান সভ্যতার স্বাভাবিক চালচিত্র। এ নীতি-নৈতিকতাহীনতা, অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতা পুরো সমাজদেহকে গ্রাস করেছে। মানবতাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। শিথিল করে দিয়েছে সামাজিক বন্ধনকে। সেখানে মাত্র এক বছরে ৩৩ লাখ পিতৃ পরিচয়হীন শিশুর জন্ম হয়েছে। তারা জানে না, কে তাদের পিতা।

যে মা তাদের পিতার নাম-ঠিকানা জানাতে পারত, সেই মা'ও নতুন আরেক অতিথির জন্ম দিতে ক্ষণিকের যৌন উম্মাদনার এ ফসল ছেড়ে অন্য কোনো বন্ধুর খোঁজে চলে গেছে। আর পেছনে অনাদরে অবহেলায় ভবঘুরে হয়ে দ্বারে দ্বারে ঠোকর খাচ্ছে তার জারজ সন্তান। এ এক মর্মান্তিক দৃশ্য! কোনো সভ্য মানুষের পক্ষে এটা চিন্তা করাও দূরহ; অথচ এমনটিই ঘটে চলেছে।

কল্পনা করুন তো, একটি দেশের মোট যুবকের শতকরা ১৮ জনই জারজ। মোট শিশুর শতকরা ৩০ জন এবং মোট কিশোরের শতকরা ৩৩ জন জারজ। একটি দেশ, যেখানে দুই কোটি চল্লিশ লাখ শিশু পতিতাবৃত্তিতে নিয়োজিত।[৪৬] সে দেশ কি সভ্য হতে পারে? সে সমাজ, সে জাতি কি সত্যিই শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত? নিজেকে উন্নত সভ্যতা বলে দাবি করার কোনো নৈতিক অধিকার কি এ সভ্যতার আছে? এরা যদি এত অনাচার, এত অশ্লীলতার পরও সভ্য ও উন্নত হয়, তবে এ পৃথিবীতে অসভ্য ও বর্বর কারা? এই সভ্যতা যদি 'উন্নত সভ্যতা' হয় তবে 'উন্নত' ও 'সভ্য' এ শব্দদ্বয়ের নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা প্রয়োজন।

বস্তুতই বর্তমান বিশ্বে উন্নত বলে দাবিদার এ সভ্যতা আসলেই বর্বরতার সর্বনিম্ন স্তরে নেমে গেছে। এখন তার সামনে যা আছে, তা আর কিছুই নয়; শুধুই ধ্বংস। এ সভ্যতার উপায়-উপকরণ, উন্নত প্রযুক্তি-কৌশল, অগ্রগতি-সফলতা, বিত্ত-বৈভবসহ সমস্ত বিধি-ব্যবস্থা ধ্বংস হতে বাধ্য। ধ্বংসই এর একমাত্র পরিণতি।

ধ্বংস বলতে বোঝাতে চাচ্ছি, এ সভ্যতা অচিরেই নতুন কোনো আদর্শকে ধারণ করবে। সেই নতুন সভ্যতার কাছে নিজেদেরকে বিলিয়ে দিয়ে তার মাঝে বিলীন হয়ে যাবে। এই একটি মাত্র রাস্তাই তার সামনে খোলা আছে। আর এটা তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা উভয় অবস্থাতেই ঘটবে, ঘটতে বাধ্য, অনিবার্যভাবেই ঘটবে। কারণ, মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তি হলো সে সুখ চায়, সুখী হতে চায়। সুখ তার আজন্ম লালিত স্বপ্ন। বর্তমান সভ্যতার বিধি-ব্যবস্থা যেহেতু তাকে সুখ দিতে পারছে না, শান্তি-স্থিতি ও স্বস্তি দিতে ব্যর্থ হচ্ছে, অপারগ হচ্ছে নিরাপত্তা দিতে। তাই সে এই দার্শনিক ভিত্তিকে বর্জন করবেই করবে। এটা এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র। বিশ্বে ইতোমধ্যেই সে প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। তা সচেতন ব্যক্তিদের দৃষ্টিকে এড়িয়ে যেতে পারেনি!!

নৃশংসতা : বর্তমান সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ

বর্তমান সভ্যতার ধারকরা ধর্মীয় উন্মাদনার নামে কেবল ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্যের কারণে যুগে যুগে মানব ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। বিশ্বব্যাপী তাদের সেই নির্মম হত্যাকাণ্ড ও বর্বরতার বর্ণনা এই স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। তবুও ইতিহাসের সেইসব কালো অধ্যায় থেকে ছিটেফোঁটা দু-একটা ঘটনাকে উপস্থাপন না করে পারছি না।

১১৫২ খ্রিষ্টাব্দে চতুর্থ ইনোসেন্ট-এর আমল থেকে যাজকীয় আইন অনুসারে সারা ইউরোপজুড়ে অখ্রিষ্টানদের ওপর নির্যাতন ও হত্যা করার নীতি প্রবতির্ত হয়। যাজকরা অবশ্য নিজেদের হাতে এসব হত্যাকাণ্ড ঘটাননি। কে খ্রিষ্টান নয় অথবা কার ধর্মীয় বিশ্বাস খ্রিষ্টানদের বোধ-বিশ্বাসের বিপরীত, তা যাচাই করার পর সেই হতভাগাকে তুলে দেওয়া হতো স্থানীয় পৌর কর্তৃপক্ষের হাতে।

এবার পৌর কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো তার ওপর দণ্ড প্রয়োগ করা, সে দোষী না নির্দোষ তা যাচাই করা নয়। যিশু খ্রিষ্ট (হজরত ইসা আ.) যেহেতু রক্তপাত করতে নিষেধ করেছেন, ধর্মে যেহেতু রক্তপাত নিষিদ্ধ, তাই যাজকগোষ্ঠী ধর্মের পবিত্রতা(?) রক্ষায় এক নৃশংস ও নির্মম পদ্ধতির প্রচলন ঘটায়। আর তা হলো, এক বিরাটকায় কড়াইয়ে ফুটন্ত পানি বা তেলের মধ্যে হাত পা বাঁধা অবস্থায় অভিযুক্তকে ছেড়ে দেওয়া হতো। প্রচণ্ড উত্তাপে হতভাগা অপরাধী এক নিমেষেই দগ্ধ হয়ে মারা যেত। এরপর প্রচণ্ড উত্তাপে তার শরীর থেকে মাংস ও চর্বি গলে গলে পৃথক হয়ে যেত। পৃথক হয়ে যেত হাড়গুলোও। কী সুন্দর(?) ও বিজ্ঞানসম্মত অভিনব পন্থা! ধর্মের পবিত্রতাও বজায় থাকল, কোনো রক্তপাতও ঘটাতে হলো না; অপরদিকে অপরাধীর শাস্তিও কার্যকর করা হলো। আবার কখনো কখনো তা না করে অপরাধীকে আগুনে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হতো।

১২২০ খ্রিষ্টাব্দে রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডারিক (King Frederric the second) এক নতুন আইন প্রবর্তণ করেন। তাতে বলা হয়–

> 'অখ্রিষ্টানরা যদি খ্রিষ্টান পাদ্রী বা যাজকদের মতের সঙ্গে ঐক্যমত পোষণ না করতে পারে, তবে তারা সমাজবিরোধী। খ্রিষ্টান না হওয়ার জন্য তারা যদি অনুতপ্ত হয়, তাহলে তাদের শুধু বন্দি করা হবে। আর যদি নিজ ধর্মে স্থির থাকে, তবে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হবে।'[৪৭]

এরপরে ১২২৩ খ্রিষ্টাব্দের প্রধান ধর্মযাজক নবম গ্রেগরি এক অভিযান শুরু করেন। অখ্রিষ্টানদের খুঁজে বের করে খ্রিষ্টান বানাতে থাকেন এবং ধর্ম পরিবর্তনে অসম্মত ব্যক্তিদের শাস্তি প্রয়োগের নামে এক বিভীষিকাময় অবস্থায় সৃষ্টি করেন। এ অভিযানের ফলে লাখো মানব সন্তানকে হত্যা করা হয়, লাখো মানুষকে জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করে খ্রিষ্টান বানানো হয়। ইউরোপ তথা সমগ্র বিশ্ব ইতিহাসের পাতায় পাতায় এ অভিযান কুখ্যাত 'ইনকুইজিশন' অভিযান নামে পরিচিত হয়ে আছে।

দক্ষিণ ফ্রান্সের ধনী জমিদার কাউন্ট তুলোস খ্রিষ্টান ছিলেন না। তার প্রজা সাধারণও খ্রিষ্টান ধর্মে বিশ্বাসী ছিল না। ইনকুইজিশন অভিযানের আওতার কাউন্ট তুলোস নিজ ধর্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ করে খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানালে সম্মিলিত খ্রিষ্টান বাহিনী তাদের ওপর বীভৎস ও বর্বোরোচিত আক্রমণ চালায়। এ আক্রমণে অখ্রিষ্টান নারী-পুরুষ-শিশুসহ সকল বয়সী জনগণকে জঘন্য নৃশংসতায় হত্যা করা হয়। সেই বীভৎস চিত্রের বর্ণনা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মি. জেবি কিউরি তাঁর লেখা *A History of Freedom of Thought* নামক বইতে নির্ভরযোগ্য তথ্যের ভিত্তিতে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

এভাবে তারা নৃশংসতার দ্বারা ইউরোপ ব্যক্তিগত বিশ্বাস অনুযায়ী জীবন পরিচালনাকারী অখ্রিষ্টানকে হত্যা করে। প্রখ্যাত ভারতীয় ঐতিহাসিক শ্রী সুরজিৎ দাস গুপ্ত তাঁর লেখা *ভারতবর্ষ ও ইসলাম* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন–

> 'এর মধ্যে প্যাগন ধর্মাবলম্বী অথবা ব্যক্তিগত বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মীয় জীবনযাপন করার অপরাধে কত হাজার ইউরোপীয় নর-নারীকে আগুনে পোড়ানো হয়েছে, তার সঠিক হিসেব পাওয়া যায়নি। তবে এর ফলে একটা মহাদেশ থেকে প্যাগানরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।'

একাউন্ট অব তুলোস-এর হত্যাকাণ্ড সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি লেখেন-

> 'এ অভিযানে নারী ও শিশুদের হত্যা করা হয় ধর্মীয় উল্লাসে। ১২২৯ খ্রিষ্টাব্দে কাউন্ট অব তুলোস-এর শোচনীয় পরিণাম থেকে এটা প্রমাণিত হয় যে, একজন রাজার রাজা হওয়ার যোগ্যতা নির্ধারিত হবে রাজ্য থেকে অখ্রিষ্টানদের নির্মূল করার সম্মতিতে ও সামর্থ্যের ভিত্তিতে। যে রাজা আপন রাজ্য থেকে অখ্রিষ্টানদের উৎখাত করতে সম্মত ও সমর্থ হবে না, তার রাজা হওয়ার কোনো যোগ্যতা ও অধিকার নেই।'[৪৮]

এরা নিজের ক্ষমতা আর প্রতাপের আওতায় আপন ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম বিশ্বাসের অস্তিত্বই সহ্য করতে প্রস্তুত নয়। অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষদের তারা মানুষ মনে করত কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট অবকাশ আছে। এরা বিজয়ীর বেশে যে লোকালয়, জনপদ বা দেশেই প্রবেশ করেছে, সেখানেই রক্তের বন্যা বইয়ে ছেড়েছে। নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের প্রাণ ও ইজ্জত তারা হরণ করেছে। নারকীয় তাণ্ডবে জনপদের পর জনপদকে আতঙ্কিত করেছে। তাদেরই স্বজাতি ও স্বগোত্রভুক্ত বিশিষ্ট ঐতিহাসিক ও শিক্ষাবিদ তাঁর লেখায় এ রকম বর্বরতার অকপট স্বীকারোক্তি করেছেন। জার্মানির Prof. Hansebehard Mayer ক্রুসেড যুদ্ধে জেরুজালেম ও খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের দ্বারা সংঘটিত মুসলিম হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন–

> 'The Govorner and his Retinue were the only Muslims to escape alive. The Intoxication of victory, religious fanatcism and the memory of hardship bottled up for three years exploded in a horrifying bloodbath in which the Crusaders hacked down every one, irrespective of race or religion who was unfortunate enough to come within reach of their swords.
>
> They weded ankle deep in blood through streets covered with bodies.... The Muslim world was profoundly shocked by this Christian barbarity. It was a long time before the memory of this massacre began to fade.'[৪৯]
>
> অর্থাৎ 'গভর্নর ও তাঁর সভাসদগণই ছিলেন একমাত্র পলাতক জীবিত মুসলামন। বিজয়ের উন্মত্ততা, ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং তিন বছর ধরে চেপে রাখা কষ্টের স্মৃতি বিস্ফোরিত হলো ভয়ংকর এক রক্তপাতের মধ্যে দিয়ে। দুর্ভাগ্যক্রমে যারাই তাদের তরবারির নাগালের মধ্যে এসে পড়ল, তাদেরকেই ক্রুসেডারগণ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলল।

মৃতদেহে ছেয়ে যাওয়া রাস্তায় পায়ের গোড়ালি সমান রক্তের ভেতর দিয়ে অতি কষ্টে তারা হেঁটে যেতে থাকল। ...খ্রিষ্টানদের এমন বর্বরতায় গভীরভাবে হতবাক হয়ে গেল মুসলিম দুনিয়া। হত্যাকাণ্ডের এ স্মৃতি ভুলতে তাদের দীর্ঘ সময় লেগেছিল।

পুরো ক্রুসেড যুদ্ধই ছিল উন্মাদনা আর প্রতিহিংসাকে নির্ভর করে বীভৎস হত্যাকাণ্ড চালানোর জন্য খ্রিষ্টান ইউরোপের সম্মিলিত প্রচেষ্টার রূপ। ১৯০৮ সালে খ্রিষ্টানরা অ্যান্টিয়ক দখল করে নিলে সেখানে প্রায় দশ হাজার মুসলমানকে তারা হত্যা করে। সীমাহীন অত্যাচার ও ভয়াবহ নির্যাতন চালায় অসংখ্য মানুষের ওপর। তাদের অধিকাংশই ছিল অসহায় নারী ও শিশু।

শুধু সেই প্রাচীনকাল বা মধ্যযুগেই নয়; বরং যে যুগকে মানব ইতিহাসের চরম উন্নতির যুগ বলে বিবেচনা করা হয়, সেই আধুনিক যুগে এসেও তারা সমগ্র বিশ্ববাসীর চোখের সামনেই দীর্ঘ চার বছর ধরে বসনিয়ায় কয়েক লাখ নিরস্ত্র, বিপণ্ন বেসামরিক মুসলমানকে বীভৎস নৃশংসতার মাধ্যমে হত্যা করে। পুরো বসনিয়াবাসীকে তারা জাতিসংঘের ফরমান বলের সাহায্যে পুরো সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রতিরোধ সৃষ্টি এবং সাহায্য প্রাপ্তির ন্যূনতম পথটুকুও রুদ্ধ করে দেয়। তাদের সমূলে নির্মূল করার জন্য জঘন্যতম ও বর্বরোচিত প্রয়াস চালায়।

এই তো মাত্র সেই দিন, তথাকথিত গণতান্ত্রিক এবং স্বঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতের গুজরাটে হাজারো মুসলমান নারী-পুরুষ-শিশুকে সরকারি প্রশাসনের সহায়তায় প্রকাশ্যে দিবালোকে হত্যা করা হয়। তারপরও তাদের সভ্যতার মানদণ্ডে বিন্দুমাত্র চিড় ধরেনি।

এ ধারা পশ্চিমা আর্দশের ধারক-বাহকরা প্রতিটি যুগে, প্রতিটি স্থানে চালিয়েছে। আমেরিকা রেড-ইন্ডিয়ানদের, অস্ট্রেলিয়া আদিবাসীদের এবং ভারত বৌদ্ধদের সমূলে বিনাস করেছে। রাশিয়া হত্যা করেছে কোটি কোটি মুসলমানকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাগাদদে এরা কী ধরনের বর্বরোচিত নির্যাতন, নিপীড়ন ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল, তার এক হৃদয়স্পর্শী চিত্র পাওয়া যায় বিখ্যাত ঔপন্যাসিক মরহুম নসিম হিজাজির উপন্যাস আখেরি চাটান-এ (বইটির বাংলা অনুবাদ হয়েছে *শেষ প্রান্তর* নামে)। যা পড়লে প্রতিটি বিবেককবান মানুষের গা শিউরে ওঠে।

এ গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত সন্ত্রাসের আরও একটি জঘন্য ও ধ্বংসাত্মক রূপ হলো, এ সভ্যতার পূর্বসূরিগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ ও চর্চার সকল পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিল। জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চাকারীদের ওপর ধর্মের নামে, ধর্মের দোহাই দিয়ে চালিয়েছিল অমানুষিক নির্যাতন। যা মানবসভ্যতার জন্য বয়ে এনেছে এক অপূরণীয় ক্ষতি।

বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ নিত্য-নতুন আবিষ্কার-উদ্ভাবনকে তারা নিজেদেরদের মূর্খতা, অজ্ঞতা ও অন্ধ ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে কঠোর হস্তে দমন করেছে, ধ্বংস করেছে। সমকালীন সমাজের জ্ঞানী-গুণী, বিজ্ঞ ব্যক্তিদের দেশদ্রোহী, সমাজবিরোধী, ধর্মবিরোধী, উন্মাদ ইত্যাদি তকমা দিয়ে প্রহসনসূলক বিচারের মাধ্যমে তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেছে।

এ প্রহসনমূলক বিচারের মূল হোতা ছিল চার্চ ও যাজক শ্রেণি। তারাই চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করতেন কে অপরাধী, আর কে অপরাধী নয়। কে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য, আর কে মুক্তি পাওয়ার অধিকারী। তাদেরই নির্দেশে ধর্মীয় ভাবাবেগের সঙ্গে চালানো হতো এসব হত্যাকাণ্ড। যার শিকার হতেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমাজের জ্ঞানী-গুণী ও চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গ। বৈজ্ঞানিক গবেষকগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত এসব বর্বর ঘটনা থেকে গুটিকতক ঘটনা পর্যালোচনা করলে আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে এরা কতটা বাধার পাহাড় সৃষ্টি করেছিল।

'মাইকেল সার্ভেটুস' একজন বিখ্যাত চিকিৎসাবিজ্ঞানী ছিলেন। তাঁর সমকালীন সময়ে তিনি অত্যন্ত প্রতিভাবান ও পরিশ্রমী গবেষক হিসেবে বেশ পরিচিত ছিলেন। তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্য খ্রিষ্টানদের পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত বাইবেলের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হওয়ার কারণে তাঁকে চার্চের কোপানলে পড়তে হয়। যাজকদের নিদের্শে ১৫৫৩ সালে তাঁকে বন্দি করে ইনকুইজিশন আদালতের আওতায় বিচার করা হয়। প্রহসনমূলক এ বিচারে তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ এনে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। যেহেতু ধর্মে রক্তপাত নিষিদ্ধ, তাই তাঁকে জীবন্ত আগুনে পুড়িয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

ইটালির বিখ্যাত দার্শনিক 'জোরদানো'-কে একই কারণে পুড়িয়ে মারা হয় ১৬০০ খ্রিষ্টাব্দে। ১৬১৯ খ্রিষ্টাব্দে আরেক বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী 'লুসিলিও ভানিনি' ধর্মযাজকদের দৃষ্টিতে খ্রিষ্টবাদে অবিশ্বাসী বলে বিবেচিত হন। অথচ প্রকৃত অর্থে বয়োবৃদ্ধ এ বিজ্ঞানী ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান খ্রিষ্টান। যাজকশ্রেণির কোপানলে পড়ার কারণে তার জিহবা অত্যন্ত নৃশংসভাবে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয় এবং এর পরপরই তাকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়।

একইভাবে তৎকালীন ইউরোপের বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক মি. মার্লো যাজকগোষ্ঠীর দৃষ্টিতে অপরাধী সাব্যস্ত হোন এবং তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। হতভাগ্য এই বৃদ্ধ কবি আগুনে পুড়ে মরার আগেই হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

রানি এলিজাবেথের আমলে কর্পাস ক্রিস্টিদর ফেলো ফ্রান্সিস কেট-এর মতো বিজ্ঞ ও বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তিকেও যাজকদের রায়ের প্রেক্ষিতে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়।

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিও, যিনি বিশ্ব ইতিহাসে নামকরা জ্যোতির্বিদ ও বিজ্ঞানী হিসেবে পরিচিত- তিনিও বাইবেলের সাথে সাংঘর্ষিক সূত্র আবিষ্কারের কারণে খ্রিষ্টবাদে অবিশ্বাসী হিসেবে বিবেচিত হয়ে পড়েন। আর যায় কোথায়! তাকে অভিযুক্ত করে ঈশ্বরের সন্তুষ্টির জন্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করার আদেশ দেওয়া হয়। বেচারা গ্যালিলিও প্রাণের ভয়ে নিজের আবিষ্কৃত থিওরিকে ভুল বলে ঘোষণা দিয়ে মূর্খ, গোঁড়া ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন যাজকদের কাছে ক্ষমা চাইলেন। ফলে সেবারের মতো প্রাণে বেঁচে গেলেন। এর ছয় বছর পর গ্যালিলিও তাঁর গবেষণালব্ধ বিজ্ঞান বিষয়ক বই *ডায়ালগস* রচনা করেন। এটি ছিল তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল।

আবারও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। আবারও তিনি যাজক শ্রেণির দৃষ্টিতে অপরাধী(?) হিসেবে বিবেচিত হলেন। ফলে তাঁকে দণ্ডিত করা হলো প্রাণদণ্ডে। এবারও হতভাগা বিজ্ঞানী ভুল(?) স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন, প্রাণ ভিক্ষার আবেদন করলেন। কিন্তু চার্চ তাকে পূর্ণ ক্ষমা করল না। প্রাণ ভিক্ষা দিলো বটে তবে দেশ ছাড়তে হলো নির্বাসনের শাস্তি মাথায় করে। অথচ পরবর্তী সময়ে প্রমাণিত হয় যে, গ্যালিলিও তাঁর গবেষণায় সঠিক ছিলেন; পৃথিবী সত্যি সত্যিই সূর্যের চারদিকে ঘোরে। ভুল ছিল মূর্খ যাজকের বিশ্বাস এবং তাদের পরিবর্তিত বাইবেল।

এভাবে লাখো খ্যাত-অখ্যাত লোককে খ্রিষ্টীয় যাজকশ্রেণি ও পোপ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত সেই ইনকুইজিশন নামক কুখ্যাত আদালতের অবিচারে জীবন দিতে হয়েছে।

তৎকালীন সমাজে জ্ঞান-বিজ্ঞানের জগতে যে গবেষণা, চিন্তা ও যুক্তি প্রবণতার উন্মেষ ঘটেছিলো, তা দমনের জন্য তারা এ আদালত স্থাপন করেছিল। কারণ, বিজ্ঞানীরা তাদের জ্ঞান-গবেষণা, যুক্তি-প্রমাণ দ্বারা প্রতিদিন এসব তত্ত্ব, তথ্য দাঁড় করাচ্ছিলেন যে, এর ফলে যাজকদের মনগড়া, আজগুবি অদ্ভুত সব বোধ-বিশ্বাস, রসম-রেওয়াজ, নিয়ম-নীতির মূলে কুঠারাঘাত করেছিল। অথচ এগুলোই তারা এতদিন ধর্মীয় বিধিবিধান হিসেবে পালন করে আসছিল। এই বিবেক, বুদ্ধি আর যুক্তির স্বাভাবিক ধারা একের পর এক উন্মোচিত হতে থাকল। সর্ব সাধারণের নিকট চিন্তা ও বিশ্লেষণের এক নব-জোয়ার সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিলো। এতদিনের অন্ধ বিশ্বাস ও তার অসারতা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল; যা চার্চ ও যাজকতন্ত্রের জন্য এবং তাদের অস্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য হুমকি হয়ে উঠল।

ফলে এই যাজকরা অতি স্বাভাবিকভাবেই রুষ্ট হলো এবং কঠোর হাতে তাদের দমনের সিদ্ধান্ত নিল। এ কাজে তারা হাতিয়ার হিসেবে ধর্মকেই ব্যবহার করল। সমাজের জ্ঞানী, গুণী, চিন্তাশীল, গবেষক ও বিজ্ঞানীদের ধর্মত্যাগী বলে ঘোষণা দিতে থাকল। তাদেরকে নাস্তিক অখ্যায়িত করে, ধর্মবিরোধী বলে চিত্রিত করে বিচারের জন্য 'ইনকুইজিশন' কোর্ট নামক কুখ্যাত আদালত প্রতিষ্ঠা করল।

এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় যে, তৎকালীন ইউরোপে চার্চ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত এসব ইনকুইজিশন কোর্টে তিন লক্ষাধিক লোক দণ্ডাদেশ পেয়েছিল। গির্জার বিচারে(?) অপরাধের ধরন ও ব্যাপকতা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রদান করা হতো। এর মধ্যে বত্রিশ হাজার লোককে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছিল।

এদেরই একজন ছিলেন বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী ব্রুনো যার কথা ইতোমধ্যেই আমরা আলোচনা করেছি। তাঁর বহুজগৎ সংক্রান্ত ঘোষণা গির্জার নেতৃবৃন্দ তথা যাজকদের মধ্যে ক্রোধের উদ্রেক করে। ফলে তাঁকে বিচারের(?) রায়ে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়।

মূর্খতার অভিশাপে ভরা এ যুগেই খ্রিষ্টীয় গির্জা বিজ্ঞান চর্চা এবং স্বাধীন জ্ঞান চর্চাকে ধর্মবিরোধী বলে আখ্যায়িত করে। এই অপরাধের(?) শাস্তি হিসেবে ধার্য করা হয় অমানবিক দৈহিক নির্যাতন এবং মহাযন্ত্রণাদায়ক পদ্ধতিতে মৃত্যুদণ্ড। বিবর্তনবাদে বিশ্বাস স্থাপন করার কারণে Vanini-এর জিহ্বা ছিঁড়ে ফেলা হয়, সে কথা আমরা ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি।

প্লেটোর ভাবশিষ্য ও তাঁর রচনাবলির ব্যাখ্যাকার গবেষক Haptia-কে নির্মমভাবে হত্যা করা হয় ধর্মবিরোধী আখ্যা দিয়ে। Keneth Walker স্বীকার করে বলেছেন যে–

> 'একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শুধু মাদ্রিদ শহরেই চার্চের কোপানলে পড়ে তথাকথিত ধর্ম বিরোধিতার অজুহাতে তিন লাখ লোককে হত্যা করা হয়।'

অপরদিকে John William Draper বলেন–

> 'Inquesition Court-এর মাধ্যমে ১৪৮১ সাল হতে ১৮০৮ সাল পর্যন্ত কমপক্ষে তিন লাখ চল্লিশ হাজারজনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। যাদের মধ্যে বত্রিশ হাজারজনকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে।'

খ্রিষ্টান ক্রুসেডারদের দ্বারা যে নৃশংসতা সংঘটিত হয়েছে, তা বর্ণনা করা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। সমগ্র বিশ্ব এ নৃশংসতা দেখে শিহরিত হয়েছে। তারা ছোটো ছোটো ছেলে-মেয়েদেরকে ধরে তাদের পিতা-মাতার সামনেই হত্যা করেছে। আর লাশগুলোকে শিকারি কুকুরের খাদ্য হিসেবে তাদের সামনে ছুড়ে ফেলেছে। কখনো কখনো কচি শিশুদের ধরে প্রকাশ্যে পিতা-মাতা, আত্মীয়স্বজনের সামনেই দেয়ালে আছাড় দিয়ে হত্যা করেছে।

গর্ভবতী নারীর পেট চিরে গর্ভস্থ সন্তান বের করে ছুড়ে মেরেছে। জ্যান্ত মানুষকে আগুনে ঝলসে দিয়েছে। ইহুদিদেরকে তাদের বাড়ি-ঘর হতে তাড়িয়ে এনে হত্যা করেছে। প্রায়ই দেখা যেত পোপের প্রতিনিধিরা সোৎসাহে এসব হত্যাকাণ্ড সংঘটনে অংশ নিচ্ছে।

১২১৬ খ্রিষ্টাব্দে পোপ তৃতীয় Innocent সিরিয়ার এক ধর্মযুদ্ধে দুই লাখ ক্রুসেডারকে প্রেরণ করেন। তারা সেখান থেকে মিশরে যায় এবং সেখানে তারা সত্তর হাজার নর-নারীকে অমানুষিক নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে। এদেরই উত্তরসূরি একই আদর্শ ও শিক্ষার ধারকরা সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ জুড়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কী নির্মম ও নৃশংসতার সঙ্গে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, তা এ বিশ্ববাসীকে দ্বিতীয়বার মনে করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। এমনকী, শিক্ষা ও বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতি ও প্রগতির যুগেও বিশ্বজুড়ে দুর্বল ও অসহায় মানবগোষ্ঠীকে তারা কৌশলে একই রকম নির্মমতা ও বর্বরতার সঙ্গে হত্যা করে যাচ্ছে। এই তথাকথিত উন্নত আধুনিক সভ্যতা ফিলিস্তিনে প্রায় প্রতিদিনই নিরাপরাধ নারী-শিশুকে হত্যা করে যাচ্ছে। আধুনিকতা, প্রগতি ও শিক্ষা কোনো কিছুই তাদের মন-মগজ, চিন্তা-চেতনা, ধ্যানধারণায় ও বিশ্বাসে পরিবর্তন আনতে পারেনি।

বর্তমান সভ্যতার বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি : ইসলামের অবদান

বিশ্ব সভ্যতা ও জীবনের বিভিন্ন দিকে ইসলাম যে গভীর ও স্থায়ী প্রভাব বিস্তার করেছে, তা এক কথায় বিস্ময়কর! বিশেষ করে এ বিশ্ব সভ্যতাকে ইসলাম যে বিশাল ও অসীম জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান দিয়েছে, তা অতুলনীয়। জিসি ওয়েলস- এর ভাষায়–

> 'আরবদের মধ্য দিয়েই মানব ভাগ্য তার আলোক শক্তি সঞ্চয় করেছে, ল্যাটিন জাতির ভেতর দিয়ে নয়।'

অপর একজন প্রখ্যাত চিন্তাবিদ মেজর আর্থার লিন ওয়ার্ড বলেন–

> 'আরববাসীদের মাঝে সভ্যতা, মানসিক উৎকর্ষ ও উচ্চশিক্ষার প্রণালী প্রবর্তিত না হলে ইউরোপ অদ্যাবধি অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমগ্ন থাকত। বিজেতার ওপর তারা যে রকম উদারতা ও সদ্ব্যবহার প্রদর্শন করেছিল তা সত্যিই চিত্তাকর্ষক।'[৫০]

অপর দিকে অন্য এক স্বনামধন্য ব্যক্তিত্বের অকপট স্বীকারোক্তি দেখুন-

> 'The ideals of freedom for all human beings, of human brotherhood, of the equality of all men before the law, of the democratic government by consultation and universal suffrage, ideal that inspired the Franch Revolution, and the declaration of Rights that guided the framing of the American Constitution, and inflamed the struggle of idependence in Latin American Countries, were not the inventions of the West. They find their ultimate inspiration and source in the Holy Quran.'

অর্থাৎ 'সকল মানুষের জন্য স্বাধীনতা, ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনা, আইনের দৃষ্টিতে সকলের সমতা, পরামর্শের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সরকার পরিচালনা, বিশ্বজনিন ভোটাধিকার, সেই চেতনা যা ফরাসি বিপ্লবকে অঙ্কুরিত করেছে। স্বাধিকার বোধের সেই ঘোষণা, যা মার্কিন সংবিধানকে একটি কাঠামো প্রদান করেছে, ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহের স্বাধীনতার আগুনকে যা প্রজ্জ্বলিত করেছে। সেসব পশ্চিমা সভ্যতার কোনো দান নয়; বরং এ সকল চেতনা ও অভিব্যক্তি তারা শেষ পর্যন্ত আল কুরআন হতেই পেয়েছে। (উক্তিটি করেছেন Prof. Brifault তার The Making of Humanity নামক গ্রন্থে)[৫১]

মুসলমানরা যে দেশই জয় করেছে, সে দেশেই জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বিজিত বা বিজয়ী সকলের জন্য একই রকম আইন চালু করেছে। তারা এ ক্ষেত্রে কোনোরূপ ব্যতিক্রম বা তারতম্য সহ্য করেনি। ফলে বিজিত শ্রেণি অচিরেই বিজয়ী গোষ্ঠীর সঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মিশে একাকার হয়ে গেছে। কোনো হীনমন্যতা যেমন বিজিত শ্রেণির মনে জাগতে পারেনি, তেমনি বিজয়ীদের মনেও কোনো রকম শ্রেষ্ঠত্ববোধের অহমিকা গড়ে ওঠেনি। সকল শ্রেণির মানুষে মধ্যে এই ধরনের ঐক্য, অভিন্ন নীতি ও ইনসাফ বজায় থাকার কারণে যথাসম্ভব স্বল্প সময়ের মধ্যেই সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ফলে মুসলমানরা প্রশান্ত হৃদয়ে ও দুশ্চিন্তাহীন মানসিকতায় নিজেদের জ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করতে পেয়েছে। আর এ জ্ঞানচর্চা তাদের কাছে নিছক নাম, যশ, খ্যাতি কুড়ানোর মাধ্যম ছিল না; বরং এটি ছিল তাদের কাছে ইবাদাত, আল্লাহর বন্দেগি। স্বয়ং আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন–

'তোমরা জ্ঞান অন্বেষণ করো। কেননা, যে আল্লাহর পথে জ্ঞান অন্বেষণ করে, সে ধর্মের কাজ করে। যে জ্ঞানের কথা বলে, সে আল্লাহর প্রশংসা করে। যে জ্ঞান অন্বেষণ করে, সে আল্লাহর ইবাদাত করে। যে জ্ঞান দান করে, সে সাদাকাহ করে। আর যে উপযুক্ত পাত্রে জ্ঞান দান করে, সে আল্লাহর প্রতি ভক্তি ও ভালোবাসা প্রকাশ করে।'

রাসূল ﷺ-এর এ ধরনের নির্দেশ ও উৎসাহের ফলে অশিক্ষিত আরববাসীগণ জ্ঞান আহরণের জন্য পাগলপারা হয়ে উঠল। জ্ঞান আহরণের পেছনে তাদের উদ্দেশ্যই আমূল বদলে গেল। নবি করিম ﷺ প্রায়ই তাঁর সাহাবিদের বলতেন 'যে জ্ঞানের অন্বেষণে ঘর থেকে বের হয়, সে আল্লাহ পথে সফর করে।' জান্নাত প্রত্যাশী আরববাসী নওমুসলিমদের তিনি শোনালেন বিস্ময়কর বাণী, যে জ্ঞানের সন্ধানে ভ্রমণ করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের পথ দেখান।

আর যায় কোথায়! জান্নাত পাওয়ার জন্য পাগলপারা হয়ে জ্ঞান আহরণে স্বর্বস্ব নিয়োগ করল নওমুসিলমরা। জ্ঞানের গুরুত্ব তুলে ধরে রাসুল ﷺ যে রকম সুস্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় মন্তব্য করেছেন, বিশ্বের আর কোনো নেতা তা করেননি। তাঁর এ মন্তব্যটি দেখুন–

> 'জ্ঞান এমনই বস্তু যা জ্ঞানীকে ভালো-মন্দ ও বৈধ-অবৈধ বস্তুর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে সাহায্য করে এবং জান্নাতের পথ উদ্ভাসিত করে। নিঃসঙ্গতায় জ্ঞান বন্ধুস্বরূপ। জ্ঞান মানুষকে শান্তির পথে পরিচালিত করে। বিপদে সাহস জোগায়। বন্ধুমহলে জ্ঞান অলংকার এবং শত্রুর বিরুদ্ধে বর্মস্বরূপ। জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ সমাজের শীর্ষে অবস্থান করে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে এবং পরকালে জান্নাত লাভ করে।'

বিশ্বে আর কোনো ধর্মীয় বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব জ্ঞানকে উল্লেখিত ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন? তাই তো ইসলামের অনুসারীগণ জ্ঞানচর্চা ও বিকাশের ক্ষেত্রে মাত্র কয়েক শতকের ব্যবধানেই সাড়া বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হন।

রাসূল ﷺ-এর আবির্ভাবের পূর্বে অর্থাৎ খ্রিষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম হতে ৬ষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ সময়টি ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জমাট বাঁধা অন্ধকার যুগ। এ সময়টা জুড়ে বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের জগতে নিদারুণ অবহেলা, অবজ্ঞা ও কুসংস্কার লক্ষ্যণীয়। আমরা এ ছয়শত বছর সময়কালকে অন্ধকার যুগ বা জাহেলিয়াত বলে চিহ্নিত করতে পারি। ওই সময়কালের প্রতিটি উল্লেখ্যযোগ্য দেশেই চলছিল শক্তির লড়াই। তারা নিজ নিজ শক্তি প্রদর্শন, আধিপত্য বিস্তার ও রক্ষায় নিয়োজিত ছিল। সুদূর মিসর হতে শুরু করে গ্রিক, মেসোপটেমিয়া মেসিডোনিয়া, পারস্যসহ ছোটো-বড়ো সকল শক্তিধর দেশেই চলছিল রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা। রাজরাজড়া ও ধর্মীয় যাজক শ্রেণির সীমাহীন অত্যাচার এবং ইহুদি পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক শোষণ মানব সভ্যতার প্রতিটি সদস্যের জীবনকে দুর্বিসহ যন্ত্রণায় বিদ্ধ করে রেখেছিল। ঠিক এই সময়েই মুক্তি, স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি, সাম্য ও সৌহার্দের বাণী নিয়ে হাজির হলেন মহামানব, মহান নেতা মুহাম্মাদ ﷺ।

তিনি এসেই দৃঢ় প্রত্যয় ও আস্থার সঙ্গে ঘোষণা করলেন; 'আমাকে শিক্ষক করে প্রেরণ করা হয়েছে।' অথচ কে না জানে যে, তিনি ছিলেন অক্ষরজ্ঞান বিবর্জিত, নিরক্ষর বা উম্মি ব্যক্তি! আসলে তাঁর কাছে ছিল ইসলাম তথা জ্ঞানের উৎস। বিশ্ব মাখলুকাতের স্রষ্টা অসীম জ্ঞানী আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে দেওয়া অহির জ্ঞানে তিনি ছিলেন জ্ঞানী। তাই তাঁর পক্ষে নির্দ্বিধায় বলা সম্ভব হয়েছিল 'আমাকে শিক্ষক হিসেবে পাঠানো হয়েছে' বা 'আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।'

যেহেতু তাঁর আগমনই হয়েছিল সমস্ত জাহেলিয়াতের আঁধার দূর করার জন্য, মানুষকে জ্ঞানের সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত ও প্রশিক্ষিত করার জন্য এবং তাদের জ্ঞানের প্রকৃত উৎস চিনিয়ে দেওয়ার জন্য। তাই তিনি এসেই ঘোষণা করলেন-

> 'জ্ঞানীর কথা শোনা এবং হৃদয়ে বিজ্ঞানের পাঠে উদ্বুদ্ধ করা ধর্মীয় অনুশীলন অপেক্ষা উত্তম, একশো দাস মুক্ত করার চেয়েও উত্তম।'
> আরও বললেন 'যে আলেমকে সম্মান করে, সে আমাকেই সম্মান করে।'

এর ফলে মানুষের মন-মস্তিষ্ক ও চিন্তা-চেতনায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত হলো। দৃষ্টিভঙ্গিতে বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধিত হলো। অনিবার্য ফল হিসেবে মরুভূমির বর্বর জাতির প্রতিজন সদস্য, যারা কিনা নতুন এ ধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী হয়ে আত্মপ্রকাশ করল, তারা সকলেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় এক একজন একনিষ্ঠ সাধকে পরিণত হয়ে গেল। তারা জীবনের সকল প্রচেষ্টা ও সময়কে জ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত করল। ফলে অচিরেই বিজ্ঞানচর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সূচিত হলো এক নতুন রেনেসাঁসের। বিশ্ব ইতিহাসে ৭০০ খ্রিষ্টাব্দ হতে ১১০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে বিজ্ঞানের রেনেসাঁসের যুগ বলে অভিহিত করা হয়। বিজ্ঞানের এমন কোনো শাখা ছিল না, যেখানে মুসলমানরা বিস্ময়কর সব আবিষ্কারের পথিকৃৎ হিসেবে আবির্ভূত হোননি।

আরব জ্যোতির্বিদ 'মাশাআল্লাহ' এবং 'আহমদ ইবনে মুহাম্মদ আল নেহাবন্দি' জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণায় বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেন। 'মাশাআল্লাহ' গ্রহ-নক্ষত্র ও তাদের গতি সম্বন্ধে বহু গবেষণা গ্রন্থ রচনা করেন। ৮৭৩ খ্রিষ্টব্দে মুহাম্মদ ইবনে মুসা, ইবনে শাকের সূর্য ও অন্যান্য জ্যোতিষ্কের গতিপথ নির্ধারণে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছিলেন, তা এখনও বিশ্ববাসীর জন্য বিস্ময়কর। এ পৃথিবী যে গোল, এ তত্ত্ব তারা এমন এক সময় ঘোষণা করেছিলেন, যখন সমগ্র বিশ্ব, বিশেষ করে সমগ্র খ্রিষ্টসমাজ পৃথিবীকে সমতল হিসেবে ঘোষণা করেছিল। আর এটা তাদের বিশ্বাসের অঙ্গ ছিল।

আবুল হাসান সর্বপ্রথম দূরবীক্ষণ যন্ত্রের (Microscope) উদ্ভাবন করেন, যা কায়রোর মান মন্দিরে ব্যবহৃত হয়েছিল।

টলেমি যেমন গ্রিক সভ্যতায় একচ্ছত্র আধিপত্য বিরাজ করেছিলেন, ঠিক তেমনি আরবদের মধ্যে আল বাতানি টলেমি হিসেবে স্বীকৃত ও বিবেচিত হয়ে আসছেন। আল বাতানি কর্তৃক প্রবর্তিত ও প্রণীত সূত্রগুলো জ্যোতির্বিদ্যার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে এসেছে।

ইবনে ইউনুস নামের একজন বিজ্ঞানী পেণ্ডুলামের আবিষ্কারক। তিনিই সর্বপ্রথম দোলকের সাহায্যে সময়ের পরিমাপ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তার রচিত *জিউল আকবর আল হাকিমি* টলেমির আবিষ্কারকে ভুল প্রমাণিত করেছে।

হাসান ইবনে হায়সান (ইউরোপে আল হাজেম নামে পরিচিত) আবহাওয়া ও আলোকবিজ্ঞানে অত্যন্ত সফল গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনিই সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, আলোকরশ্মি বস্তু (Object) থেকে প্রতিফলিত হয়ে চোখে আসে, চোখ থেকে প্রতিফলিত হয়ে বস্তুতে (Object)-এ পতিত হয় না। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, তিনিই সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন যে, চোখে সৃষ্ট Sensation, Sensory Nerve দিয়ে মস্তিষ্কে বাহিত (Transmit) হয়। আজ হতে হাজার বছর পূর্বে এ আবিষ্কারটি ছিল এক কথায় বিস্ময়কর ও অভাবনীয়! তিনি আরও প্রমাণ করেন যে, আলোর প্রতিসরণ বায়ুমন্ডলের ঘনত্ব ও উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। এই তত্ত্বের ওপরে ভিত্তি করে কীভাবে সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রপুঞ্জ তাদের প্রকৃত উদয়-অস্ত সময়ের পূর্বে/পরে আমাদের দৃষ্টিগোচরে আসে, তা অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর লেখা অবিস্মরণীয় গ্রন্থ *Balance of Wisdom* বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় তথা খ্রিষ্টীয় জগতে বিজ্ঞান চর্চায় একচেটিয়া স্থান দখন করে অবস্থান করছিল। তিনিই সর্বপ্রথম বায়ুমণ্ডলে বস্তুর ওজন যে তার পরিবর্তিত হয়, তার চুলছেঁরা বিশ্লেষণ দেখান। এ তথ্যটি আধুনিক যুগে এরোপ্লেন জেট, রকেট, মহাকাশ অভিযান নিয়ন্ত্রণ, সফলতার সঙ্গে উড্ডয়ন ও অবতরণের দ্বার উন্মোচন করে দেয়। সেইসঙ্গে হাসান ইবনে হায়সামের এ যুগান্তকারী আবিষ্কারকেই Aeronotical Science-এর সূত্রপাত করে দিয়েছে, এ কথা বলা মোটেই বাহুল্য হবে না।

ভাসমান বস্তুর জলমগ্ন হওয়া এবং ভারের মাধ্যমে নিমজ্জিত করলে শক্তি যে ওপরের দিকে ঠেলে দেয়, সে ব্যাপারে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছিলেন, যা বৈজ্ঞানিক নিউটনের একচেটিয়া আবিষ্কার বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। তিনিই সর্বপ্রথম পতনশীল বস্তুর গতিবেগ অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে নির্ণয় করেন। আধুনিক সামরিক বিজ্ঞানে আকাশ হতে বোমা নিক্ষেপ ও নির্ভুলভাবে ভূমি থেকে ভূমিতে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপের জন্য যা এক অতীব জরুরি তত্ত্ব।

উমাইয়া শাসকদের সময়কালে (প্রায় ১২০ বছর) ইসলামি জগৎ এক ধরনের রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও নৈতিক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে অতিবাহিত হয়। ইসলামের ইতিহাসে এটি এক শ্বাসরুদ্ধকর শতাব্দী ছিল। কিন্তু এ যুগেও রাসূল ﷺ-এর আদর্শ ও শিক্ষায় অনুপ্রাণিত, উজ্জীবিত কিছু ব্যক্তি জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চায় বিস্ময়কর নিষ্ঠার পরিচয় দেন।

তাঁদের মধ্যে আবু হাসেম খালিদ ইবনে ইয়াজিদ ছিলেন অন্যতম এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর সবচেয়ে বড়ো অবদান হলো, তিনিই সর্বপ্রথম ল্যাটিন ও কপটিক ভাষা থেকে আলকেমির গ্রন্থাদি রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আরবি ভাষায় অনুবাদ করেন। রাজপরিবারের ক্ষমতার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে বীতশ্রদ্ধ হয়ে এই মর্দে মুমিন রাজ সিংহাসনে নিজ উত্তরাধিকারের দাবি স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে জ্ঞানচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। তিনি আলকেমির ওপর ব্যাপক পড়াশোনা করেন এবং এ বিষয়ের ওপরে গবেষণাকর্ম শুরু করেন।

এ বিষয়ে তিনি কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা। তার মধ্যে *দ্যা বুক অব অ্যামুলেট*, *দ্যা গ্রেট*, *দ্যা বুক অব টেস্টামেন্ট অন দ্যা আর্থ* ইত্যাদি বিখ্যাত; যা ইস্তাম্বুলের পাঠাগারসমূহে দেখতে পাওয়া যায়। তাঁর গবেষণা গ্রন্থ *প্যারাডাইজ অব উইজডম*-এ তিনি আলকেমি বিষয়ক ২৩১৫টি পঙতি রচনা করেন। তিনি আলকেমির ওপর একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন এবং এ ব্যাপারে অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁকে পৃথিবীর ইতিহাসে আজও স্মরণীর করে রেখেছে। আলকেমি বা Chemistry (রসায়নবিদ্যা) বিষয়ে তাঁর গবেষণাকর্ম ইউরোপে মধ্যযুগীয় বিজ্ঞানের রেনেসাঁসকে সমৃদ্ধ করে। তাঁর লেখা পুস্তাকাদি ইংরেজি ছাড়াও ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করা হয়।

মুসলিম শাসকগণও গবেষক ও বিজ্ঞানীদের জ্ঞানচর্চায় উৎসাহ প্রদান ও সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন। তাদের পূর্ণ সহযোগিতা, উৎসাহ, আনুকূল্য ও পৃষ্ঠাপোষকতা দান করেন। ফলে আরব বিজ্ঞানীগণ অতি দ্রুত পৃথিবীর প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার ও গবেষণাকর্মের সঙ্গে পরিচিত হন এবং বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করে ফেলেন। আরব খলিফাগণ গ্রিক ও ল্যাটিন ভাষার প্রাচীন প্রবন্ধ আরবিতে অনুবাদ করানোর ফলে এ সাফল্যটি অর্জিত হয়।

এর ফলে আরব বিজ্ঞানীগণ নিজেদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি নিজ নিজ গবেষণাকর্ম পরিচালনার জন্যও উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। খলিফা হারুন অর রশিদ ও মামুন অর রশিদ বিদেশি ভাষার বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহ রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এবং অর্থানুকূল্যে আরবি ভাষায় অনুবাদ করানোর মাধ্যমে আরব মুসলমানদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ সাধনে বিস্ময়করভাবে সফল হন। খলিফা মানসুর ভারতের জ্যোতির্বিদদের লেখা প্রাচীন গ্রন্থসমূহ আরবিতে অনুবাদ করান। ফলে মুসলমানদের মধ্যে এক শক্তিশালী বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলন গড়ে ওঠে, যা পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞানের রেনেসাঁসের সূত্রপাতে এক বিরাট অবদান রাখে।

আব্বাসীয় খেলাফতকালে খলিফাগণের সরাসরি পৃষ্ঠাপোষকতায় ও তত্ত্বাবধানে রাজধানী বাগদাদে অসংখ্য একাডেমি ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচ্যের তথা মধ্যপ্রাচ্যের বাগদাদ নগরী সমসাময়িককালের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিচর্চার এক অপ্রতিদ্বন্দ্বি কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়। অপরদিকে মুসলিম শাসিত স্পেনের কর্ডোভা ছিল সমগ্র ইউরোপের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রধান চর্চা কেন্দ্র। এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, তার শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রবৃন্দ এবং তাদের গবেষণাকর্ম সমগ্র ইউরোপজুড়েই এক প্রচণ্ড বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের সূত্রপাত করে, অনতিবিলম্বে যা সমগ্র বিশ্বকেই প্রচণ্ড নাড়া দিতে সক্ষম হয়। ইউরোপীয় রেনেসাঁসে রজার বেকন (Rodger Becone)-এর অবদানকে কে অস্বীকার করতে পারে!

এই রজার বেকন কর্ডোভা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি আল কুরআনের শিক্ষা ও মুসলিম মনীষীদের জ্ঞান চর্চায় আগ্রহ-নিষ্ঠা-অধ্যাবসায় ও একাগ্রতা দেখে দারুণভাবে প্রভাবিত ও উজ্জীবিত হন এবং নিজ জাতির বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়ন ও পরিবর্তনের লক্ষ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

অষ্টম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণকারী মুসিলম বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ান আলকেমি রসায়নশাস্ত্রের ওপরে যে জ্ঞানগর্ভ গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেন, তা রীতিমত অবাক করার মতো। ল্যাটিন বিশ্ব ও ইউরোপের বিজ্ঞানীগণ তাঁর এসব গ্রন্থ অনুবাদের মাধ্যমে নিজেদের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। জাবিরের এসব গ্রন্থগুলো শুধু ল্যাটিন ইউরোপেই নয়; বরং সমগ্র বিশ্বেই আলকেমির একমাত্র পাঠ্যপুস্তক হিসেবে বিবেচিত হতো। এসব গ্রন্থের ওপর ভিত্তি করেই ইউরোপীয় খ্রিষ্টসমাজ তাদের গবেষণাকর্ম শুরু করে। সমগ্র বিশ্বে মুসলিম বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ানকে আলকেমির জনক (Father of Chemistry) বলে স্বীকার করা হয়। তাঁর বিশাল ও বিস্ময়কর গবেষণাকর্মের বিবরণ এ স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়। শুধু এতটুকুই বলা সঙ্গত মনে করি যে, এ বিস্ময়কর মেধার অধিকারী বিজ্ঞানী দর্শণ, রসায়ন ও অঙ্কশাস্ত্র ইত্যাদি জটিল বিষয়সমূহের ওপর প্রায় দুইশতাধিক বিশালাকার গবেষণাগ্রন্থ রচনা করেন। এসবের মধ্যে বেশিরভাগই ছিল মৌলিক গবেষণাকর্ম।

বৈজ্ঞানিক ল্যাভয়সিয়ের অষ্টাদশ শতাব্দীতে অক্সিজেন আক্রমণে লোহায় মরিচা ধরে বলে যে তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন বলে দাবি করা হয়, তা আসলে তারও এক হাজার বছর পূর্বেই এই জাবির ইবনে হাইয়ানই সর্বপ্রথম উদ্ভাবন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যোশেফ প্রিস্টলি বায়ুর উপাদান নির্ণয় করেন বলে বলা হয়,

অথচ তারও হাজার বছর পূর্বেই এই জাবির ইবনে হাইয়ান ব্যাপক গবেষণার পর সেসব বায়বীয় উপাদানগুলো সনাক্ত করেন। ইউরোপ সপ্তদশ শতাব্দীতে যে কম্বাশ্চন (Combustion) থিওরির সঙ্গে পরিচয় লাভ করে, তা অষ্টম শতাব্দীতে জাবিরই সর্বপ্রথম উদ্ভাবন ও প্রমাণ করেন।

এই মুসলিম বিজ্ঞানী তাঁর নিজস্ব গবেষণাগার তথা ল্যাবরেটরিতে সালফার ও মার্কারির বিক্রিয়া ঘটিয়ে সর্বপ্রথম সিঁদুর উৎপাদন করেন। তিনিই হলেন বিশ্বের প্রথম সফল পদার্থবিজ্ঞানী, যিনি পদার্থের মৌলিক উপাদানগুলির ওপরে ব্যাপক এক সফল গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেন। বস্তুর গঠন, এর মৌলিক উপাদান, তার স্তর ও বিন্যাস সংক্রান্ত যেসব গবেষণা তিনি পরিচালনা করেন এবং সেসব ফলাফল, তত্ত্ব, তথ্য লিপিবদ্ধ করেন, হাজার বছর পরে এসেও তা সমগ্র বিশ্বের বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীকে বিস্ময়ে হতবাক ও অভিভূত করে দেয়।

রসায়ন শাস্ত্রের 'পিরিয়ডিকল' নামের যে তত্ত্বটি ১৮৭০ সালে রাশিয়ান কেমিস্ট্র মেন্ডেলিয়েভ উদ্ভাবন করেন বলে বিশ্ব জানে, সেই তত্ত্বটি এরও প্রায় হাজার বছর পূর্বেই *Book of Balance* নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন মুসলিম বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ান। তাঁর ওই গ্রন্থ ল্যাটিন ও জার্মান ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

বিজ্ঞানীরা এ গ্রন্থ পড়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় ও হতবাক হয়ে যান বিজ্ঞান গবেষণায় তাঁর দক্ষতা ও সফলতা দেখে। পদার্থবিদ্যা তথা পদার্থবিজ্ঞানে অধুনা বহুল ব্যবহৃত 'কোয়ান্টাম থিওরিটি'ও এ প্রথিতযশা মুসলিম বিজ্ঞানী ইউরোপীয় বিজ্ঞানীদের প্রায় হাজার বছর পূর্বেই নিজ অক্লান্ত পরিশ্রমলব্ধ গবেষণা দ্বারা আবিষ্কার করে দেখিয়েছেন। তিনিই সর্বপ্রথম সাদা সিসা (White Lead) তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম শাক-সবজি লতা-পাতা, পশু-পাখির মল-মূত্র, রক্ত-মাংস, অস্থি-মজ্জা এসব নিয়ে জৈব রসায়ন (Organic Chemistry) বিষয়ে গবেষণা করেন, আজ হতে এগারোশত বছর পূর্বে যা এককথায় অবিশ্বাস্যই ছিলো। তাঁর লেখা বহুল পঠিত *Book of Properties* নামক গ্রন্থটি রসায়ন শাস্ত্রের ওপরে প্রণীত এক দুর্লভ দলিল। ইংরেজ বিজ্ঞানী E.H. Holmyard ১৯২৩ সালে জাবির ইবনে হাইয়ানের লেখা আরও একটি গ্রন্থ আবিষ্কার করেন যার নাম *Eement of Foundation* অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে আলবার্ট আইনস্টাইনকে 'থিওরি অব রিলেটিভিটি' উদ্ভাবক বলে জানি, সেই আলবার্ট আইনস্টইনের আরও প্রায় হাজার বছর পূর্বেই মুসলিম বিজ্ঞানী জাবির ইবনে হাইয়ান তা উদ্ভাবন করেন।[৫২]

জাবিরই সর্বপ্রথম নিখুঁতভাবে লবণ তৈরির সহজ পদ্ধতি সেই অষ্টম শতাব্দীতে বসে উদ্ভাবন করেন, যা আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও বিশ্বের সর্বাধুনিক কারখানাগুলোতে লবণ তৈরির কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনিই সর্বপ্রথম 'অ্যাকোয়রিজিয়া' তথা সোনার সলিউশন তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। তিনিই সর্বপ্রথম বস্তুর পরিশোধন পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। প্রখ্যাত রসায়নবিদ, গবেষক বিজ্ঞানী E.H. Holmyard-এর বক্তব্য দিয়েই তাঁকে মূল্যায়ন করা যাক। তিনি বলেন–

> 'জাবির আধুনিক রসায়নবিদদের অগ্রদূত। তিনি শত অসুবিধার মধ্যেও নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলকেমির সত্য প্রতিষ্ঠা করে বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়েছেন। তিনি যদি বিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করতেন, তাহলে অ্যামিল ফিসার ও স্যার উইলিয়াম পারকিনাসের আবিষ্কারকেও বিস্মিত করতেন।'[৫৩]

বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞান জগতকে প্রচণ্ডভাবে আন্দোলিত ও প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে অপর একজন বৈজ্ঞানিকের গবেষণাকর্ম বিরাট কৃতিত্বের দাবিদার, যাঁর নিকট খ্রিষ্টানজগৎ তথা সমগ্র বিশ্বের বিজ্ঞানজগৎ আজীবন ঋণী থাকবে।

তার নাম হলো আল রাজি (৮২৫-৯২৫)। তিনি চিকিৎসা বিষয়ক যে বিশ্বকোষ রচনা করেন, তা কয়েকশত বছর ধরে নেদারল্যান্ডের বিশ্বদ্যিালয়গুলোতে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে চালু ছিল। তিনিই সর্বপ্রথম বসন্ত ও জলবসন্তের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন। তিনি একাধারে মেডিসিন, সার্জারি, গাইনি-অবস্ট্রাটিকসে সফল ও কার্যকর গবেষণা পরিচালনা করেন। তাঁরই পরামর্শে বাগদাদের টাইগ্রিসের অনেক পুরোনো হাসপাতালটিকে আধুনিকায়ন এবং বর্ধিত করা হয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দুই হাজার শয্যাবিশিষ্ঠ সেই হাসপাতালটি আজও টিকে আছে অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে। তিনি চিকিৎসাবিজ্ঞানের ওপরে প্রায় দুইশত গ্রন্থ রচনা করেন। তিনিই সর্বপ্রথম মানুষের দেহে স্বরতন্ত্রের তন্তু (Tissue) আবিষ্কার করেন। তার রচিত অধিকাংশ বই ইউরোপীয় ভাষাসমূহে অনূদিত হয় এবং তা সমগ্র ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে রেফারেন্সবুক হিসেবে গবেষণাকার্যে ব্যবহৃত হতো। তাঁর অনবদ্য ও বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ *The Secret of Secrets* সারাবিশ্ব জুড়ে ল্যাবরেটরি ম্যানুয়েল হিসেবে রসায়নবিদদের নিকট দারুণভাবে সমাদৃত। ভেষজবিজ্ঞানের (Organic Science) প্রকৃত জনক হলেন আল রাজি। বিশ্বে তিনিই হলেন ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি (Pharmaceutical Chemistry)-এর পৃথিকৃত। তিনিই এ বিভাগটির গোড়াপত্তন করেন।

আল-রাজির সূত্র ধরে অপর মুসলিম বিজ্ঞানী পারস্যের চিকিৎসক আবুল মনসুর সর্বপ্রথম অর্থোপেডিক্স (Orthopedic)-এ ব্যবহৃত প্লাস্টার উদ্ভাবন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম জিইসামের সঙ্গে ডিম মিশিয়ে প্লাস্টার তৈরি করেন এবং তা দিয়ে সফলতার সঙ্গে ভাঙা অস্থির (Fractured Bone) চিকিৎসা করেন। এ ছাড়াও আল রাজি কর্তৃক উদ্ভাবিত পদ্ধতির সফল প্রয়োগ করে আবুল মনসুর সর্বপ্রথম সাদা চুল কালো করার ডায়িং তৈরি করেন।

গ্যালন-এর শরীরবিদ্যা (Anatomy) বিষয়ক তত্ত্ব তথ্য ও সূত্রাদী বহু বছর ধরে প্রশ্নাতীতভাবে সত্য বলে বিবেচিত হয়ে আসছিল। কিন্তু আল রাজি নবম শতাব্দীতে এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে অপর মুসিলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানী আবদুল লতিফ আল বাগদাদি এসে তাঁদের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা গ্যালন-এর সেসব তথ্যসমূহের মধ্য হতে অধিকাংশ তথ্যকে ভুল প্রমাণিত করে সংশোধন করেন। গ্যালনের উদ্ভাবিত যকৃত, হৃদপিণ্ড ও ফুসফুস (Liver, Heart, Lungs) সংক্রান্ত তথ্যসমূহকে ভুল প্রমাণিত করে সংশোধন করেন যিনি, তিনি হলেন একজন মুসিলম বিজ্ঞানী; ইবনে নাফিস।

২০০ খ্রিষ্টাব্দে গ্রিক চিকিৎসক গ্যালন ৭০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি Anatomy Physiology নিয়ে, বিশেষ করে, হৃদযন্ত্রের কর্মপদ্ধতি নিয়ে প্রথম গবেষণা শুরু করেন। কিন্তু তাঁর আকস্মিক মৃত্যু এ গবেষণাকর্মকে পূর্ণতা দান করতে দেয়নি। এর পরে ছয় শতাধিক বছর ধরে চিকিৎসাবিজ্ঞানের এ শাখায় আর কোনো কার্যকর গবেষণা পরিচালিত হয়নি। বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার এ ক্ষেত্রে বিরাজমান শূন্যতা দূর করতে দলে দলে এগিয়ে আসেন মুসলিম বিজ্ঞানীরা।

মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে আরও একজন বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব ইবনে সিনা। যাকে সমগ্র পশ্চিমা জগতে আজও 'আভিসিনা' বলে ডাকা হয়। তিনি সাহিত্য, গণিত, বীজগণিত, দর্শণ, জ্যোতির্বিদ্যা, ধর্মশাস্ত্রসহ চিকিৎসাবিজ্ঞান ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেন। তাঁর নিজস্ব প্রতিভাবলে অচিরেই তিনি এসব বিষয়ে দক্ষতা অর্জণ করেন এবং স্বনামধন্য গবেষকের ভূমিকায় আবির্ভূত হন। বিশেষ করে, চিকিৎসাশাস্ত্রে তিনি অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে সফলতা লাভ করেন। দেশে বিদেশে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি রাজকীয় চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ পান। মাত্র ২১ বছর বয়সে তিনি এমন একটি বিশ্বকোষ রচনা করেন, যাতে একমাত্র গণিতশাস্ত্র ছাড়া বিজ্ঞানের অন্য সকল শাখার বিশদ আলোচনা, বিশ্লেষণধর্মী সূত্র ও তথ্যসমূহ উপস্থাপন করা হয়। বিশ্বের ইতিহাসে একই ব্যক্তি কর্তৃক বহুবিধ বিষয়ে বিশ্বকোষ রচনার দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়টি আর নেই। ইবনে সিনা এ ক্ষেত্রে একক ও অদ্বিতীয় কৃতিত্বের অধিকারী!

এ বিশ্বকোষ প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সারাবিশ্বে ইবনে সিনার সুনাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বিশ্ব ইতিহাসে ইবনে সিনা-ই প্রথম বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রকাশ করে বলেন যে, আলো সুনির্দিষ্ট গতিতে ভ্রমণ করে। আজ থেকে হাজার বছর আগের সেই বিশ্বে বাস করে এ অকাট্য নির্ভুল সূত্রটি (যা আজকের বিশ্বে প্রমাণিত একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য) বলতে পারা ছিল রীতিমতো অবিশ্বাস্য এক ঘটনা!

রসায়নশাস্ত্রে ইবনে সিনার আবিষ্কৃত ও বিশ্লেষিত 'টিনের ক্রন্দন' তত্ত্বটি হাজার বছর পরে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে আজকের রসায়নবিদ ও পদার্থ বিজ্ঞানীরা সত্য বলে জেনেছেন। কিন্তু আজ থেকে হাজার বছর পূর্বে সেই প্রযুক্তিহীন যুগে ইবনে সিনা কীভাবে এ তত্ত্বটি আবিষ্কার করলেন? তা বিজ্ঞানীদের জন্য এক মহা বিস্ময়ের বিষয়।

ইবনে সিনা রচিত প্রায় সকল গ্রন্থই ইউরোপের ভাষাসমূহে অনূদিত হয়ে শত শত বছর ধরে তাদের চিন্তাশীল ব্যক্তি ও জ্ঞানী-গুণীদের জ্ঞানের দুয়ার খুলে দিতে সাহায্য করেছে। ল্যাটিন ভাষার *দ্যা মিনারিলিবা* নামক বইটি, যা এতদিন অ্যারিস্টটলের ভাষ্য বলে বিবেচতি হয়ে আসছিল, অতিসম্প্রতি ১৯২৭ সালে দুজন ইংরেজ বিজ্ঞানী প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে, আসলে উক্ত গ্রন্থখানি ইবনে সিনার বুক অব *দ্যা রেমেডি* থেকে সরাসরি ভাষান্তরিত।[৫৪]

তাঁর রচিত বিশ্ব বিখ্যাতে গ্রন্থ *কানুন* আজও গবেষকদের কাছে গবেষণার বিষয়বস্তু হয়ে আছে, তাঁর অন্তর্ধানের হাজার বছর পরেও। এখনও তা বিশ্ববাসীকে বিস্ময়াবিভূত করে রেখেছে।

ইবনে সিনার মেধা, সফল গবেষণাকর্ম ও অবদানের জন্য চিকিৎসাশাস্ত্রে তাঁকে এক বিশেষ উপাধি 'Prince of Physician'-এ আখ্যায়িত করা হয়। বিশ্বে তিনিই প্রথম চিকিৎসক, যিনি মনোদৈহিক রোগ তথা Psychosomatic Illness-কে সনাক্ত করেন এবং তার সফল চিকিৎসা করেন। তাঁর জীবনীগ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে অত্যন্ত চকমপ্রদ ও কৌতূহলোদ্দিপক ঘটনাসমূহের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনিই সর্বপ্রথম Tetanus, Pleuritis, Anthrax, Diabetis Mallitus, Trigeminal Nurolgia, এসব রোগ সনাক্ত ও বিশ্লেষণ করেন এবং সেসবের চিকিৎসাও বাতলে দেন। তিনিই সর্বপ্রথম চোখের একটি বিশেষ মাংসপেশী Sixth Motor Muscle of the Eye সনাক্ত করেন।

তার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে *As-shifa, An-najat, Al-Hidaye, Kitabun Nafs,, Al-Ishara, Al-Tarbihat, Hikmat Ul Alai, Qanun fit-Tibb* সর্বাধিক সমাদ্রিত।

এগুলো পশ্চিমা বিশ্বের প্রায় সবকটি প্রধান ভাষায় অনূদিত হয়ে ব্যাপকভাবে পঠিত হয়েছে। মধ্যযুগে বিশ্বের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইবনে সিনার চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক বইগুলোই ছিল প্রধান পাঠ্য বিষয়। এমনকী উনবিংশ শতাব্দীতেও ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তার বই পড়ানো হতো।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের অন্যতম একটি শাখা হলো শল্য বিভাগ; Surgery। এই বিভাগেও মুসলিম চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীরা বিস্ময়কর অবদান রেখেছেন। আবুল কাশেম ইবনে আব্বাস আল জারউই (Abul Qasem Ibn Abbas Al Jahrawi) ছিলেন বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম চিকিৎসক, যিনি সফলভাবে Piles Operation করেন। তিনি Brain Operation করেন। তিনি ছিলেন বিশ্বের প্রথম Neuro Surgeon। তিনিই সর্বপ্রথম Eye Operation-এর পদ্ধতি বাতলে দেন। মজার ব্যাপার হলো, তিনি সেই যুগেই সর্বপ্রথম ব্যাখ্যা করেন, কীভাবে Heart Failure হয়। অথচ সে যুগে EchoCardiogram-সহ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় অন্যান্য যন্ত্রপাতির কোনো প্রচলনই ছিল না। তিনিই সর্বপ্রথম Kidney Operatin/Renal Surgery-এর ব্যাপারে সম্ভবানা ও পদ্ধতির কথা সবিস্তারে আলোচনা করেন। এ সংক্রান্ত তার লেখা তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থ *Al-Tasrif* ১৪৯৭ সালে Basle এবং ১৯৭৮ সালে Oxforde-এ প্রকাশিত হয়। এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী পুস্তকখানা এখন পর্যন্ত ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। তাঁর আরও একটি অবদান হলো, তিনিই সর্বপ্রথম হাড় কীভাবে জোড়া লাগে, সে বিষয়টি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন।

আর এ কথা তো সকলেরই জানা যে, চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য সর্বপ্রথম আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ Medical College প্রতিষ্ঠা করেন একজন মুসলমান। তিনি হলেন আন্দালুসিয়ার খলিফা আবদুর রহমান। এদেরই সার্বিক প্রচেষ্টায় বিশ্ব পেয়েছে এক আধুনিক ও উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থা। এ বিষয়ে ফ্রান্সের বিখ্যাত মনীষী পণ্ডিত Astrue Jean-এর মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন–

> 'Surely, Montpellier had taught the Arab Medicine for a long time, it was not in a position to teach other Medicne. This fondness to the Arab Medicine was commom to all the Univerties.' [৫৫]

> অর্থাৎ 'Montpellier দীর্ঘদিন ধরে আরব চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দিয়ে আসছিল। তার পক্ষে (ফ্রান্সের প্রাচীন Montpellier বিশ্ববিদ্যালয়) অন্য কোনো চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া সম্ভব ছিল না। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও আরবীয় চিকিৎসাবিজ্ঞান (অর্থাৎ ইসলামি চিকিৎসা শাস্ত্র)-এর প্রতি এ ধরনের আসক্তি ছিল অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।'

১২২০ খ্রিষ্টাব্দে Cardinal Conrad উক্ত Montpellier মেডিকেল কলেজটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার পাঠ্যসূচিতে সর্বমোট ১৬টি পুস্তককে অন্তর্ভূক্ত করেন। মজার ব্যাপার হলো, এই ১৬টি পুস্তকের মধ্যে ১৩টিই হলো মুসলিম চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের রচিত গ্রন্থ।[৫৬]

মুসলমানদের চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণাজ্ঞান, হাসপাতালব্যবস্থা, উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত ওষুধ এবং তাদের দ্বারা স্থাপিত স্কুল দ্বারা এসব Paris, Salernitan, Montpellier School of Medicine পরিচালিত হতো। ওইসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ অবদান স্বরূপ মধ্যযুগে সমগ্র ইউরোপে প্রায় আশিটি বিশবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। যার মধ্যে ১৯টিই ছিল ফ্রান্সে। এসব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রতি বছরই নতুন নতুন ডাক্তার, ফার্মাসিস্ট ও বিজ্ঞানী তৈরি হতো, যারা ছড়িয়ে পড়ত সমগ্র ইউরোপ। এদের মধ্যে ছিলেন; Rodger Becon, GUz de Chauliac, Thomas Alquin, Henri Gerberto, Pope Silverster-এর মতো চিন্তাবিদ। এদেরই প্রচেষ্টায় সমগ্র ইউরোপব্যাপী শুরু হয়েছিল ইউরোপীয় রেনেসাঁস। এ রেনেসাঁস ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের অবদানের প্রত্যক্ষ ফল। ইউরোপের প্রায় প্রতিটি জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিই এ কথা স্বীকার করেন। তাঁদেরই একজন ফরাসি লেখক Leban-এর কথায় এর পরোক্ষ স্বীকৃতি পাওয়া যায়। তিনি বলেন–

> 'In the tenth Century Andalusia, it was because of Muslims that knowledge was given importance; in those days there was no place other than Undlus (Andalus) where people went to seek knowledge.'
>
> অর্থাৎ 'দশম শতাব্দীতে মুসলমানদের কারণেই জ্ঞানের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেকালে আন্দালুসিয়া ছাড়া অন্য কোনো জায়গা এমন ছিল না যেখানে মানুষ জ্ঞানার্জনের জন্যে যেতে পারত।'

৭১০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৭৫১ খ্রিষ্টাব্দের মাঝে সমগ্র স্পেন মুসলমানদের আওতাধীন হয়। স্পেন বিজয় শুধু মুসলমানদের জন্য নয়; বরং সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসের জন্য ছিল এক যুগান্তকারী ঘটনা, এক নবদিগন্তের সূচনালগ্ন, বিশাল এক টার্নিং পয়েন্ট। মুসলমানরা স্পেনের শাসনক্ষমতায় আসার পর সামন্তবাদীদের বন্দিদশা থেকে মুক্ত হয়ে স্পেনবাসী সর্বাধিক স্বাধীনতা ও নিরাপত্তাসহ বসবাস শুরু করে। স্থানীয় খ্রিষ্টান ও ইহুদিরা মুসলিম শাসনব্যবস্থার আওতায় পূর্ণ স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার সঙ্গে নিজ নিজ ধর্ম অনুসরণ করে যেতে লাগল। সারা দেশে নৈরাজ্যের পরিবর্তে শান্তি, স্থিতিশীলতা আর সমৃদ্ধির পরিবেশ ফিরে এলো।

বিজয়ী মুসলিম জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি তাদের স্বাভাবিক অনুসন্ধিৎসা এখানেও চালিয়ে গেল। ফলে অন্ধকারে নিমজ্জিত স্পেনের বিভিন্ন শহরে গড়ে উঠতে লাগল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্র।

স্পেনের মুসলমনারা যে শুধু জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই বিপ্লব সাধন করেছিল, তা নয়; বরং তারা সেখানে কৃষি শিল্পেও এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন বয়ে আনে। মুসলমানরা সেখানে সেচ ব্যবস্থার প্রচলন করে। স্পেন খাদ্য-শষ্য উৎপাদনে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। খুব স্বল্প সময়ের মধ্যেই স্পেন ইউরোপের শস্যভান্ডারে পরিণত হয়। স্পেনের মুসলমানরাই সর্বপ্রথম বিমা ব্যবস্থা চালু করে। আজ সারা বিশ্বে বিমা ব্যবস্থা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের এক অবিচ্ছেদ্য কার্যক্রমে পরিণত হয়েছে। অবশ্য পুঁজিবাদী বিশ্ব সেই বিমা ব্যবস্থাকে বর্তমানে সুদের অভিশাপে শোষণের মাধ্যম বানিয়ে ফেলেছে।

স্পেনের মুসলমানরা স্থানীয় উপকরণকে কাজে লাগিয়ে শিল্প ক্ষেত্রেও এক বিপ্লব ঘটিয়ে ফেলেন। তারা সেখানে খনিজ দ্রব্য আহরণে সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন। মুসলমানরা এ সময়ে সোনা, রূপা, তামা, টিন, সিনারার এবং মার্কারি তৈরি করেন এবং শিল্পকে সমৃদ্ধি ও অগ্রগতির কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়। স্পেনের বিলাস দ্রব্যসামগ্রী সমগ্র ইউরোপের কোনায় কোনায় এতই জনপ্রিয় ছিল যে, এগুলো পাওয়ার জন্য ইউরোপের অনান্য দেশের ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিরাও লালায়িত ছিল।

স্পেনের তৈরি রেশমি ও পশমি বস্ত্র লিনেন সারা ইউরোপে বিখ্যাত ছিল এবং সমগ্র ইউরোপের রাজরাজড়াদের কাছে তা আরাধনার বস্তু ছিল। মধ্য এশিয়ায় অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ আরব মুসলমানরা স্পেনের মাটিতে এসে সোনা-রূপার অলংকার তৈরিতে যে জমকপ্রদ সাফল্যের পরিচয় দান করেন, তা ছিল এক কথায় অবিশ্বাস্য। ইউরোপবাসী এই প্রথমবারের মতো ধাতব শিল্পে এ রকম অদ্ভুত কারুকার্যের দেখা পায়। এর পূর্বে ইউরোপ এ ব্যাপারে পুরোপুরি অন্ধকারে ছিল।

এই একই সময়ে মুসলমানরা স্থাপত্যশিল্পেও বিস্ময়কর অবদান রাখে। সেভিলের আল-হামরা মসিজদে ব্যবহৃত কারুকার্য এতই উন্নতমানের ছিল যে, আজও দেশি-বিদেশি পর্যটকরা অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে তা অবলোকন করে থাকে। স্প্যানিশ আরব মুসলমানরাই সর্বপ্রথম নবম শতাব্দীতে ক্রিস্টাল গ্লাস (Crystal Glass) আবিষ্কার করেন। দুহাজার বছর পূর্বে চীন কাগজ আবিষ্কার করে। আরব মুসলমানগণ চীনাদের নিকট হতে কাগজ তৈরির কৌশল ও প্রযুক্তি আয়ত্ত করেন

এবং তা স্পেনের মাধ্যমে ইউরোপে নিয়ে আসেন। ৮০০ খ্রিষ্টাব্দে খলিফা হারুন অর রশিদ সর্বপ্রথম বাগদাদে কাগজ তৈরির কল বসান। দ্বাদশ শতাব্দীতে স্পেনে সর্বপ্রথম কাগজকল স্থাপিত হয় মুসলমানদের দ্বারা। একজন ফরাসি পর্যটক তার সামান্য কিছু নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যান। ইউরোপে তখন কাগজ ছিল দুর্লভ বস্তু। এরও প্রায় চারশত বছর পর ষষ্ঠদশ শতাব্দীর প্রায় শেষ ভাগে এসে প্রথমে জার্মানি ও পরে ইংল্যান্ডে বাণিজ্যিকভাবে কাগজ উৎপাদন শুরু হয়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প, গবেষণা ও কৃষ্টিসহ সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিস্ময়কর ঈর্ষণীয় সফলতা দেখে ইউরোপের খ্রিষ্টান যুবকেরা গ্রিক ভাষা শেখা বন্ধ করে দিয়ে আরবি ভাষা শেখা শুরু করে দেয়। ইসলামি সভ্যতার আওতায় স্পেনের টলেডো শহরের খ্যাতি সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে শিক্ষা-দীক্ষার প্রধান কেন্দ্ররূপে। দশম শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে সমগ্র ইউরোপ হতে দলে দলে খ্রিষ্টান শিক্ষার্থীরা স্পেনের এই টলেডোতে এসে ভিড় করতে থাকে। তারা আরব মুসলমান ও স্থানীয় স্প্যানিশ মুসলমানদের সঙ্গে নিজেদেরকে মিলিয়ে মিলিয়ে দেখত আর নিজেদের পশ্চাপদতা বড়ো যাতনার সঙ্গে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করত।

মুসলমানদের জ্ঞানের উৎস আল কুরআন তাদের সকল মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। ১১৪১ খ্রিষ্টাব্দে দুইজন ইংরেজ; রবার্ট ও দালমাতিয়ান সর্বপ্রথম ল্যাটিন ভাষায় আল কুরআন অনুবাদ করেন। এ কাজে তারা প্রায় দু বছর ধরে পরিশ্রম করেন। শুধু তাই নয়, টলেডো, গ্রানাডা ও কর্ডোভায় অধ্যায়নরত ইউরোপীয় খ্রিষ্টান শিক্ষার্থীরা ভাষা, সাহিত্য, দর্শন, স্বাস্থ্য ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে লেখা মুসলিম মনীষীদের বই নিজেদের ভাষায় অনুবাদ করে যেতে থাকে। যা তাদের সমাজকে এক বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণের দিকে দ্রুত ঠেলে দিতে থাকে। দশম শতাব্দী হতে শুরু করে চুতর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় চারশত বছর ধরে নীরবে গোপনে এ ধারা চালু থাকে। আর পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এসে পুরো ইউরোপে, বিশেষ করে ফ্রান্সে শরু হয় রেনেসাঁস। যা অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ইউরোপের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়ে।

শুরু হয় বুদ্ধিবৃত্তিক আন্দোলনের গণজোয়ার। এর অনিবার্য পরিণতিতে সমগ্র ইউরোপব্যাপীই সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন সূচিত হতে থাকে। (অবশ্য এ ক্ষেত্রে ১০৯৫ খ্রিষ্টাব্দে শুরু হওয়া এবং ১২২৯ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত একের পর এক পরিচালিত ক্রুসেড যুদ্ধের তাৎক্ষণিক ও সুদূরপ্রসারী ফলাফলও বিরাট ভূমিকা পালন করেছে।) তাই এ কথা খুব সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, ইসলাম ও তার অনুসারীরা তাদের শিক্ষা ও আচরণ দ্বারা বিশ্বকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেছে।

সে প্রভাবের বলয় হতে বিশ্ব কখনোই বেরিয়ে আসতে পারবে না। বিশ্ব আজ পরিপূর্ণভাবেই বিজ্ঞানের কাছে বাঁধা। আর বিজ্ঞানের এই বিকাশ মুসলমানদেরই অবদান। এর স্বীকারোক্তি পশ্চিমা মনীষীদের বক্তব্যেই পাওয়া যায়। তার প্রমাণ হিসেবে দেখুন–

> 'আমরা যাকে বিজ্ঞান বলে আখ্যায়িত করে থাকি, তা জিজ্ঞাসু মন, নতুন অনুসন্ধান পদ্ধতি, পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ পদ্ধতি এবং গণিত শাস্ত্রের অগ্রগতির ফলেই ইউরোপে বিকাশ লাভ করে। সেই মন এবং পদ্ধতি ইউরোপকে সরবরাহ করেছিল আরবগণ।' [৫৭]

আমাদের হিমালয়ান উপমহাদেশে সমাজ ও অধিবাসীদের জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে ইসলাম এক বিরাট ও সুগভীর প্রভাব ফেলে। ভারতীয় সমাজ যখন প্রচণ্ড জাতিভেদ ও কৌলিণ্য প্রথায় জর্জরিত, মানুষের মৌলিক মানবাধিকার যখন ধুলণ্ঠিত এবং মানবতা চরমভাবে উপেক্ষিত, তখনই এ অঞ্চলে ইসলামের শুভ পদার্পণ ঘটে। অমাবস্যার নিকষ কালো আঁধার রাতে দূরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আলোকরশ্মী যেমন সকলের কৌতূহলী দৃষ্টি ও মনোযোগ আকৃষ্ট করে, তেমনি ইসলামের সঠিক শিক্ষায় উজ্জীবিত আরব মুসলিম ব্যবসায়ীগণ যখন এ অঞ্চলে পদার্পণ করেন, তখন অজ্ঞানতার জমাট আঁধারে বসবাসরত ভারতবাসী তাদের উন্নত নৈতিক জীবনাচার ও আদর্শ দেখে খুব সহজেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে।

ভারতবাসী এসব পরিব্রাজক ও ব্যবসায়ী আরবদের যে এই প্রথমবার দেখছে তা নয়; বরং এরও বহু পূর্ব হতে মধ্যপ্রাচ্যের এসব বণিকদের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ এবং সখ্যতাও ছিল। তাদের (আরবদের) জীবনাচার, চাল-চলন, লেন-দেন ও ব্যবহারের সঙ্গে পূর্ব থেকেই পরিচিত ছিলো। কিন্তু হঠাৎ করে পরিচিত এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে এমন এক উন্নত জীবনাচার ও চারিত্রিক মাধুর্য উদ্ভাসিত হতে দেখল যে, তারা (ভারতবাসী) বিস্মিত না হয়ে পারল না।

ভারতবাসীর যারাই আরবদের এই পরিবর্তন উপলব্ধি করল, তাদেরই সমস্ত কৌতূহল গিয়ে পড়ল সেই বিষয়ের প্রতি, যার পরশে পূর্বপরিচিত এই মানুষগুলোর কথা-বার্তা, চলা-ফেরা ও আচার -আচরণে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ভারতীয় সমাজের অনেক জ্ঞানী-গুনীজন এ ব্যপারে স্বীকারোক্তি করেছেন। উদাহরণ হিসেবে আমরা প্রখ্যাত ভারতীয় ঐতিহাসিক ও লেখক শ্রী গোপাল হালদারের উদ্ধৃতি দিতে পারি, তিনি তার লেখায় মন্তব্য করেছেন–

'ইসলামের বলিষ্ঠ ও সরল একশ্বরবাদ এবং জাতি ভেদহীন সাম্য দৃষ্টির কাছে ভারতীয় জীবনধারা ও সংস্কৃতির পরাজয় ঘটল। এ পরাজয় রাষ্ট্রশক্তির কাছে নয়, ইসলামের উদারনীতি ও আত্মসচেতনতার কাছে। তাই যথেষ্ট ঘৃণা ও অবজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও ইসলামের প্রভাব ও সংমিশ্রণ এড়িয়ে যেতে পারল না।'

ফলে দলে দলে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও বঞ্চিত মানুষ এই নতুন জীবনাদর্শ গ্রহণ করে নতুন ধর্মের অনুসারী হয়ে ধন্য হতে লাগল। প্রতিদিনই তাদের সংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকল। এতে বর্ণবাদী হিন্দুরা প্রমাদ গোনা শুরু করল। তারা নিজেদের ধর্মকে দ্রুত ক্ষয়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠল। তখন তাদের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এ উদ্দেশ্যে অনেক পথ, পদ্ধতি বাতলে দিতে থাকলেন, নতুন নতুন পদক্ষেপের সুপারিশ করতে থাকলেন। এ ধারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলতে থাকল। উদাহারণস্বরূপ আমরা এখানে ড. তেজ বাহাদুর সাপ্রুর পরামর্শের কথা উল্লেখ করতে পারি, তিনি হিন্দুদের পরামর্শ দিয়ে বলেছিলেন–

'হিন্দুদিগকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায়; ইসলাম ধর্মের কতিপয় মূলনীতি-আল্লাহর একত্ববাদ ও মানবের বিশ্বজনীনত্ব।'[৫৮]

এরই ধারাবাহিকতায় এক পর্যায়ে নবদ্বীপের শ্রী চৈতন্যদেব কর্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার শুরু হয় এবং এর মধ্য দিয়ে হিন্দুদের মধ্যে ধর্মীয় জাগরণ সৃষ্টি প্রচেষ্টার উদ্ভব ঘটে। শ্রী চৈতন্যের এ ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল সংখ্যাগরিষ্ট হিন্দুরা যেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। কারণ, ততক্ষণে ইসলামের একেশ্বরবাদে মুগ্ধ হয়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং আরও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তি এ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠেছে। এ অবস্থা দর্শনে শ্রী চৈতন্য স্বধর্ম রক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং মুসলামানদের আল্লাহ প্রেমের ন্যায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর সম্মুখে বিষ্ণুর প্রতি প্রেমের আবেগী এক জোয়ারের উদ্ভব ঘটান। তার এ প্রচেষ্টা ছিল ভারতে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে রোধ করার জন্য। তবে এ কথা সন্দেহাতীতভাবে সত্য যে, এই বিষ্ণুকেন্দ্রিক প্রেম ও ভক্তির প্রচলন ইসলামের একেশ্বরবাদ দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এ ছাড়াও তৎকালীন হিন্দু ব্রাহ্মণসমাজের মধ্যে 'পিরালী ব্রাহ্মণ', 'শ্রীমন্তখানী ব্রাহ্মণ' 'শেরখানি ব্রাহ্মণ' ইত্যাদি নামীয় গোত্রের উৎপত্তি হয়েছিল এবং সেগুলোও ছিল ইসলামের একত্ববাদ দ্বারা প্রভাবিত।

হিন্দু সমাজে মানুষ সীমাহীন ভেদাভেদ ও উঁচু-নিচু শ্রেণিতে বিভক্ত হওয়ার কারণে মুসলিম সমাজের সামাজিক সৌহার্দ্য, পারস্পরিক সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব দেখে তাদের বৃহৎ একটা অংশ বিমোহিত হয়ে পড়ে। এদেরই একজন হলেন প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস। তিনি লেখেন যে–

> 'সপ্ত মুসলমান একই পাত্র থেকে এবং একত্রে বসে তাদের খাদ্য গ্রহণ করে।'

তার এ প্রশংসাবাণীর আড়ালে লুকিয়ে আছে তার নিজ জাতির মধ্যে গোত্রে গোত্রে, মানুষে মানুষে বিভাজনগত সৃষ্ট ক্ষোভ। নিজ হিন্দু সমাজে মানুষে মানুষে বিভাজন লক্ষ্য করে তিনি অন্য যায়গায় লেখেন–

> 'চণ্ডীদাস কহে শোনো হে মানুষ ভাই, সবার ওপরে মানুষ সত্য, তাহার ওপরে নাই।'

ইসলামের শিক্ষা ও দর্শন দ্বারা হিন্দু সমাজ ও ধর্ম যে ভীষণভাবে প্রভাবিত হতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে তার নিকট আত্মসমর্পণ করতে থাকে। তার স্বীকৃতি পাওয়া যায় উপমহাদেশের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রী দিনেশ চন্দ্র সেন-এর লেখায়। তিনি এ বিষয়ে লেখেন–

> 'There is much evidence to prove that the erlier days of Mohamedan conquest the Hindus tried to assimilate the best elements of Islam in their religion.'
>
> অর্থাৎ- 'এ রকম বহু নির্দশন রয়েছে যা দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে, মুসলমানদের অগ্রাভিযানের প্রথম দিকে হিন্দুরা ইসলাম ধর্মের শ্রেষ্ঠ আচার-আচরণসমূহকে নিজেদের মধ্যে আত্মীকরণের প্রচেষ্টা চালায়।'

এ কথার প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রী চৈতন্যের ইসলামি চেতনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তনের মাঝে। অন্ধ অহমিকা, গোষ্ঠী ও ব্যক্তিস্বার্থ এবং জাতিপূজায় নিমজ্জিত ব্রাহ্মণগণ নিজেদের ধর্ম ত্যাগ করলেন না, আবার ইসলামের সর্বজনীন প্রভাবকেও ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না। ফলে আপনাআপনি ইসলামের কিছু শিক্ষা ও সামাজিক প্রথা হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিকৃত উপায়ে অনুপ্রবেশ করল। যারা নিজেদের বিচার ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সত্যকে স্বীকার করে নেওয়ার মতো সাহস দেখাতে পেরেছিলেন, তারা এই নতুন ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হলেন। এ কথার সমর্থনে হিন্দু সমাজেরই একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ও S.C Roy Chowdhury-এর মতামত তুলে ধরতে পারি। তিনি লিখেছেন–

'Islam influenced the Hindu society in two ways, firstly the missionary zeal of Islam which aimed at conversion of maximum number of Hindus to Islam gave rise to Conservatism, 2ndly some of the democratic priciples of Islam found their own way into Hindu society, the, the Vakti movement was to large extent influenced by Islam and Hindu reformers preached fundamental equality of all religion and unity of God.'

অর্থাৎ 'ইসলাম দুইভাবে হিন্দু সমাজকে প্রভাবিত করেছে। প্রথমত, সর্বাধিত সংখ্যক হিন্দুকে ইসলামে দীক্ষিত করার লক্ষ্যে পরিচালিত ইসলাম প্রচারে উৎসাহ ও নিষ্ঠা হিন্দু ধর্মে রক্ষণশীলতার জন্ম দেয়। আর দ্বিতীয়ত, ইসলামের কিছু গণতান্ত্রিক রীতি-নীতি হিন্দু সমাজে ঠাঁই করে নেয়। ভক্তি আন্দোলন অনেকটাই ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং হিন্দু সংস্কারবাদীগণ সকল ধর্মের সহাবস্থান, সম্প্রীতি ও ঈশ্বরের একেশ্বরবাদের ধারাণা প্রচার করেন।'

বুদ্ধিবৃত্তিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে ইসলামি দর্শন, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আদর্শ দ্বারা হিন্দু ধর্ম ও সমাজ দারুণভাবে প্রভাবিত হয়। বলা চলে, এ ক্ষেত্রে এক বিপ্লবাত্মক (Revolutionary) পরিবর্তন সংঘটিত হতে শুরু করে। শিক্ষার অধিকারকে বিবেচনা করা হতো সমাজের একটা বিশেষ শ্রেণির (ব্রাহ্মণ) একচেটিয়া অধিকার বলে। যুগ যুগ ধরে এই ধারণা সকলের মনে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এর ফলে সমগ্র ভারতে হিন্দুদের একটি বিশেষ গোষ্ঠী ও তাদের অনুগৃহীত গুটিকতক ব্যক্তি ছাড়া আপামর জনসাধারণ শিক্ষার কোনোরূপ সুযোগই পেত না। পাঠশালায় নিচু শ্রেণির হিন্দু ও তাদের সন্তানদের কোনোরূপ প্রবেশাধিকার ছিল না। কঠোর জাতিভেদভিত্তিক চিন্তা চেতনার কারণে পণ্ডিতগণ জাত যাওয়ার ভয়ে এবং সমাজে একঘরে হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় পাশে বসিয়ে পাঠদান করা তো দূরের কথা নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ছায়া পর্যন্ত মাড়াত না।

মুসলিম শাসনামলে বিদ্যার্জনের প্রতি মুসলমানদের গভীর আগ্রহ, নিষ্ঠা ও অনুরাগ, ইসলাম প্রচারকদের আন্তরিক উৎসাহ, শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে কবি, পণ্ডিত ও বিদ্যান ব্যক্তিদের উৎসাহ এবং সমাজে তাদের কদর ও মর্যাদা; শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রতি সরকার, প্রশাসন ও সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতির কারণে ভারতীয় উপমহাদেশে এক যুগান্তকারী পরিবেশের সৃষ্টি হয়।

মুসলমানরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে, আনাচে-কানাচে অনেক বিখ্যাত বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। এ ছাড়াও প্রতিটি মসজিদ, পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তিদের বাসগৃহ এমনকী বৈঠকখানাও পরিণত হয়েছিল এক একটা ছোটোখাটো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এসব আলেম ওলামা, পণ্ডিত ব্যক্তি, জ্ঞানী-গুণী সকলেই ছিলেন ইসলামি আদর্শ ও শিক্ষার একনিষ্ঠ অনুসারী। তাঁদের কথা-বার্তা, চাল-চলন, আচার-আচরণ তথা ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন ছিল উন্নত ও সুমহান আদর্শ দ্বারা সুসজ্জিত। তারা উন্নত নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করতেন। ফলে উন্নত শিক্ষা ও আদর্শলব্ধ চারিত্রিক মাধুর্য অতি স্বাভাবিক ও অনিবার্যভাবেই প্রতিবেশি হিন্দু জনসাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এসব হিন্দু জনসাধারণও এ ধরনের সর্বজনীন শিক্ষার সুযোগ ও উন্নত চারিত্রিক মাধুর্য নিজেদের মাঝে এবং পরবর্তী বংশধরদের মাঝে দেখতে চাইত। এটা মানবীয় প্রকৃতির এক অতি স্বাভাবিক অভিব্যক্তি।

মুসলমান সমাজে শিক্ষার অবাধ সুযোগ ও সহজলভ্যতা প্রতিবেশি হিন্দু সমাজকে শিক্ষা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে। তাদের মধ্যে জাগিয়ে তোলে বিদ্যার্জনের স্পৃহা ও চেতনা। মুসলমান সরকার ধনী-গরিব, জাত-বেজাত নির্বিশেষ সকলের জন্যই শিক্ষার সুযোগকে অবারিত করে দেন। তাদের উৎসাহ জোগান এবং পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন। ফলে হিন্দু সমাজে পূর্ব হতে প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণদের একচেটিয়া আধিপত্যের অবসান ঘটে। সমাজের সর্বত্র এবং প্রায় সকল শ্রেণির লোকদের মধ্যেই শিক্ষার আলো প্রবেশ করতে শুরু করে। ভারতের হিন্দু-বৌদ্ধ সকলেই শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহী হয়ে ওঠে। মুসলমান শাসকবৃন্দ রাষ্ট্র ও প্রশাসনের আওতাধীন সকল উপায়-উপকরণ দিয়ে শিক্ষাকে সকলের জন্য সর্বজনীন ও সহজলভ্য করার কাজে এগিয়ে আসেন। এভাবে শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের গভীর ও ব্যাপক আগ্রহ এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি হিন্দুদের মাঝে গভীর প্রভাব ফেলে। ফলে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের সূচনা ঘটতে থাকে। প্রখ্যাত গবেষক ড. এম এ রহিম লিখেছেন–

> 'মুসলমানদের পূর্বে বাংলাদেশে শিক্ষা প্রধানত ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এবং সব ধরনের জ্ঞানের ক্ষেত্রেই নিম্নবর্ণের হিন্দুদের প্রবেশাধিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণগণ তাদের শাস্ত্রজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিকার বজায় রাখতেন। মুসলমান শাসন প্রবর্তিত হওয়ার দরুন সুবিধাভোগী হিন্দুদের কবল থেকে ভাগ্যহত ও বঞ্চিত হিন্দুরা মুক্তি লাভ করে। ফলে চিরকালের বঞ্চনা থেকে মুক্ত হয়ে তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। মুসলমানদের শাসনামলে অব্রাহ্মণদের পক্ষে শিক্ষা গ্রহণে ব্রাহ্মণদের অসন্তুটি উৎপাদনের আর কোনো ভয় ছিল না।

কেননা, এই শাসনব্যবস্থা মুসলমান-অমুসলমান, উঁচু-নিচু সর্বশ্রেণির লোকের নিকট পার্থিব, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অগ্রগতির জন্য সমান সুযোগ এনে দেয়। এভাবে মুসলমান আমলে হিন্দু সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির মধ্যেও শিক্ষার প্রসার হয় এবং বঞ্চিত অবহেলিত লোকেরাও বিদ্যার্জন করে জীবনে উন্নতি করার সমান সুযোগ পায়।'[৫৯]

শিক্ষা বিস্তারে মুসলিম আলেম-ওলামা ও শাসক শ্রেণির প্রচেষ্টা ও অবদান সম্পর্কে স্যার যদুনাথ সরকার প্রশংসাসহ স্বীকার করেছেন যে–

> 'প্রথম যুগের হিন্দু লোকেরা যখন তাদের নিজেদের সাধারণ রীতি অনুসার তাদের রচিত পুস্তকাদি গোপন রাখতে পছন্দ করতেন, সেই যুগে পুস্তক নকল করার ও তা প্রচারের দ্বারা মুসলমানরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রথা প্রচলন করেছেন। এজন্য আমরা তাদের কাছে ঋণী।'[৬০]

ভারত জুড়ে হিন্দু সমাজে তখন এক ভয়াবহ নৃশংস সামাজিক প্রথা চালু ছিল। আর তা হলো সতীদাহ প্রথা। স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবা হিন্দু স্ত্রীকেও স্বামীর মরদেহের সঙ্গে চিতায় জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হতো। এই নির্মম ও জঘন্য পদ্ধতির নাম ছিল সতীদাহ প্রথা। হিন্দু সমাজে নারী জাতির প্রতি এ ছিল এক জঘন্য অত্যাচার। সে আমলে হিন্দু সমাজে নারীদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ইন্দ্রভূষণ দাস বাবু লেখেন–

> 'হিন্দু সমাজে সে আমলে নারী জাতির প্রতি সুবিচার করা হতো না। পণ্ডিত নামে পরিচিত একশ্রেণির গোঁড়া লোক তখন হিন্দু সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করতেন। এরা নানা রকম বিধি-নিষেধের বেড়াজালে নারীজাতিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন। শুধু তাই নয়, কোনো নারী বিধবা হলে সমাজপতিরা জোর করে তাকে স্বামীর চিতায় তুলে দিয়ে জীবন্ত দগ্ধ করে হত্যা করতেন এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো এই ভয়াবহ নৃশংস কার্যটি ধর্মের নামে সম্পন্ন করা হতো।'[৬১]

যেহেতু ধর্মের নামে, ধর্মীয় উৎসাহ উদ্দীপনায় এ জঘন্য কাজটি করা হতো, আর সমাজের সমাজপতি ও ধর্মীয় গোষ্ঠীই এ নির্মম কাজটি সমাধা করতেন, তাই জঘন্য প্রথায় কত লাখো কোটি মা-বোনকে যে জীবন্ত অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করে হয়েছে, তার কোনো সঠিক হিসেব ইতিহাসে নেই। তারপরেও আমাদের কাছে কিছু খণ্ডিত চিত্র আছে বৈকি। ১৮১৮ সালে শুধু এক বছরে কোলকাতা শহরেই পাঁচশত তেত্রিশজন বিধবা নারীকে এই সতীদাহ প্রথার আওতায় জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছে।[৬২]

এই যদি একটি মাত্র শহরে মাত্র একটি বছরের চিত্র হয়, তাহলে একবার অনুমান করুন তো, সমগ্র ভারতবর্ষজুড়ে যুগের পর যুগ ধরে কত অসহায় নারীকে এভাবে হত্যা করা হয়েছে।

হিন্দু সমাজের ভেতর থেকে প্রথম যে ব্যক্তি এ বীভৎস ও অমানবিক প্রথা রোধের দাবি নিয়ে এগিয়ে আসেন, তিনি হলেন রাজা রামহোন রায় (১৭৭২-১৮৩৩)। তিনি যখন এ দাবি তোলেন, তখন তাঁর নিজ জন্মদাত্রী জননী তারিণী দেবী তাঁকে বিধর্মী বলে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেন। চারিদিকে এ কথা প্রচার হয়ে গেল যে, রামমোহন বিধর্মী হয়ে গেছেন। যা হোক, তিনি শেষ পর্যন্ত তাঁর দাবি আদায়ে সফল হন এবং ভারত চিরতরে সতীদাহ প্রথা রহিত করেন। রাজা রামমোহন রায় নারী জাতির প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার মানসে প্রথাটি রহিত করতে উঠে-পড়ে লাগেন।

হিন্দু সমাজে জন্মগ্রহণ করেও তিনি নারী জাতির প্রতি সুবিচার ও সদ্ব্যবহারের ধারণা (যা তাঁর সমকালীন সমাজ ও নিজ ধর্মে ছিল না) কোথায় পেলেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমরা তারই স্বজাতি লেখক শ্রী ইন্দ্রভূষণ দাসের লেখায় পাই। তিনি বলেন–

> ‘রমাকান্ত তার পুত্র রামমোহনকে ফার্সি উচ্চশিক্ষা কেন্দ্র পাটনাতে পাঠান। সেখানে তিনি ফার্সিতে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কোরানে নারী জাতির প্রতি সুবিচার ও সদ্ব্যবহারের যেসব কথা আছে সেগুলোও রামমোহনকে যথেষ্ঠ আকৃষ্ঠ করে। ...কোরান পড়ার পরে রামমোহনের মন হিন্দু সমাজের এ নৃশংস প্রথার প্রতি বিরূপ হয়ে ওঠে।’[৬৩]

অতএব, এ কথা অনস্বীকার্য যে, কুরআনের মহান শিক্ষা তথা ইসলামের শিক্ষা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, তথা বিশ্বের সকল অঞ্চলের সকল সমাজ ও সভ্যতায় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। তার প্রত্যক্ষ ছাপ পড়েছিল পুরো সমাজব্যবস্থায়।

বর্তমান বিশ্বসভ্যতাকে যেকোনো মানদণ্ডেই বিচার করা হোক না কেন, ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিবর্তনের প্রতিটি স্তরেই তা ইসলাম দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যে ভিত তৈরি হয়েছে তা অন্য কিছু দিয়ে নয়; বরং প্রত্যক্ষভাবে তা ইসলামেরই অবদান।

ইসলাম : বর্তমান সভ্যতার আগ্রাসি শিকার

বিগত চারশত বছর ধরে পশ্চ্যাত্য চেতনাভিত্তিক সভ্যতাকে আমরা বৈজ্ঞানিক জাহেলিয়াতভিত্তিক সভ্যতা বলে আখ্যায়িত করি। এর উত্থান ও বিস্তৃতির যে জোয়ার এবং সেইসঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি তথা জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছিয়ে পড়ার যে সর্বনাশা স্রোত উভয়ে মিলে মুসলমানদের চিন্তার জগতকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ও বিপর্যস্ত করে রেখেছিল। তাদের চেতনায় প্রত্যয় আর আত্মবিশ্বাসের স্থলে ঠাঁই করে নিয়েছিল অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতা, যা তাদের সামগ্রিক জীবনকে এক ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে। আঠারো শতকের শেষ প্রান্ত থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েকটি দশক পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় একশত তিরিশ বছর ধরে বিশ্বের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মন ও মানসে এক ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে।

এর মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ সময়টি ছিল শেষের অর্ধশত বছরব্যাপী সময়কাল, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময় পর্যন্ত। এ সময়কালে পাশ্চাত্য সভ্যতার সর্বগ্রাসী সয়লাবে মুসলমানদের সামাজিক মূল্যবোধগুলো একে একে ভেসে যেতে শুরু করে। বংশ পরম্পরায় ধরে লালিত সাংস্কৃতিক আচার-আচরণ ও পরিমণ্ডলে এক ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক আগ্রাসন পরিচালিত হয়। যার আওতায় তাদের জীবনদর্শন, আকিদা ও বোধ-বিশ্বাসের ওপরে নেমে আসে এক মারাত্মক ধ্বস।

ইসলামের শিক্ষা ও আকিদাবিরোধী এমন কোনো দর্শন নেই, যা এ সময়ে মুসলমানদের বিরাট এক গোষ্ঠীর মন-মগজে ঠাঁই করে নেয়নি। ফলে এই সময়কালের তরুণ-যুবা সকলেই এসব দর্শন আর তার শিক্ষা দ্বারা কমবেশি প্রভাবিত হয়েছে।

তারা জীবনে যা কিছুই করেছে, তাতেই দেখা গেছে এই বিরোধিতার রেশ। তারা প্রকৃত অর্থে গড়ার চেয়ে ভেঙেছে বেশি। তারা তাদের ব্যক্তিত্ব ভেঙেছে, ঘর ভেঙ্গেছে, পরিবার ভেঙেছে। ভেঙেছে জীবনের স্বাতন্ত্র্যবোধ, স্বকীয়তা ও বিশ্বাসকে। তারা ভেঙেছে নিজেদের মধ্যকার ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধকে। পারস্পরিক সম্পর্কের বুনিয়াদসহ নিজেদের সম্পর্ককে ভেঙেছে, সমাজকে ভেঙেছে। মোট কথা, এসব মুসলিম যুবসমাজ তাদের পুরো জীবনটাকেই ভেঙেছে। এ সময়টার ভেতরেই মুসলমানরা নিজেদের কেন্দ্রীয় ঐক্যের প্রতীক মুসলিম খেলাফত ব্যবস্থা, যা তখনও নিভু নিভু অবস্থায় টিকে ছিল, সেটিও ভেঙেছে।

পরিহাসের বিষয় এই যে, মুসলমানদের কেন্দ্রীয় ঐক্যের প্রতীক এই খেলাফতব্যবস্থা উচ্ছেদে যে ব্রিটিশ শক্তি সকল ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনার হোতা ছিল, সেই ব্রিটিশ শক্তির পক্ষ ও সহায়ক শক্তি হিসেবেই প্রায় চার লাখ আরব মুসলমান নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দেয়। তার পরিণতিতে ব্রিটিশ ও তার মিত্র শক্তি (প্রথম বিশ্বযুদ্ধে) সম্মিলিতভাবে বিজয় লাভ করে এবং ওসমানিয়া খেলাফতকে ভেঙে দিয়ে এর আওতায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম এলাকাগুলোকে (বিশেষ করে জেরুজালেম, ফিলিস্তিন) নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেয়। জীবনদর্শন, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, শত্রু-মিত্র সম্পর্কে চিন্তার ক্ষেত্রে কতটা গভীর নৈরাজ্যের কবলে পড়লে একটা জাতি তার আজন্ম আদর্শিক শত্রুর সঙ্গে হাত মিলিয়ে নিজেদের চার লাখ মূল্যবান প্রাণ আর সীমাহীন সম্পদ ধ্বংসের নজরানা পেশ করতে পারে। আর সেইসঙ্গে নিজের ভৌগলিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতাসহ প্রিয় জন্মভূমির অংশসমূহকে তুলে দিতে পারে শত্রুর হাতে!

এ দুঃখজনক ও লজ্জাজনক ঘটনার সমসাময়িককালে এবং তৎপরবর্তী সময়কালে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে থাকা মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে এই সুযোগে পদানত করে। যদিও এরা নিজেদের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব রক্ষায় তৎপর ছিল। মুসলিম জাতি ও সমাজের ঐক্যকে ধরে রাখার এবং প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেওয়ার কোনো কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান (খেলাফত) না থাকায় মুসলিমসমাজ অভিভাবকশূন্য হয়ে পড়ে। আর এই সুযোগে তারা মুসলমানদের বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী সেজে তাদের চিন্তা ও কর্মের অন্তর্নিহিত ঐক্যকে গুঁড়িয়ে দেয়। ভবিষ্যতে যাতে মুসলিম জাতিসমূহের মধ্যে কার্যকর কোনো ঐক্যব্যবস্থা গড়ে উঠতে না পারে বা এর সূচনাও কেউ করতে না পারে, সেজন্য সমগ্র মুসলিম দেশসমূহকে জাতিসংঘ নামক এক জাহেলি খেলাফত ব্যবস্থার জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলা হয়।

আর এ জাহেলি খেলাফত ব্যবস্থার (জাতিসংঘ) মূল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রয়ে যায় 'ভেটো' ক্ষমতাসম্পন্ন পাঁচ খলিফার হাতে। এই পাঁচ খলিফার মধ্যে মুসলমানদের কোনো প্রতিনিধিত্ব নেই। কূটকৌশলে সে প্রতিনিধিত্ব রাখা হয়নি। আর এ অশুভ শক্তি বিভিন্ন কৌশলে, চটকদার শ্লোগানে 'বৃহত্তর সহযোগিতা', 'উন্নত যোগাযোগ' ও 'ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক' এবং 'বিশ্বায়ন' ইত্যাদির টার্মের আবরণে ইসলামি সমাজে ব্যাপকভাবে অশান্তি, অনাচার, ও কুশিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে দেয়। এ গোষ্ঠী World Bank, IMF প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ছদ্মাবরণে মুসলিম দেশসমূহকে সুদি অর্থব্যবস্থায় আটকে ফেলে। এতে করে মুসলিম দেশসমূহ যে ভবিষ্যতে আর্থিকভাবে সাবলম্বী হয়ে উঠবে, সে রাস্তাও বন্ধ হয়ে গেছে।

অর্থাৎ মুসলিম দেশসমূহের ভবিষ্যৎ প্রগতির পথে সুকৌশলে অন্তরায় সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে। কারণ, তারা ইসলামি সমাজের মধ্যে শান্তি, স্বস্তি, প্রগতি ও ঐক্যকে নিজেদের লক্ষ্য হাসিলের পথে বড়ো বাধা বলে মনে করে। তাই মুসলিম দেশসমূহে ভবিষ্যৎ ঐক্য ও প্রগতির সূচনা হতে পারে, এমন প্রতিটি সম্ভাবনাকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এরপর উন্নতির শিখরে আসীন মুসলিম সমাজকে নিজেদের পরিকল্পনামতো ধ্বংস ও অকল্যাণের অতল গহ্বরে নামিয়ে না আনা পর্যন্ত তারা থামেনি।

এখানেই তারা ক্ষান্ত হয়নি; বরং আরও অনেক দূর অগ্রসর হলো। তারা নিজেদের লোলুপ ও হিংসায় পরিপূর্ণ দৃষ্টিকে আরও গভীরে নিক্ষেপ করল। মুসলমানদের ভবিষ্যৎ বংশধররা যেন তাদের হারানো ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করতে না পারে, নিজেদের পূর্ব ঐতিহ্য ও ইতিহাসের সঙ্গে কোনো যোগসূত্র স্থাপন করতে না পারে, পূর্বসূরিদের জ্ঞান-বিজ্ঞতা, উদারতা, শৌর্য-বীর্য যেন তাদের চরিত্রে ঠাঁই করে নিতে না পারে, তার স্থায়ী ও পাকাপোক্ত ব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য তারা ষড়যন্ত্র করল। সেই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে তারা মুসলমানদের আদর্শ ও বিশ্বাসকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা হাজার বছরের প্রাচীন ও উন্নত শিক্ষাব্যবস্থাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলো। সে স্থলে চাপিয়ে দিলো এমন এক শিক্ষাব্যবস্থা, যার মাধ্যমে নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধিতে সহায়ক হতে পারে, এমন একটা অনুগত শ্রেণি তৈরি করা যায়।

এ শিক্ষাব্যবস্থা অচিরেই মুসলিম সমাজের নতুন বংশধরদের চিন্তার জগতকে লক্ষ্যশূন্য করে ফেলল। তাদেরকে ঠেলে দিলো এক ভয়াবহ নৈরাজ্যের দিকে। রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সামাজিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে মুসলমানরা যতটা না ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল, তার চেয়ে অনেকগুণ বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হলো চিন্তা, দর্শন আর শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নৈরাজ্যের কারণে। এর অনিবার্য ফল হিসেবে মুসলমানরা অচিরেই তাদের জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য হারিয়ে ফেলল।

তাদের উন্নত দর্শন, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও গৌরবোজ্জল অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। তাদের মহান পূর্বপুরুষদের স্বর্ণোজ্জল ইতিহাস-ঐতিহ্য, চরিত্র-মাধুর্য, শৌর্য-বীর্য ও উদারতাসহ যে গুণগুলো সমগ্র বিশ্বকে চমকে দিয়েছিল, তা থেকে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শিক্ষা নেওয়ার, অনুপ্রেরণা পাওয়ার, উজ্জীবিত হওয়ার কোনো সুযোগই আর থাকল না; বরং মুসলিম যুবসমাজের মন মগজে ঠাঁই করে নিল পাশ্চাত্য জীবনদর্শন এবং শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব।

মুসলমানদের নতুন বংশধর পুরোপুরি পাশ্চাত্য কায়দার গড়ে উঠল। নামে, পরিচয়ে মুসলমান থাকলেও মন-মননে, চাল-চলনে, আচার-আচরণে এবং ধ্যানধারণায় তারা পুরোপুরি পাশ্চাত্য জীবন দর্শনের একনিষ্ঠ প্রতিনিধিত্বকারী হয়ে উঠল। ফলে মুসলমানদের মধ্যে একটি গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়ে গেল, যারা একই সমাজ ও সামাজিক পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠলেও পিতা-মাতা মুরুব্বি শ্রেণিভূক্ত গুরুজনদের বিশ্বাসের সঙ্গে আদর্শিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ল।

ফলে জন্ম নিল নবীণ ও প্রবীণ গোষ্ঠীর মধ্যে মানসিক দূরত্ব। নিজেদের মধ্যেই এমন একটি শ্রেণি বা গোষ্ঠী জন্ম নিল, যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিলো বটে কিন্তু ইসলামের মৌলিক শিক্ষা, দর্শন ও বাস্তব আচার-আচরণের সঙ্গে তাদের কোনো প্রত্যক্ষ সংযোগ থাকল না। এ গোষ্ঠীটি ইসলামি সমাজে বাস করেও ইসলামি আদর্শ, শিক্ষা, দর্শন ও জীবনব্যবস্থার প্রতিনিধিত্ব করল না, উলটো মুসলমানদের কাছেই পশ্চিমা দর্শনের প্রতিনিধিত্ব করে যেতে থাকল। ভাবখানা এমন হলো যে, মুসলমানদের প্রতি ঘরে ঘরে যেন পশ্চিমা জীবনব্যবস্থা ও জীবন দর্শনের 'আবাসিক প্রতিনিধি' নিয়োগ করা হলো। যাতে করে তারা পুরো মুসলিম সমাজ এবং ভবিষ্যৎ বংশধরদের পশ্চিমা জীবনব্যবস্থায় প্রশিক্ষিত করে তুলতে পারে।

এর ফলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর এই নতুন অংশটির মনে ইসলাম সম্পর্কে এমনই হীনমন্যতা জন্ম নিল যে, তারা ইসলামের প্রতিটি শিক্ষা ও নির্দেশকে নিজেদের কাঁচা যুক্তির নিরিখে পরখ করে দেখতে লাগল। যেগুলো যুক্তির বিচারে উত্তীর্ণ হলো, সেগুলো মেনে নিল, বাকিগুলো প্রত্যাখ্যান করল। অপরদিকে পশ্চিমা শিক্ষা ও দর্শনের ব্যাপারে তাদের মনে এতটাই আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে উঠল যে, তারা বিজ্ঞানের নামে যেকোনো শিক্ষা ও তথ্যকে বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিল। সেগুলোকে জাতীয় জীবনে বাস্তবায়িত করতে উঠে পড়ে লাগল। আর এ লক্ষ্যে তাদের সমস্ত সম্পদ মেধা ও শ্রম নিয়োজিত করল। মুসলমানদের সমাজে এদের দ্বারাই গড়ে উঠল মুক্ত চিন্তা আন্দোলন, প্রগতিবাদী আন্দোলন, নারী স্বাধীনতা আন্দোলন ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য দর্শনের ধারক-বাহকরা দীর্ঘদিন ধরে শোষণ, শাসন ও নিষ্পেষণ চালিয়ে তাদের অধীনে রাখা মুসলিম দেশগুলোকে নিজেদের দখলে রাখতে ব্যর্থ হলো। মুসলমান আলেম-ওলামাসহ ইসলামপ্রিয় সাধারণ জনগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত স্বাধীনতা আন্দোলন তুঙ্গে উঠল। মুসলমানদের দেশ, এলাকা আর কোনো মতেই ধরে রাখা গেল না। স্বাধীনতার দাবি মেনে নেওয়া ছাড়া দখলদার বাহিনীর সামনে কোনো পথই খোলা রইল না। তখন এরা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে মুসলিম সমাজের ভেতরে ইতোমধ্যেই জন্মগ্রহণকারী ও বেড়ে ওঠা তাদের আদর্শিক প্রতিনিধিত্বকারী গোষ্ঠীকে মঞ্চে নিয়ে এলো। প্রতিটি দেশে মুসলমানদের মধ্যে আঞ্চলিকতা ও জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা উসকে দিয়ে অনৈক্য সৃষ্টি করে তাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হাসিলে সমর্থ হলো। এই গোষ্ঠীর হাতেই তারা ক্ষমতা ছেড়ে দিলো। স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দে আত্মহারা জনগণ এটাকেই তাদের প্রকৃত বিজয় বলে ভুল করল।

মুসলমান জনসাধারণ যখন পশ্চিমা দখলদার বাহিনীর নিকট দেশের স্বাধীনতা হারিয়েছিল, তখন তারা হারিয়েছিল (কিছু ভুল-ভ্রান্তিসহ টিকে থাকা) ইসলামি শাসনব্যবস্থা। কিন্তু এখন তারা যা পেল, তা তাদের সেই হারানো ইসলামি শাসনব্যবস্থা নয়; বরং পেল মুসলমান কর্তৃক শাসিত জাহেলি শাসনব্যবস্থা। সাধারণ জনগণ 'ইসলামি শাসনব্যবস্থা' এবং 'মুসলমান শাসিত জাহেলি শাসনব্যবস্থা' এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্যটুকু স্বাধীনতা প্রাপ্তির আনন্দে ভুলে গেল।

ঔপনিবেশিক শক্তি নামধারী মুসলিম গোষ্ঠীর হাতে নিজেদের প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা তুলে দিয়ে নিজ নিজ দেশে ফিরে গেল। এবার তাদের এই মুসলিম নামধারী মানসপুত্র ও আদর্শিক প্রতিনিধি নতুন শাসকরা পশ্চিমা প্রভুদের চেয়েও বেশি দুঃসাহসের সঙ্গে আপামর মুসলিম জনগণকে তাদের ঈমান ও আদর্শবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে ফেলতে চাইল। পুরো জাতি বা উম্মাহকে তারা এ কাজের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে ফেলল। তাদের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা-প্ররোচনা এবং রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য ও উৎসাহে জড়বাদী, বস্তুবাদী ও ভোগবাদী শিক্ষা এবং যৌনতানির্ভর সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটতে থাকল। ইসলামি দর্শন, শিক্ষা ও সাংস্কৃতির তখন পর্যন্ত নিভু নিভু রেশটুকু বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তাবস্থায় সমাজ ও দেশের আনাচে-কানাচে অবশিষ্ট ছিল। আল্লাহর কিছু অটল মনোবলসম্পন্ন মুজাহিদ বান্দাহরা নিজেদের ব্যক্তি-সমাজ ও পারিবারিক জীবনে এসব ধরে রেখেছিলেন, তাতেও ধ্বস নেমে আসল।

মুসলমান সমাজের যারা এতদিন দুহাত দিয়ে হিমালয় ঠেকিয়ে রাখার মতো অসাধ্য সাধন করেছেন। রাষ্ট্রীয় সুবিধাসহ শত মায়াবি প্রলোভনের হাতছানিকে উপেক্ষা করে ব্যক্তি জীবন ও পরিবারে বহু কষ্টে ইসলামের শাশ্বত বোধ-বিশ্বাস, দর্শন ও আচার-অনুষ্ঠানকে লালন করেছেন, পালন করেছেন। পরবর্তী বংশধরদের এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষিত করেছেন। তারা বড়ো আশায় বুক বেঁধেছিলেন যে, নিজেদের হাতে শাসনক্ষমতা এলে তাদের এ দুর্দিনের অবসান হবে। তারা নিজেদের বিশ্বাস ও আকিদা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারবেন। এ ব্যাপারে তারা আর বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হবেন না। কিন্তু তাঁদের সে আশা দুরাশা বলে প্রতিভাত হলো। সগোত্রীয় শাসকরা শাসনক্ষমতা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অবলীলায় এমনসব পদক্ষেপ নেওয়া শুরু করল যে, তাদের পূর্বসূরি বিদেশি ঔপনিবেশিক শাসকরাও সেগুলো নেওয়ার আগে দশবার ভাবত। এরা অতি দ্রুত মুসলমানদের ভেঙে পড়া সাংস্কৃতিক জীবনকে সমূলে ধ্বংস করতে এবং মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবন থেকেও ইসলামের নাম-নিশানা মুছে ফেলতে উদ্যত হলো।

রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন তো মুসলমানদের আগেই হাতছাড়া হয়েছে। এবার সাংস্কৃতিক জীবনের যে শেষ চিহ্নটুকু বাকি ছিল, সেটিও নিশ্চিহ্ন করার মাধ্যমে পৃথিবী থেকে মুসলমান তথা ইসলামকে উচ্ছেদ করার কার্যক্রম চালাতে থাকল। সমাজে দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট সুবিধাবাদী চরিত্রের কপট মুসলমানের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকল। মুসলমানদের সংখ্যাগুরু অংশ দিন দিন নিঃস্ব ভিখারিতে পরিণত হলো। তাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে কোনো দিক থেকেই আশার আলো নজরে পড়ল না।, তারা যে জাহেলিয়াতের ঘন কালো আঁধার ভেঙে বেরিয়ে আসবে, সে রাস্তাও তাদের জানা ছিল না এবং সে শক্তিও অবশিষ্ট ছিল না। যদিও তাদের বুকে ছিল ইসলামি সমাজব্যবস্থায় শামিল হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা, তবুও সম্মুখে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো এমন কোনো ব্যক্তি, সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান ছিল না। বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত মুসলমান জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার মতো নেতৃত্ব ছিল না। তাই নেতৃত্বহীন এ জাতির খুব শীঘ্রই পতনের অতলে তলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো।

বর্তমান সভ্যতা : বিশ্বব্যাপী হাহাকার

বিশ্বের সবচেয়ে ধনী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্যতম নেদারল্যান্ড। ইউরোপের ছোটো এ দেশটি সম্পদ আর প্রাচুর্যে ভরপুর। লোকসংখ্যা সামান্য। অথচ ও দেশটিতে প্রতি বছর প্রায় দশ হাজার লোক আত্মহত্যার অনুমতি চেয়ে সরকারের কাছে আবেদন করে থাকে।[৬৪]

এ হলো অন্যতম ধনী, অথচ ছোটো একটি দেশের খণ্ডিত চিত্র মাত্র। বিশ্ব সভ্যতার বর্তমান এ পরিস্থিতি ও দ্রুত অবনতিশীল অবস্থা দেখে সারা বিশ্বের জ্ঞানী-গুণী ও চিন্তাশীল মানুষগণ আতঙ্কিত হয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়েছেন। তারা অধীর হয়ে এর থেকে নিষ্কৃতি খুঁজেছেন। সমাজ-সভ্যতার এ দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থা হতে বিশ্ববাসীকে বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপের সুপারিশ করেছেন। তারা নিজেদের সমাজ ও সভ্যতার মৌলিক ত্রুটিসমূহকে অবলীলায় চিহ্নিত করতে শুরু করেছেন এবং এর হাত থেকে নিষ্কৃতি চাইছেন। তারা সুস্পষ্টভাবে স্বীকার করছেন, যে সভ্যতা নিয়ে তাদের অহংকার, গর্ব আর আত্মপ্রসাদের অন্ত ছিল না, সে সভ্যতা তাদের কাঙ্ক্ষিত সুখ-শান্তি ও নিরাপত্তা দিতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর এ সভ্যতা বিজ্ঞানের চমকপ্রদ সাফল্য ও অগ্রগতি সত্ত্বেও যে তাদেরকে শান্তি ও মুক্তি দিতে পারেনি, উলটো তাদের বিজ্ঞানের দাস বানিয়েছে। তার স্বীকারোক্তি বড়ো ক্ষোভের সঙ্গেই আজ তারা করছেন এবং তা প্রকাশ্য ও সরবেই করছেন! একজন আধুনিক পশ্চিমা চিন্তাবিদ ড. ক্যারেল তাঁর লেখা Man the Unknown নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন–

> 'যান্ত্রিক আবিষ্কারের সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই। পদার্থবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা ও রসায়নবিদ্যার আবিষ্কারের প্রতি গুরুত্বারোপ করে কোনো লাভ হবে না। এটা সত্য যে, নিছক বিজ্ঞান আমাদের জন্য কোনো ক্ষতি নিয়ে আসে না। তবে যখন বিজ্ঞানের সৌন্দর্য্য আমাদের মনকে পরাভূত করে এবং আমাদের চিন্তাকে আবদ্ধ করে, তখনই বিজ্ঞান বিপজ্জনক রূপ ধারণ করে। মানুষের উচিত এবার নিজের দিকে, তার নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অক্ষমতার দিকে নজর দেওয়া।'[৬৫]

তাঁর কথায় তিনি স্পষ্টরূপে মত প্রকাশ করেছেন যে, পশ্চিমা সভ্যতার ধারকবাহকদের বিশ্বাস ও ঘোষণা অনুযায়ী বিজ্ঞান কাঙ্ক্ষিত সুখ ও শান্তি দিতে পারেনি; বরং তারা আরও বেশি দেউলিয়াত্বের শিকার হয়েছেন। এ দেউলিয়াত্ব হলো নৈতিকতার দেউলিয়াত্ব। আত্মিক দিককে তারা তাচ্ছিল্য করেছে, অবজ্ঞা করেছে। নৈতিক গুণাবলি অর্জন এবং তার চর্চা ও বিকাশের জন্য তারা কোনো চেষ্টাই করেনি। তাদের এ ব্যাপারে কোনো পরিকল্পনা ছিল না, প্রচেষ্টাও ছিল না। তাই বড়ো হতাশা আর আক্ষেপ মেশানো কণ্ঠে ড. ক্যারেল মন্তব্য করেছেন এভাবে–

> 'যে জীবনপদ্ধতি মহান জাতিসমূহের নৈতিক অধঃপতন ও মহান গুণাবলির ক্ষয় সাধন করে চলেছে, তাকে ব্যাপকতর করে কোনো লাভ নেই।'[৬৬]

নৈতিক অধঃপতনের বিভিন্ন চিত্র

এ ব্যাপারে আমরা ইতোমধ্যে কিছু আলোচনা করেছি। তার পরেও এখন দু-একটা তথ্য উদ্ধৃত করতে চাই। বিশ্বের অন্যতম সভ্য দেশ বলে পরিচিত ব্রিটেনে ১৯৭১ সাল থেকে ১৯৯১ সালে তুলনামুলকভাবে বিয়ের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে শতকরা ৪০ ভাগ। ১৯৯১ সালে সম্পাদিত বিবাহসমূহের মধ্যে শতকরা ৫০টি বিবাহ ভেঙে গেছে। ১৯৬০ সালের তুলনায় ১৯৯১ সালে বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যা বেড়ে গেছে পাঁচ গুণ! এর অনিবার্য পরিণতিতে বিবাহবহির্ভূত যৌনাচারের ব্যাপক প্রসার ঘটেছে, তা বলাই বাহুল্য। তারও প্রমাণ আমরা হাতেনাতে পেয়ে যাই, যখন দেখি ব্রিটেনে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের মধ্যে শতকরা ৩৩ জন জারজ। তারা জানে না তাদের পিতা কে?[৬৭]

প্রাচ্যের ধনী দেশ জাপান তার নাগরিকদের নিয়ে শঙ্কিত। সেখানে শুধু একটি বছরে (১৯৮৬ সালে) কিশোর অপরাধ সংঘটিত হয়েছে ১৬ লাখ। সেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে।[৬৮]

আর এ অবস্থায় আতঙ্কগ্রস্থ সরকার বড়ো বিপদে পড়েই নৈতিক মুল্যবোধ বৃদ্ধির জন্য সরকারি/বেসরকারি টেলিভিশনসমূহে বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করেছে।

বর্তমান সভ্যতার সবচেয়ে বড়ো ত্রুটি হলো, সভ্যতার মূল উপাদান। যাকে কেন্দ্র করে, যার দ্বারা এবং যার জন্য সভ্যতা গড়ে ওঠে; সেই মানুষের অস্তিত্বকেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেছে এ সভ্যতা। তাকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়েছে। তার প্রতি যতটা মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, তার কিয়দাংশও সে দিতে পারেনি; বরং এ সভ্যতার সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য ছিল, কী করে বস্তুর উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটানো যায়। ফলে মানুষের আত্মিক দিক ও নৈতিক দিকসহ সকল দিকই নিদারুণভাবে উপেক্ষিত থেকেছে। মানুষকে ঘিরে থাকা বাইরের জগৎ তথা বস্তুজাগতিক রূপের উন্নয়ন ঘটেছে বটে; কিন্তু তার ভেতরের জগৎ, যা মানুষের আসল সত্তা, সেই নৈতিক জগতের কোনো উন্নয়নই ঘটেনি। সে ক্রমান্বয়ে ভয়ংকর এক অন্ধকারের ভেতরে তলিয়ে গেছে।

মানুষ তার বাইরের জগতকে জানতে এবং খুঁজে পেতে নিজের সকল মেধা, শ্রম, সময় ও সম্পদকে নিয়োজিত করেছে ঠিকই। কিন্তু ভেতরের আত্মিক দিককে এতটুকুও তলিয়ে দেখেনি। ফলে কী হয়েছে? তার জবাব আমরা শুনব এ সভ্যতারই একজন বুদ্ধিজীবি ও সচেতন নাগরিক ড. ক্যারেলের মুখে, তিনি বলেছেন–

> 'মানুষই সবকিছু পরিমাপের কেন্দ্র হওয়া উচিত। অথচ মানুষ তার চারিদিকে যে জগৎ সৃষ্টি করেছে, সে জগতে সে নিজেই আজ নবাগত, অচেনা ব্যক্তির মতো হয়ে আছে। এ জগতটাকে নিজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে সে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, নিজের প্রকৃতি সম্বন্ধেই তার আসল জ্ঞান নেই।'[৬৯]

বর্তমান বিশ্বে শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সার্বিক দিক থেকে উন্নত বলে যেসব দেশ ও জাতির সন্ধান আমরা পাই, তারা যে বস্তুগত এসব উন্নতির পাশাপাশি ক্রমান্বয়ে এক সর্বগ্রাসী দুর্বলতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ সত্য কোনো মুসলমান মনীষী কর্তৃক নয়; বরং ড. ক্যারেলের মতো এক খ্রিষ্টান ও সমাজের সচেতন নাগরিকের স্বীকারোক্তি হতে সুস্পষ্টরূপে স্বীকৃত। তিনি বলেছেন–

> 'আমরা আমাদের সভ্যতার দুর্বলতাগুলো উপলব্ধি করতে শুরু করেছি। আজ অনেকেই তাদের ওপরে চাপানো মতগুলো ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছেন। অনেকেই আজ সাহস করে মানসিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি দিচ্ছেন...

সত্যিকার ব্যাপার হচ্ছে, আমাদের সভ্যতা এবং এর আগেকার কয়েকটি সভ্যতা এমন এক অবস্থার জন্ম দিয়েছে, যার ফলে জীবন দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে।'[৭০]

এ এক স্পষ্ট ও সাহসী স্বীকারোক্তি। একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী তার গভীর পাণ্ডিত্য ও বিশ্লেষণী অনুভূতি দিয়ে হৃদয় থেকে উচ্চারণ করেছেন এই কঠিন অথচ সরল অকপট স্বীকারোক্তি। এর থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ কী? কোন সে পদক্ষেপ, কোন সে পথ, যা ধ্বংসের দিকে ধাবমান এ বিশ্বকে সভ্যতাকে আশু ও নিশ্চিত ধ্বংস থেকে সুনিশ্চিতভাবেই রক্ষা করতে পারে? এ প্রশ্ন আজ পশ্চিমা জগতের সকল বিবেকবান ও সচেতন মানুষের মনে নিয়তই উঁকি দিচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এককালের ডাকসাইটে ও ঝানু পররাষ্ট্র সচিব ফস্টার ডালেস তার *War or Peace* গ্রন্থের Our Spiritual Needs অধ্যায়ে এর সুস্পষ্ট ও সাহসী জবাব দিয়েছেন। পশ্চিমা সভ্যতার সমস্যা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করার পরে ডালেস মুক্তির পথ হিসেবে হজরত ইসা (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতিকে নির্দেশ করেছেন। উক্ত উদ্ধৃতিতে হজরত ইসা (আ.) বলেছেন–

> 'ব্যক্তির উচিত আল্লাহর শাসন ও তার ন্যায় বিচার সর্বাগ্রে তালাশ করা। তাহলে বাকি সবকিছুই তার কাছে এসে যাবে।'

এরপরে ডালেস আরও মন্তব্য করেছেন–

> 'যেসব ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, উচ্চতর কোনো এক শক্তির প্রতি তাদের কর্তব্য আছে; তারা সে শক্তির ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার প্রচেষ্টা চালায়, এ প্রত্যয়ের কারণে তারা বিশেষ শক্তি, সততা এবং প্রজ্ঞার অধিকারী হয়। তারা বর্তমানের জন্য গড়ে না, গড়ে আগামী দিনের জন্য।'[৭১]

এখানে সুস্পষ্ট যে, মি ডালেস 'উচ্চতম শক্তি' বলতে আল্লাহ এবং ধর্মের প্রতি বিশ্বাসের কথা বলেছেন। অথচ এই ফস্টার ডালেস ও তার সমাজ-সভ্যতার সদস্যরা মিলেই তো ধর্মকে প্রগতি ও আধুনিকতা বিরোধী, অন্তরায় বলে বাস্তব জীবন থেকে নির্বাসন দিয়েছেন! ফস্টার ডালেস-এর নিজের স্বীকারোক্তি দেখুন–

> 'জাতিগতভাবে আমরা ধর্মানুসারী, কিন্তু আমরা সেই ধর্মীয় বিশ্বাস ও বাস্তব জীবনের যোগসূত্র হারিয়ে ফেলেছি। আমরা ধর্ম এবং বাস্তব কাজকে দুই ঘরে আলাদা করে রেখেছি।'[৭২]

অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে, অনেক ঠকে আজ পুনরায় ধর্মের দিকেই আঙুল নির্দেশ করছেন এসব সচেতন ব্যক্তিবর্গ। বিখ্যাত দার্শনিক হেগেল ধর্মের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছেন বেশ উঁচু গলায়। তবে তিনি চেয়েছেন সেই ধর্ম, যা মানব মনের সকল অমীমাংসিত প্রশ্নের সুষ্ঠু জবাব দিতে সক্ষম। তাঁর নিজের ভাষায় দেখা যাক–

> Religion is for our conicousness, that religion in which, all enigmas of world are solved, all the contradiction of deeper reaching thoughts have their meaning unveiled and which the voice of hearts pain is solved, the religion of eternal truth, of eternal rest, of eternal peace.
>
> 'আমাদের বিবেকের জন্য প্রয়োজন সেই ধর্ম, যেখানে এ বিশ্বের সকল জটিলতার সমাধান হবে। চেতনার গভীর থেকে আসা সকল দ্বন্দ্ব তার জবাব খুঁজে পাবে। হৃদয়ের সকল মর্মযাতনা যেখানে সমাধা হবে। চিরন্তন শাশ্বত সত্যের সেই ধর্ম, অনাবিল প্রশান্তি আর অনন্ত সুখের সেই ধর্ম।'

অপরদিকে আরেক মনীষী R.N. Crew Hunt বলেছেন–

> 'সত্য কথা হলো, সর্বশেষ যাচাইয়ের পর আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, প্রকৃত ও সুষ্ঠু ধর্মের অভাবে আমাদের জীবনে যে বিরাট শূন্যতা দেখা দিয়েছে, তারই সামগ্রিক নাম "সমাজবাদ"। জীবনে ধর্মহীনতাকে প্রতিষ্ঠা করার অনিবার্য ফল হলো এটা। এই মতাদর্শের সঙ্গে বোঝাপড়া করার জন্য এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থার প্রয়োজন, যাতে থাকবে এর চেয়ে উৎকৃষ্ট নিয়ম ও বিধিবিধান।'[৭৩]

শুধু যে বুদ্ধিজীবী, গবেষক, সাহিত্যামোদী বা দার্শনিকরাই একটি নতুন জীবন পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তার কথা বলছেন তা নয়; বরং রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গও একই প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরছেন। তাদের কণ্ঠেও ধ্বনিত হচ্ছে একটি নতুন জীবন পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা। সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্টের জন্য প্রণীত GLOBAL 2000 নামক প্রকল্পের পরিচালক জেরার্ল্ড ও বার্নি (Gerald O Barnay প্রণীত *Threshold 2000* নামক গ্রন্থে এ প্রশ্ন তুলেছেন এভাবে-

> 'Is there a faith in existence today that is practising a way of life that provides 'progress' for the whole community of life not just the human species? Is there a faith tradition such that if everyone on Earth suddenly adopted it, the human future on Earth would be assured?'

> 'শুধু মানব প্রজাতি নয়, সমগ্র জগতজীবনের উন্নয়নোপোযোগী জীবন পদ্ধতি দেয় এমন ধর্মের অস্তিত্ব আছে কি? এমন ধর্ম কি দুনিয়াতে আছে, যা আজ দুনিয়ার মানুষ হঠাৎ যদি গ্রহণ করেই বসে তাহলে এই দুনিয়ায় তাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হবে?'[৭৪]

কাজেই এ কথা পরিষ্কার যে, বর্তমান বিশ্ব সভ্যতার প্রতিটি সদস্যের অন্তকরণে মানবজাতির মুক্তি, সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য কার্যকর ও উন্নত একটি জীবন দর্শনের হাহাকার চূড়ান্ত পর্বে এসে দাঁড়িয়েছে। সকলেই মরিয়া হয়ে এমন একটি জীবনদর্শন হাতড়ে মরছে, যার ভিত্তিতে এ বিশ্ব সভ্যতা আশু ধ্বংসের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবে।

আদর্শিক দেউলিয়াত্ব : বর্তমান সভ্যতা ধ্বংসের সূচনাবিন্দু

ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি S.Radhakrishnan তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ *Indian Philosophy*-তে লিখেছেন–

> 'পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে বিরোধ, সেখানে মানুষ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।'

তাঁর এই উক্তি অতিরঞ্জন কিছু নয়; বরং নিরেট বাস্তবতা। গ্রিক সভ্যতার মানুষ ও আল্লাহর সম্পর্ক হলো ঈর্ষা ও শত্রুতার সম্পর্ক। পৃথিবীতে যা কিছু মানুষের জন্য কল্যাণকর, তা আল্লাহর হাত থেকে মানুষকে ছিনিয়ে নিতে হয়, আল্লাহ মানুষকে তা দান করেন না। বরং মানুষই নিজ যোগ্যতা ও বুদ্ধিবলে অর্জন করে।

এই বোধ-বিশ্বাস দ্বারা বর্তমান ইউরোপীয় বা পশ্চিমা সভ্যতা প্রভাবিত। রোমান সভ্যতার মাধ্যমেই তারা এ চিন্তাধারা পেয়েছে। আর মতবাদ অর্জন করেছে গ্রিক সভ্যতা হতে। তাই এ কথা আমরা অতি সহজেই বলতে পারি যে, বর্তমান সভ্যতা আর কিছুই নয়; বরং প্রাচীন গ্রিক সভ্যতারই নবতর সংস্করণ। শুধু তার সঙ্গে যোগ হয়েছে একবিংশ শতাব্দীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও উপার্জন। এই সভ্যতা চিন্তা-চেতনা, ধ্যানধারণা ও মন-মননে সেই হাজার বছরের পুরোনো গ্রিক সভ্যতার বিফল ও ব্যর্থ ধ্যানধারণা তথা আদর্শকেই লালন করেছে।

এ কারণেই তারা এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর সাফল্যে ভাবছে যে, তারা আল্লাহর শক্তি অর্জন করেছে অথবা ইলাহি শক্তি বলে পরিচিত শক্তির নৈকট্য অর্জন করেছে। আল্লাহ এবং ইলাহি শক্তি বলে কিছু নেই,

বরং বিজ্ঞানই হলো সেই ইলাহি শক্তি ও জ্ঞান; যা মানুষের প্রয়োজন মেটাতে ও তার সকল জিজ্ঞাসার জবাব দিতে পারে।

এ ধরনের ভ্রান্ত ধ্যানধারণার কারণেই মানুষ ধর্মের বিধিবিধানকে মানতে চাইছে না। উন্নত ও নৈতিক বিধিবিধান যে একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কর্তৃকই প্রদান করা সম্ভব, এই মৌলিক বিশ্বাসকেই সে অস্বীকার করে বসেছে।

এ কথা সত্য যে, মানুষ বিজ্ঞানকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে নিরলস গবেষণার পরে জ্ঞানের জগতে চমকপ্রদ কিছু তথ্য উদ্ঘাটন করতে পেরেছে। কিন্তু সে এ কথা ভুলে গেছে যে, তার উদ্ঘাটিত সকল তথ্য-তত্ত্ব জ্ঞানের জগতে এখনও পূর্ণ শিশু অবস্থায়ই রয়ে গেছে। সে জীববিজ্ঞান, রসায়নবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, মহাকাশবিজ্ঞানসহ বিজ্ঞানের সকল শাখায় অনেক জ্ঞানই আহরণ করতে পেরেছে। কিন্তু তার আহরিত এ জ্ঞান আটলান্টিকের তুলনায় যেন একটা বিন্দু মাত্র। আজও সে তার নিজ দেহের সকল রহস্য জানে না। আজও সে রোগ-শোক-জ্বরাকে জয় করতে পারেনি। এসবের আক্রমণকে ঠেকাতে পারেনি; বরং এসবের নিকট আজ সে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি মাত্রায় দুর্বল! আজও সে নিজ আত্মা সম্পর্কে কিছুই জানে না। সভ্যতার শুরুতে সে এ ব্যাপারে যে তিমিরে ছিল, আজও সেই একই তিমিরেই পড়ে আছে।

তারপরও সে সীমিত সাফল্যে এত বেশি উল্লসিত হয়েছে যে, আনন্দে লাফিয়ে ওঠে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছে 'আল্লাহ বলে কিছু নেই, বিজ্ঞানই সব সৃষ্টির মূল, আর মানুষ যখন এই বিজ্ঞানকেই করায়ত্ব করেছে, তখন আল্লাহ-খোদাকে তো বিশ্বাস করার কোনো যুক্তি বা প্রয়োজনীয়তা নেই। আল্লাহ, খোদার নামে প্রচলিত বিধিবিধান মেনে নেওয়া বা মেনে চলারও কোনোরূপ যৌক্তিকতা নেই।'

পশ্চিমা সভ্যতা ও মতবাদের অন্যতম একটা ব্যর্থতা হলো, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে সে মানুষ এবং তার চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। জ্ঞানার্জনের পেছনে ভোগ-বিলাস, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা ছাড়া উন্নত কোনো উদ্দেশ্য ও কার্যকারণ তার সামনে তুলে ধরতে পারেনি। সে মানুষের বস্তুগত দিককে উন্নত করতে সমর্থ হলেও আত্মিক দিককে উন্নত করতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

ফলে মানুষের বস্তুজগতের সঙ্গে অন্তর্জগতের বিস্তর ব্যবধান তৈরি হয়েছে। বস্তজগতে সে যত বেশি এগিয়েছে, আত্মিক জগতে সে ততটাই পিছিয়ে পড়েছে। এ ব্যবধান একের পর এক ক্রমাগতভাবে বেড়েই চলেছে। ফলে এক সময় এসে বস্তুজগতের চাপ ও চাহিদার ফলে মানুষ তার আত্মিক গুণাবলি হারিয়ে ফেলেছে অথবা বিসর্জন দিয়েছে।

আত্মিক জগতে সে তিমিরাচ্ছন্নই রয়ে গেল। মানুষকে বাইরের বস্তুজগতে যতই চাকচিক্যময় দেখাক না কেন, ভেতরের অন্তর্জগতে সে একেবারেই শূন্য হয়ে পড়েছে। ফলে এর স্বাভাবিক ও অনিবার্য পরিণতি হিসেবে মানুষ বল্গাহীন অশ্বের মতো সমস্ত বোধ-বিশ্বাসকে অস্বীকার করে সমস্ত মৌলিক মূল্যবোধ ও মানবীয় গুণাবলিকে পায়ে দলে এগিয়ে যেতে চেয়েছে।

মানুষের জন্মগত প্রকৃতিই এমন যে, সে আমৃত্যু কিছু বিধিবিধানের আওতার বাস করে এবং তার মাধ্যমে নিজের কার্য সম্পাদন করে। সে কখনোই এই বিধিবিধানের বাইরে থাকতে পারে না। পশ্চিমারা যেহেতু আল্লাহ প্রদত্ত এ বিধিবিধান ত্যাগ করেছে এবং বিজ্ঞানের বিভিন্ন সফলতায় নিজের আত্মবিশ্বাসকে আকাশ ছোঁয়া পর্যায়ে নিয়ে গেছে, তাই তারা এই আনন্দ, আবেগ ও সাফল্যকে (A Sense of Acomplishment) নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী হয়ে নিজের জীবনের জন্য প্রয়োজনীয় বিধিবিধানকে নিজেই তৈরি করে নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে তারা শুধু নিজের সফলতাকেই দেখেছে, কিন্তু সীমাবদ্ধতার দিকে নজর দেয়নি।

এটা মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতিগত দুর্বলতা যে, তার দৃষ্টির মধ্যে একই সময়ে একইসঙ্গে মাত্র একটি বিষয় ধরা পড়ে, মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং অপরাপর বিষয়গুলো তখন মনোযোগের বাইরে অবস্থান করে। এ কারণেই পশ্চিমারা দৃষ্টিকে যখন সফলতা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অগ্রগতির দিকে দিয়েছে, তখনই ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতার দিকটি পুরোপুরি দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। তারা সফলতায় উল্লসিত হয়েছে, কিন্তু খুব শীঘ্রই হোঁচট খেয়েছে। নিজেকে এবং অপরকে গড়ার জন্য তারা যে বিধিবিধান দিয়েছিল, তা ব্যবহারের ফলে গড়ার পরিবর্তে যখন ভাঙন শুরু হয়েছে, তখন প্রকৃত অর্থেই তারা হোঁচট খেয়েছে। ভাঙনের এ প্রক্রিয়ায় নিজেদের বোধ-বিশ্বাস ভেঙেছে, আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে। ঘর ভেঙেছে, সমাজ, পরিবার, পৃথিবীতে অবস্থান, সমাজের সঙ্গে সম্পর্ক, এসব কিছুই ভেঙেছে; বিপর্যস্থ হয়ে গেছে। দম ফেলার ফুরসতটুকুও তারা পায়নি।

ভাঙনের এ প্রক্রিয়া যখন থেকে শুরু হয়েছে, তখন থেকেই তা রোধ করার জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ভেঙে যাওয়া সম্পর্ক ও অবস্থানকে পুনরুদ্ধার করতের উদ্ধত হয়েছে। ভাঙনের প্রতিটি পর্যায়েই তারা নিজেদের গড়া বিধিবিধান সংশোধন করেছে, পরিবর্তন-পরিবর্ধন করেছে। কিন্তু তাতেও সেই ভাঙনের সর্বনাশা প্রক্রিয়া থেমে যায়নি। যতই ভেঙেছে, ততই তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে।

তবুও সেই একই ফল। তারা শুধু ভেঙেই গেছে, গড়তে পারেনি কিছুই। ফলে তারা মাঝ সমুদ্রে হালভাঙা তরীর মতো উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যহীনভাবে ভেসে বেড়িয়েছে। পথহারা পথিকের ন্যায় পথে পথে ঘুরে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়েছে, তারপরেও চলা শেষ হয়নি।

আত্মগরিমায় উল্লসিত এবং বিজ্ঞানের সাময়িক সফলতায় উজ্জীবিত মানুষ তার এ ব্যর্থতা ও পরাজয়কে অকপটে স্বীকার করে নিলেই নিজের এবং মানবতার জন্য কল্যাণকর বলে প্রতিভাত হতো। কিন্তু আত্মঅহংকারে নিমজ্জিত এবং মৌলিক মানবীয় গুণ বিবর্জিত অহংকারী মানুষ কখনো সত্যকে স্বীকার করে নিতে পারে না। আর তা যদি হয় নিজের ব্যর্থতা, তাহলে তো কথাই নেই। তাই বিশ্ব মানবতার জন্য দুর্ভাগ্য যে, মানুষ সোজা বুদ্ধিমানের পথে পা বাড়াল না। তারা নিজেদের ব্যর্থতার সকল দায়ভার চাপিয়ে দিতে চাইল ধর্মীয় শিক্ষা, আচার-অনুষ্ঠান ও বিধিবিধানের ওপর।

তারা সকল ব্যর্থতা ও অযোগ্যতার জন্য দায়ী করল ধর্মীয় অনুভূতিকে। ফলে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর একটা অংশ ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ধর্ম ও ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল কিছুই তাদের চোখে বিষে পরিণত হলো। তারা সচেতনভাবেই ধর্মের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল আচার-অনুষ্ঠান বর্জন করে চলতে লাগল। ধর্মের সঙ্গে যা ছিল, তার সবকিছুই তারা ধ্বংস করে দিতে চাইল। যেখানেই তারা ধর্মের গন্ধ পেল, সেখানেই নির্মম আক্রোশের সঙ্গে আঘাত হানল।

এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়া ধর্মমুক্ত হলো। আর এ জন্য হত্যা করা হলো পাঁচ কোটি সাধারন মুসলমানকে। হত্যাকাণ্ডের শিকার হওয়া মানুষগুলো যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামি অনুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল, তা নয়; বরং তারা শুধুমাত্র ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনেই ইসলামি শিক্ষাকে সীমাবদ্ধ রাখতে সচেষ্ট ছিল। এতটুকুও তাদের করতে দেওয়া হয়নি। এই নিরীহ মানুষদের কেবল অপরাধ ছিল, তাদের বোধ-বিশ্বাস ও আচরণে তখনও কিছু ধর্মীয় অনুশাসন ও চিন্তা-চেতনা বিরাজমান ছিল। যেহেতু তাদের সম্পর্ক ও সংশ্লিষ্টতা ছিল ধর্মের সঙ্গে, তাই এরাই সভ্যতার ব্যর্থতার জন্য দায়ী হলো! অতএব তাদেরকে প্রগতিবিরোধী হিসেবে আখ্যায়িত করে জঘন্য নির্মমতার সঙ্গে ধ্বংস করে দেওয়া হলো। এ ছিল ধর্ম, ধর্মীয় অনুশাসন ও মুল্যবোধের প্রতি সৃষ্ট ক্ষোভের স্বাভাবিক বহিঃপ্রকাশ।

ধর্ম ও ধর্মহীন গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘাত পূর্ব থেকেই আছে। পৃথিবীর আদিম ইতিহাসেও এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। কিন্তু মধ্যযুগের এয়োদশ ও চতুদর্শ শতাব্দীতে ইউরোপের অশিক্ষিত বর্বর ক্রুসেডারদের দ্বারা যে নৃশংসতা ও বর্বতা পরিচালিত হয়েছে,

তা বিশ্ব আর কখনো দেখেনি। স্পেনে চার্চ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় আদালত 'ইনকুইজিশন কোর্ট'-এ বাইবেল বিরোধিদের হত্যাকাণ্ড যে জঘন্য বর্বরতায় সম্পাদিত হয়েছে, তা দেখে পশ্চিমা সভ্যতার অনেক জ্ঞানী-গুণী আঁতকে উঠেছেন। একে নির্মম ও বর্বরতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। বিশ্বসাহিত্য ও ইতিহাসের পাতায় পাতায় এর শত শত দলিল উল্লেখিত রয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীতে মানবিক মূল্যবোধ দ্বারা নয়; বরং বিজ্ঞানের মন্ত্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মানুষকর্তৃক যে সংঘাত শুরু হলো, তা বিশ্ব ইতিহাসে সর্বকালের সকল রেকর্ডকে ছাড়িয়ে গেল। এ গোষ্ঠী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল উপায়-উপকরণকে ব্যবহার করে ধর্মীয় মূল্যবোধ, অনুশাসন ও শিক্ষা দ্বারা গড়ে ওঠা হাজার বছরের প্রাচীন সংস্কৃতি, বোধ-বিশ্বাস ও আচার-আচরণকে ভেঙে গুঁড়িয়ে তছনছ করে দিলো। আজকে স্যাটেলাইট প্রযুক্তি, উপগ্রহ সুবিধাসহ তথ্য আদান-প্রদানের বিস্ময়কর মাধ্যমগুলো দিয়ে তারা যেভাবে বিশ্বব্যাপী ইসলাম ধর্মের অনুসারীসহ অন্যান্য ধর্ম ও ভাষাভাষীদের সংস্কৃতিক পরিমণ্ডলকে ধ্বংস করছে, তা এক কথায় অবিশ্বাস্য ও নির্মম।

নির্মম এই কারণে যে, এই সভ্যতা ধর্মের অনুশাসনের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার মাধ্যমে ওই ধর্মীয় গোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ বংশধরদের চিরতরে ধ্বংস করার সূদুরপ্রসারী চক্রান্তে লিপ্ত থেকেছে। এভাবে তারা পৃথিবী থেকে কোনো বিশেষ এক সংস্কৃতি, সামাজিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যকে নির্মূল করে দিয়েছে। শুধু তাই নয়; বরং খুব শীঘ্রই তারাই আবার ধর্মহীন সমাজব্যবস্থা ও তাদের বিশ্বাসপরিপন্থী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ব্যাপক প্রসার, প্রচার ও প্রবর্তনে নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হয়ে গেছে।

খ্রিষ্ট ধর্মের অনুসারীরা তাদের ধর্মীয় রীতি-নীতি থেকে জীবনের সকল কর্মকাণ্ডকে আলাদা করে ফেলে। চার্চ ও যাজক গোষ্ঠীর সীমাহীন শোষণ, অত্যাচার, স্বেচ্ছাচারিতা এবং ধর্মের নামে ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষায় বিবেকবোধ বিসর্জন দেওয়াসহ প্রভৃতি কর্মকাণ্ড সমাজবাদীদের মনে ধর্ম ও চার্চের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও আক্রোশের সৃষ্টি করে। এর ফলে ইউরোপব্যাপী ধর্মের বিরুদ্ধে তুমুল বিদ্রোহ সৃষ্টি হলে সমাধান হিসেবে ধর্ম ও রাষ্ট্রের মধ্যে আপসরফা হয়। সেখান থেকেই ধর্মনিরপেক্ষতার সূত্রপাত। ধর্ম ও ধর্মীয় বিধিবিধানকে ব্যক্তির জীবন থেকে বিদায় করার এ কাজটি করা হলো চমৎকার কিছু চটকদার বুলি এবং শ্রুতিমধুর শ্লোগানের মাধ্যমে। সে শ্লোগান হলো; ব্যক্তিস্বাধীনতা নিশ্চিতকরণ ও মৌলিক মানবাধিকার রক্ষা।

নিজের স্বাতন্ত্র্যবোধ, পৃথক অস্তিত্বের স্বীকৃতি, স্বাধীনতা, মৌলিক মানবাধিকার ইত্যাদি পরিভাষাগুলো প্রতিটি মানব সন্তানের কাছেই প্রিয় বস্তু। বলা যায় সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু। ইউরোপের আপামর জনগোষ্ঠী শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চার্চ, যাজকশ্রেণি ও সামন্তপ্রভু দ্বারা শোষিত ও অত্যাচারিত হয়ে আসছিল। তাই স্বাভাবিকভাবেই তারা এই পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতির জন্য উক্ত বুলি দ্বারা উজ্জীবিত ও প্ররোচিত হলো। ফলে তারা নিজেদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে গিয়ে জীবনে সকল অঙ্গন থেকে ধর্মীয় অনুশাসন, অনুভূতি ও বিধিবিধানকে পুরোপুরি বিসর্জন দিলো। ধর্মকে তারা পরিণত করল ঠাট্টা, বিদ্রুপ ও উপহাসের বস্তুতে। আর এই বিসর্জন তারা প্রকাশ্যে না দিয়ে দিলো কৌশলে।

সেই কৌশলটি হলো, তারা মুখে জাহির করল ধর্মনিরপেক্ষতার কথা; কিন্তু বাস্তবে সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্র থেকে ধর্মকে চিরতরে পাঠিয়ে দিলো নির্বাসনে। আর নিজেদের জাহির করল আধুনিক ও প্রগতিশীল বলে। আর যারা ধর্মকে পুরোপুরি বিসর্জন না দিয়ে ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক জীবনে আংশিকভাবে হলেও মেনে চলার চেষ্টায় নিয়োজিত রইল, তাদেরকে চিহ্নিত করল পশ্চাৎপদ, প্রগতিবিরোধি ও প্রতিক্রিয়াশীল হিসেবে। এ সময়ে সমাজের জ্ঞানী-গুণী বলে পরিচিত ও বিবেচিত গোষ্ঠী নিজেদের লেখনি, সাহিত্যকর্ম ও বক্তৃতায় ধর্ম ও ধার্মিকদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষ বাড়াতে থাকল। সরকারও তার পৃষ্ঠপোষকতায় বিন্দুমাত্র কৃপণতা করল না। ফলে অচিরেই এই ধর্মনিরপেক্ষ সমাজের বৃহত্তর গোষ্ঠীর জীবন থেকে ধর্ম এক রকম নির্বাসিতই হয়ে গেল।

ব্যক্তি স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করার জন্য নিজেদের চিন্তা-চেতনা, মন-মগজ, জীবন, পরিবার ও সমাজ থেকে তারা ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ধর্মকে নির্বাসিত করল। এতে তারা স্বাধীনতা পেয়েছে বলে আত্মপ্রসাদের ঢেকুরও তুলল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এরা এক অনাচারকে দূর করতে গিয়ে আরও বড়ো ধরনের অনাচারের জন্ম দিয়ে বসল। সূক্ষ্ম বিচারে দেখা গেল যে, তারা সেই কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা তো পেলই না; বরং পরাধীনতা আরও বেশি ভয়ংকর ও প্রকট আকার ধারণ করে তাদের ওপর আঁচড়ে পড়ল। আবদ্ধ হয়ে পড়ল লালসা আর প্রকৃতির শৃঙ্খলে। নিজের ওপর সকল ধরনের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তারা ভোগবাদী ও ইন্দ্রিয় সর্বস্ব ধ্যানধারণার অধীন হয়ে পড়ল।

এখানেই শেষ নয়, আল্লাহর প্রয়োজন নেই মনে করে মানুষ কার্যত আল্লাহকে অস্বীকার করে বসল। ফলে তাদের মন ও মননে নিজের অলক্ষ্যেই আসন গেড়ে বসল এক মেকি স্রষ্টা বা ইলাহ। তাদের অস্তিত্ব ও চেতনার সবটুকুই এই ইলাহর পুরোপুরি অধীনস্থ হয়ে পড়ল। তাদরে এই নতুন স্রষ্টা বা ইলাহর নাম হলো 'বিজ্ঞান'।

সে আল্লাহর বাণী হুকুম-আহকামকে অস্বীকার করে বিজ্ঞানের সকল তথ্য ও আবিষ্কারকে প্রশ্নাতীতভাবে অনুসরণীয় বলে ভেবে বসল। আর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে এই বিজ্ঞানেরই অনুসরণ করতে থাকল। বিজ্ঞানের সমস্ত তথ্যকে সে অহির মতো বিবেচনা করতে লাগল।

আর এভাবেই তারা নিজেদের অজান্তেই বহুরূপী ও সদা পরিবর্তনশীল বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার দাসে পরিণত হলো। তারা এই বিজ্ঞানের নামে যাবতীয় অনাচার ও স্বার্থপরতাকে মেনে নিয়েই দাসত্ব করে যেতে লাগল। কেননা, শূন্যস্থান কখনো শূন্য থাকে না, তা পুরণ হবেই। মানুষের মন থেকে আল্লাহর বিশ্বাসকে বাদ দেওয়ার ফলে যে শূন্যতার সৃষ্টি হলো, অনিবার্যভাবেই তা অন্য এক বিশ্বাস ও আস্থা দিয়ে পূরণ হতে বাধ্য হলো। এভাবেই মানুষ পূর্বের চেয়ে আরও বেশি পরাধীন হয়ে পড়ল। ভেতর-বাহির, চিন্তা-চেতনা, বোধ-বিশ্বাসসহ সকল দিক থেকেই তারা নিজেদের স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলল। এর মধ্য দিয়েই শুরু হলো তাদের বিপর্যয়ের প্রথম স্তর।

যেহেতু তারা অহির জ্ঞানকে অস্বীকার করল, তাকে বর্জন করল এবং এ জ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা হাজার বছরের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে নিজ হাতে ধ্বংস করে ফেলল, তাই তাদের সার্বিক চরিত্রই বদলে গেল। চরিত্র যদি একজন মানুষের বোধ-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনাকে প্রকাশ করে থাকে, তবে অবশ্যই সংস্কৃতি একটি জাতির বোধ-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনার প্রকাশক। কেননা, সংস্কৃতিই হলো একটি জাতির চরিত্র। যে জাতি বা গোষ্ঠী তার সংস্কৃতিকে ভেঙেছে, সে তার চরিত্রকেই ভেঙেছে। এ অবস্থায় তাদের দৃষ্টির সম্মুখ থেকে জীবনের উন্নত, সুস্পষ্ট ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য আড়াল হয়ে গেল। তারা জানতেই পারল না, তাদের জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী? এর চূড়ান্ত গন্তব্য কোথায়?

এ রকম বিপর্যস্থ পরিস্থিতিতেই তাদের জীবনযাপন করতে হলো। জীবনের বিভিন্ন বাঁকে বাঁকে উদ্ভাবিত মনের সকল প্রশ্নের জবাব নিজেকেই খুঁজতে হলো। সীমিত জ্ঞান, বিচার ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা দিয়ে তারা এই বিশ্ব মাখলুকাত, এর উৎপত্তি, অবস্থান, পরিণতি ইত্যাদি বিষয়কে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করতে লাগল। ফলে অনিবার্যভাবেই তারা প্রথম স্তর পেরিয়ে বিপর্যয়ের দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হলো।

এ ক্ষেত্রে কেবল অহির জ্ঞানই পারে পৃথিবী ও ভূমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত সকল কিছুর সঠিক ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ দিতে, এসবের পরিচয় ও পরিণতিকে সুস্পষ্ট করে তুলতে।

কারণ, যে সত্তা এগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, কেবল তাঁরই এর গুঢ় রহস্য জানার কথা। তিনিই জানবেন, কার অবস্থান কোথায়, কখন, কতটুকু ও কীভাবে সঙ্গত হতে পারে। কারণ, তিনিই এসবের একমাত্র স্রষ্টা। মানুষ এ বিশ্ব মাখলুকাতের কিছুই সৃষ্টি করেনি; বরং নিজেই অসংখ্য সৃষ্টির মধ্য হতে একটি সৃষ্টিমাত্র। কাজেই এ বিশ্ব জগতের অন্যান্য জীব-জন্তু ও বস্তুর মতো মানুষও জানে না কীসে তার কল্যাণ-অকল্যাণ নিহিত। তার অবস্থান কোথায়, কীভাবে, কতটুকু সঙ্গত আর কোন পর্যায়ে গেলে তা অসঙ্গত? সে ব্যাপারেও তার কোনো ধারণাই নেই। অথচ মূর্খতা, অহংকার এবং অসঙ্গত আত্মবিশ্বাসের কারণে মানুষ নিজের এবং পারিপার্শ্বিক সকল কিছুর কল্যাণ-অকল্যাণের সার্বিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। তাদের জন্য প্রয়োজনীয় বিধিবিধান নিজের মতানুযায়ী করতে দুঃসাহস করেছে।

যেহেতু মানুষের নিকট ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণের শাশ্বত ও চিরন্তন কোনো জ্ঞান ও আদর্শ নেই; নেই আদর্শের মানদণ্ডও, তাই তারা এখানেও নিদারুণভাবে ব্যর্থ হলো। ব্যর্থ হওয়ারই কথা। কারণ, তারা পরম উল্লাসে বিজ্ঞানের যে জ্ঞানকে নিজের ও বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণকর ভেবেছে, সময়ের বিবর্তন ও পরিবর্তনে নতুন আরেকটি আবিষ্কারের ফলে সে জ্ঞানটিই হয়ে গেছে মানবতার জন্য অকল্যাণের উৎস, ক্ষতিকর।

ফলে মানুষ নিজে থেকেই এই ঘোষণা দিচ্ছে যে, গতকালের দেওয়া তাদের ঘোষণাটি ভুল ছিল; বরং আজকের এই নতুন আবিষ্কারটিই সঠিক। অথচ গতকালও তারা এই ভুলটিকে সাফল্য বলে আনন্দে উৎফুল্ল ছিল। যে সাফল্যকে(?) সাফল্য বলে বিশ্বব্যাপী বাহবা কুড়িয়েছে, সেই সাফল্যকেই তারা বাস্তবতার নিরিখে আজ ব্যর্থতা বা ভুল হিসেবে চিহ্নিত করল এবং ঘৃণাভরে বর্জনও করল! দুঃখের বিষয় হলো, প্রতিদিনই তাদের চরিত্রে এ ধরনের স্ববিরোধিতা ও দুর্বলতা উন্মোচিত হতে থাকলেও ভুলকে ভুল এবং অক্ষমতাকে অক্ষমতা বলে স্বীকার তারা করেনি। এটাই মানবতার জন্য সবচেয়ে বড়ো ট্রাজেডি!

নুতন এ আবিষ্কারটিও একদিন ভুল বলে দেখা দিলো, বর্জনীয় বলে বিবেচিত হলো। এভাবে মানবসভ্যতা একের পর এক ধ্বংসের দিকে এগোলো। মুক্তির কোনো পথই তারা পেল না। নিজের হাতের গড়া অনাচার আর অকল্যাণের মধ্যে নিজেরাই হাবুডুবু খেতে লাগল। তাদের সম্মুখে আলোর কোনো উৎসই বাকি রইল না। চারিদিকে শুধু আঁধার আর আঁধার, জমাট বাঁধা আঁধার, যার নাম হলো জাহেলিয়াত।

এই জাহেলিয়াত পূর্বের মতো অজ্ঞতার জাহেলিয়াত নয়; বরং বৈজ্ঞানিক জাহেলিয়াত। বিজ্ঞানের মোড়কে এ জাহেলিয়াত পুরো পশ্চিমাজগৎ তো বটেই, এমনকী মুসলিম বিশ্বকেও ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলল।

এ আগ্রাসন বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে কাজে লাগিয়ে মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবনকে তছনছ করে ফেলল। যেভাবে তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনকে ইতঃপূর্বেই বিপর্যস্ত করে ফেলেছিল। ফলে বিশ্বব্যাপী মানবসভ্যতার সকল উপায়-উপকরণ ও ব্যবস্থাগুলো ধ্বংসের শেষ পর্যায়ে এসে ঠেকল। চূড়ান্ত আঘাত এলো ইসলামি দর্শনভিত্তিক সমাজের ওপর (দুর্বলভাবে হলেও ততদিনে যতটুকু টিকে ছিল)। অহির শিক্ষাভিত্তিক সমাজ-সভ্যতা গঠনের যে সম্ভাবনা এ সভ্যতাকে চূড়ান্ত ধ্বংসের হাত থেকে কোনোমতে বাঁচিয়ে রেখেছিল, সর্বশেষে ইসলামি সংস্কৃতির ওপরে এ আঘাতের ফলে বিশ্ব সভ্যতার সামনে সে সম্ভাবনাটুকুও যেন আর অবশিষ্ট রইল না।

পালাবদল

কিন্তু না, এ অবস্থায় মহামহিম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর অপার ও অসীম রহমতের পুনঃপ্রকাশ ঘটালেন। বিশ্ব মানবতার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কর্তৃক নির্ধারিত একমাত্র ধর্ম আবার তার মোজেজা দেখাল। ইসলামের অন্তর্নিহিত শক্তির কারণে এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকেই শোনা গেল পুনর্জাগরণের ডাক। শতাব্দির মুয়াজ্জিনের আজান! পাক-ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে শুরু করে আরবভূমি, আফ্রিকা, এমনকী ইউরোপ আমেরিকাতেও বিভিন্ন মুসলিম ব্যক্তিবর্গ ইসলামি জাগরণের ডাক দিলেন। জীবনের সমস্ত ত্যাগ-তিতিক্ষা, চেষ্টা-প্রচেষ্টা, চিন্তা-চেতনা দিয়েই এই ধ্বংসস্তূপে দাঁড়িয়ে নতুন করে আহ্বান জানালেন। মুষড়ে পড়া মুসলমানদের সামনে আবার ইসলামের সেই চির শাশ্বত বোধ-বিশ্বাস এবং নিজেদের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও দায়িত্বানুভূতিকে নতুন করে জাগিয়ে তুললেন। এ সময়েই ইসলামি বিশ্বে জন্ম নেওয়া কয়েকজন ক্ষণজন্মা চিন্তাবিদ, বিদগ্ধ পণ্ডিত ব্যক্তি ইসলামের বিধান ও তার শিক্ষাকে সহজ সাবলীল ও বোধগম্য ভাষায় বক্তৃতা, লেখনি ও সাহিত্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুললেন। হীনমন্যতায় আক্রান্ত মুসলিম যুবসমাজের নিকট ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও উপযোগিতা, সেইসঙ্গে পশ্চিমা দর্শনের অসারতা, ত্রুটিসমূহকে প্রাঞ্জল ভাষায় যুক্তি-প্রমাণসহ তুলে ধরলেন। ফলে শত বছরের জড়তা কাটিয়ে আবারও হতাশায় নিমজ্জিত হতোদ্যম মুসলিম জনমানস জেগে উঠল।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন কেয়ামত পর্যন্ত চালু থাকবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর এই ভবিষ্যদ্‌বাণীর বাস্তব প্রমাণ আমরা ইতিহাসের এ প্রান্তে এসে দেখতে পেলাম। ইসলামি সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশীদের প্রত্যাশাকে মহান আল্লাহ ব্যর্থ করে দিলেন না।

পরিবেশ পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল হোক না কেন, ঘন কালো নিকষ আঁধারের পর্দা সরিয়ে ইসলামের স্বর্ণোজ্জ্বল প্রভাত আনার জন্য প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গেল। বিংশ শতাব্দির প্রথম থেকেই বিশ্বের কোণে কোণে রাসূল ﷺ-এর আদর্শের অনুসারী অর্থাৎ মুসলিম উম্মাহর একটা বড়ো অংশ সমস্ত জাহেলিয়াতকে উপক্ষো করে, বাতিলের সকল হুমকি ধামকি আর রক্তচক্ষুর প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে, প্রাণের মায়া বিসর্জন দিয়ে ইসলামের সেই বিপ্লবী কালেমাকে মুখে নিয়ে বুকটান করে দাঁড়িয়ে গেল।

লক্ষ্য উদ্দেশ্য একটাই- তারা আল্লাহর দেওয়া এ জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী করবেই। সমস্ত জুলুম, শোষণ আর নির্যাতনের অবসান ঘটিয়ে তারা রাসূল ﷺ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মদিনার মতো এক শোষণহীন সুখী, সমৃদ্ধিশালী ও শান্তির সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করবে। যা হবে সর্বজনীন সৌহার্দ্য ও প্রগতির প্রতীক। এ পৃথিবীকে পুনরায় তারা প্রতিটি মানব সদস্যের জন্য নিরাপদ ও বাসযোগ্য করে গড়ে তুলবে। এ শপথ নিয়েই তুরস্ক-মিসর-জর্দান-সিরিয়া-আলজেরিয়া-কুয়েতসহ মধ্যপ্রাচ্যর প্রায় প্রতিটি দেশে, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্থান-ইন্দোনেশিয়া-মালয়েশিয়া এসব জানবাজ মুসলমানরা ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাস্তব ও যুগোপযোগী কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নেমেছে। এমনকী ইউরোপের বুকে যুক্তরাজ্য-ইটালি-জার্মানি-ফ্রান্সসহ অন্যান্য দেশে এবং আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে কট্টর মুসিলম বিদ্বেষী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঘোর প্রতিকূল সমাজ, জনগোষ্ঠী ও পরিবেশেও কর্মসূচি নিয়ে মাঠে নেমেছে।

প্রথম দিকে তাদের কেউ আমলে নেয়নি, হিসেবের মধ্যে ধরতেও চায়নি। কিন্তু সমাজের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইসলামি সমাজব্যবস্থার স্বপ্নে বিভোর কিন্তু নিষ্ক্রিয় হতোদ্যম সেই জনগোষ্ঠী এবারে সকল জড়তা কাটিয়ে সচল হয়ে উঠল। চলমান এই ইসলামি আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলো। দিনে দিনে সংখ্যার দিক থেকে তাদের যেমন বৃদ্ধি ঘটতে থাকল, তেমনি ইসলামের মানসম্পন্ন প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রেও তারা অগ্রগতি অর্জন করতে থাকল। বিগত প্রায় সাত-আটটি দশক ধরে চলতে থাকা এসব আন্দোলন নিজ নিজ দেশে, তথা বিশ্বের কোণে কোণে এক শক্ত গণভিত্তি তৈরি করতে সমর্থ হয়েছে আল্লাহর রহমতে।

মুসিলম অধ্যুষিত দেশগুলোতে শত শত বছরের নিষ্ক্রিয়তা ও জড়তা ভেঙে মুসলমানরা নিখাঁদ ইসলামি আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে সংঘবদ্ধভাবে নিজেদের জীবনের সকল সুখ ও আরামকে বিসর্জন দিয়ে এ বিশ্বে ইসলামের শাশ্বত বিধানকে পুনরায় প্রতিষ্ঠাকল্পে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে এ লক্ষ্যে আন্দোলন চলছে। শুধু ধর্মীয় দিককে কেন্দ্র করে নয়;

বরং জীবনের সার্বিক দিককে কেন্দ্র করে শুদ্ধি অভিযান চালানো হচ্ছে। আন্দোলন পরিচালনাকারী নেতৃবর্গ, এর কর্মী ও সকল অনুসারীদের নিষ্ঠা ও সদিচ্ছার কারণে এখন এ আন্দোলন সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। দলে দলে মুসলমানরা তাদের এতদিনের নিষ্ক্রিয়তা ছেড়ে ইসলামের সঠিক দর্শন ও শিক্ষাকে বুঝে নিতে এবং সে অনুযায়ী পরিচালিত হতে প্রস্তুত হচ্ছে।

ব্যক্তি যখন তার জীবনদর্শন সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পেয়ে যায়, তখন সে জীবনের সকল দিক ও কর্মকাণ্ডকে নিজ দর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে সাজাতে চায়। তাই দেখা যাচ্ছে মুসলমানদের মধ্যে যতই সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই তারা ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, লেন-দেন, চলা-ফেরাসহ সবকিছুই ইসলামি শিক্ষার সঙ্গে মিলিয়ে ইসলামিকরণ করে তুলছে।

এ ক্ষেত্রে তাদের ছোটো-বড়ো ত্রুটি অবশ্যই আছে। তবে সেগুলো এখানে আসল বিষয় নয়। এখানে মুখ্য বিষয় হলো, ইসলামিকরণের এই যে প্রচেষ্টা ও ইচ্ছা, যা প্রতিদিনই গতিশীল হচ্ছে, তার ফলে প্রতিদিনই এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে মুসলমানদের বেশি বেশি সম্পৃক্ততা ঘটছে। বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ও এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সোৎসাহে যোগ দিচ্ছে। ফলে এ প্রক্রিয়ায় আন্দোলন তার মানের দিক থেকে আরও বেশি নিখুঁত ও ত্রুটিমুক্ত হয়ে উঠছে। নতুন নতুন ইসলামি বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে। এর ফলে বিশ্বজুড়ে অতি দ্রুততার সঙ্গে গভীর ও তাৎপর্যবহ পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছে।

এসব পরিবর্তনের মধ্যে অন্যতম হলো, মুসলমানদের মন-মানিসকতায় সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এতদিন মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনা, শিক্ষা-সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলামকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একটি ধর্ম ভাবত মাত্র! কিন্তু এখন ইসলামকে ধর্ম হিসেবে নয়; বরং জীবন-সমাজ-রাষ্ট্র ইত্যাদির অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য অংশ হিসেবেই ভাবতে শিখেছে। তারা আজ ধর্মকে জীবন ও সমাজ থেকে পৃথক, খণ্ডিত করে দেখতে প্রস্তুত নয়। একটা আদর্শবাদী জাতি এবং তার আদর্শের পুনরুজ্জীবনের জন্য ওই জাতির সদস্যদের চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতায় এ ধরনের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি অন্যতম পূর্বশর্ত। পুরো জাতির পূনরুজ্জীবনের জন্য তার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এ রকম সচেতন সম্পৃক্ততার কোনো বিকল্প নেই!

দৃষ্টিভঙ্গিতে যখন সচেতনতা এসে দাঁড়ায়, তখন ব্যক্তি তার জীবনের লক্ষ্য তন্মধ্যে এবং তা অর্জনের পথ ও পদ্ধতিতে পুরোমাত্রায় নিষ্ঠাবান ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে, মুসলমানদের ক্ষেত্রে এ সত্য আরও বেশি অকাট্য হয়ে দেখা দেয়।

তাই যেসব মুসলমান নিষ্ক্রিয়তা ছেড়ে ইসলাম চর্চা, প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করে, তারা সমাজ ও সভ্যতায় যার যার অবস্থান থেকে নিজ নিজ জীবন ও পরিমণ্ডলকে নিজ আদর্শ-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে সেই ধাঁচে সাঁজিয়ে তুলতে তৎপর হয়। এ ক্ষেত্রে সকল শক্তি, সম্পদ ও মেধা উজাড় করে দেয়।

ফলে সমাজে ইসলামি আদর্শকে ধারণ করে সামাজিক, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো, যেমন স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত, সংগঠন ও সমিতি গড়ে ওঠে। এগুলো ইসলামি সমাজ গঠনে অতিব গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। বিশ্বজুড়ে ইসলামি শরিয়াভিত্তিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় অসামান্য-অভাবনীয় সাফল্য এবং অগ্রগতি তার সবচেয়ে বড়ো প্রমাণ। আজ হতে বেশ কয়েক বছর আগে শরিয়াভিক্তিক ইসলামি ব্যংক প্রতিষ্ঠার কথা যারা বলতেন এবং লিখতেন, তারা বিজ্ঞ-বুদ্ধিজীবি সমাজের দ্বারা নিদারুণভাবে তিরস্কৃত হতেন। অথচ মুসলমানদের সেই নিষ্ঠাবান গোষ্ঠী বিশ্বে ইসলামি শরিয়াভিত্তিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনা করে দেখিয়ে দিলেন। আজ সমগ্র বিশ্বজুড়ে সুদভিত্তিক অর্থ-ব্যবস্থার পাশাপাশি সুদবর্জিত ইসলামি আদর্শ ও শিক্ষাভিত্তিক ব্যাংক-বিমা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অত্যন্ত সফলভাবে চালু আছে এবং অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে সারাবিশ্বের কোণে কোণে বিস্তার লাভ করছে। কোটি কোটি মানুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষ ইসলামি অর্থব্যবস্থার সুফল প্রত্যক্ষ করার পাশাপাশি ভোগও করছে। এটা সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার গালে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাতই বটে!

বিশ্বের সাংস্কৃতিক অঙ্গনে যে আশঙ্কাজনক নীতি-নৈতিকতাহীন ও বিবেকবর্জিত অসভ্য যৌনতা নির্ভর ধারা চালু হয়েছে, তা মানুষের সকল বিবেকবোধ ও সৎ প্রবৃত্তিসমূহকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এ ধারা ঠেকিয়ে দেওয়ার একমাত্র কার্যকর ও উপযুক্ত পথ হিসেবে বিশ্বজুড়ে ইসলামি শিক্ষা ও দর্শনভিত্তিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড চালু হয়েছে। যা অশ্লীল ও পরিচ্ছন্ন রুচিবোধসম্পন্ন, যা মানুষের বিবেকবোধকে জাগ্রত করে, শাণিত করে এবং মানবতাবোধকে উজ্জীবিত করে।

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের এ ধারা আজ সারাবিশ্বে, বিশেষ করে, মুসলিম দেশসমূহে খুব সহজেই অনুভব করা যায়। ইসলামি ও সুস্থ সমাজ গঠনে এ সংস্কৃতি অন্যতম কার্যকর শক্তি। যদিও এটা রাজনৈতিক কোনো কর্মকাণ্ড নয়, তবুও জনজীবন ও গণমানসে এর সদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ছে। মানুষ ইসলামের পাবন্দ হচ্ছে। বিশেষ করে, ভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানের পুঁতিগন্ধময় রস সিঞ্চনে যারা নিষ্ক্রিয় হয়ে যেতেন, সেইসব মুসলমানরাই সক্রিয় হয়ে উঠছেন। আর এসব মুসলমানরা যখন বাস্তব জীবনে নিষ্ঠাবান হয়ে উঠছেন, তখনই আদর্শবাদী বিপ্লব সাধনের পথে এক কদম অগ্রগতি হচ্ছে!

বিশ্ববাসী বিভিন্ন মতবাদের আওতায়ই বহুদিন ধরে শান্তি-নিরাপত্তা, সুখ ও সমৃদ্ধি চেয়েছে। বিবেকের স্বাধীনতা আর মানসিক প্রশান্তি চেয়েছে। পারিবারিক অখণ্ডতা. অর্থনৈতিক সাম্য, স্বাধীনতা, সামাজিক প্রগতি ও সমৃদ্ধি চেয়েছে। কিন্তু বর্তমান বিশ্বের দেশে দেশে বিরাজমান অবস্থা দেখে খুব সহজেই এটা বোঝা যায় যে, কোনো মতবাদই পৃথিবীতে মনুষ্য প্রজাতিকে এ কাঙ্ক্ষিত সুখ দিতে পারেনি। ফলে বিশ্বসমাজের প্রতিটি মানুষের মনে হতাশাজনিত এক বিরাট শূন্যতা চেপে বসেছে। সকল বিত্ত-বৈভব ও প্রাচুর্যসহ মনের এ শূন্যতা মানুষকে গ্রাস করে রেখেছে।

পৃথিবীতে কোনো শূন্যতাই শূন্য থাকে না, পদার্থবিদ্যার সূত্রও তাই বলে। এরই প্রতিফলন আমরা বাস্তবে দেখছি। আদর্শিক ও মানসিক শূন্যতা, হৃদয় ও মনের সীমাহীন হাহাকার আর একরাশ প্রশ্ন নিয়ে উন্মুখ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সামনে যখনই ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্বকারী কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এসে দাঁড়িয়েছে, তখনই এসব বুভুক্ষ মানুষ ইসলামের শিক্ষাকে সাত রাজার ধন মনে করে লুফে নিয়েছে। মনে হয় যেন এরই প্রতীক্ষায় তারা এতদিন ছিল!

সত্যের জয় দিকে দিকে

বিবিসি (BBC) ওয়ার্ল্ডের টেলিভিশন চ্যানেলে ২৭ শে আগস্ট ১৯৯৬-তে প্রচারিত নওমুসলিম যুবকের একটি সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য করছি। সেখানে এক ব্রিটিশ নওমুসলিম তার জীবনের নবতর পরিবর্তনের কথাটি বলেছিলেন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন–

> 'আমাদের জীবনে শান্তি ছিল না। শান্তির খোঁজে নাইট ক্লাবে যেতাম। মদ-গাঁজা, হেরোইন সব খেয়েছি। মার-ধর, খুন-খারাবি সব করেছি; কিন্তু শান্তি পাইনি। শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়ে কারাগারে এলাম। এখানে এসে ভাই মুরাদ উদ্দিনের নিকট জানলাম আমি কে? কেন আমাকে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে? কী আমার দায়িত্ব? ঈমান আনলাম, এখন আমি মুসলমান। যখন কুরআন পড়ি, তখন মনে হয় প্রতিটি আয়াত আমার জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান দিচ্ছে। যখন নামাজ পড়ি, তখন মনে হয় পরম এক প্রশান্তিতে মায়ের কোলে বিশ্রাম নিচ্ছি। আমি ইসলামে জীবনের প্রতিটি সমস্যার সমাধান খুঁজে পেয়েছি। ইসলামে খুঁজে পেয়েছি আমার সেই কাঙ্ক্ষিত শান্তি।[৭৫]'

নওমুসলিমের এই বক্তব্যেই রয়েছে সেসব বুভুক্ষ মানুষের হৃদয়ের কথা। এই বক্তব্য থেকে এটা বোঝা যায় যে, উক্ত নওমুসলিম ব্যক্তি কারাগারের ভেতরে জনৈক নিষ্ঠাবান মুসলমান মুরাদ উদ্দিনের সংস্পর্শে এসে ইসলাম সম্পর্কে জানতে পারেন। মুরাদের শিক্ষা ও আচার-আচরণ তাকে মুগ্ধ করে, তার মনের কাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের জবাব দান করে। ফলে তিনি তার কাছে মুসলমান হন।

বিবিসিতে প্রচারিত উক্ত টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে দেখানো হয় যে, ইমাম মুরাদ উদ্দিন নামে এক মুসলিম যুবককে ইংল্যান্ডের কারাগারে কয়েদি হিসেবে ঢোকানো হয়। ইসলামি আর্দশ ও শিক্ষার সঠিক প্রতিনিধিত্বকারী এই মুসলমান যুবক কারাগারে প্রতিকূল পরিবেশেও ইসলামকে নিষ্ঠা আর একাগ্রতার সঙ্গে সঠিকভাবে পালন করতে থাকেন। তাঁর সুমহান চরিত্র, উন্নত ব্যবহার আর হৃদয়ের প্রশান্তি কারাগারের অন্যান্য ইংরেজ-খ্রিষ্টান কয়েদিদের নিকট আসলেই এক বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। তাদের কাছে এটাই ছিল সকল আকর্ষণ ও মনযোগের কেন্দ্রবিন্দু। একজন মাত্র নিষ্ঠাবান মুসলমানের সংস্পর্শে এসে জেলখানার ভেতরে তিনশত পঞ্চাশজন খ্রিষ্টান ইংরেজ কয়েদি মুসলমান হয়ে গেছে। তারা জেলখানার ভেতরে থেকেও নিজেদের পুরো জীবনকেই এই নতুন শিক্ষা আর আদর্শের সঙ্গে বিন্যস্ত করে নিয়েছে। এ ব্যাপারে তৃতীয় কোনো দায়িত্বশীল পর্যায়ের ব্যক্তির মন্তব্য আমরা দেখতে পারি। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী রিপোর্টার জেলখানার সুপারকে এ বিপুল সংখ্যক কয়েদির ধর্মান্তকরণের ফলে সেখানকার বর্তমান পরিবেশ ও তাদের আচরণের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলেন। জবাবে তিনি বলেছিলেন–

> 'এই কয়েদিরা আগে জেলখানার ভেতরেই চেঁচামেচি করত। সবসময়ই আমাকে তটস্থ থাকতে হতো, না জানি, কখন কী দুর্ঘটনা ঘটে। কিন্তু এরা এদের ধর্ম পরিবর্তন করে মুসলমান হওয়ার পরে একেবারেই বদলে গেছে। নামাজ পড়ে আর সারাদিন এরা ধর্মালোচনায় এবং ইবাদাতে কাটায়। খুব শান্ত সবাই। আমার মনেই হয় না যে জেলখানায় কোনো কয়েদি আছে। এখন আমাকে সবসময় আর আগের মতো টেনশনে থাকতে হয় না।'[৭৬]

আগামীর বিশ্ব কী হবে, কোনো পথে যাবে তা ব্যাখ্যা করার জন্য দূরদর্শী সমাজ বিজ্ঞানীদের নিকট এই একটি মাত্র ঘটনাই যথেষ্ট। বর্তমান ইংল্যান্ডের মাটিতে ইতোমধ্যেই ইসলাম শক্ত আসন গাড়তে সক্ষম হয়েছে। সেখানে আজ ২০ লাখ মুসলমান বাস করে, যার মধ্যে দশ লাখই হলো ইংরেজ মুসলমান। ১৯২০ সালে যে ইংল্যান্ডে মসজিদ ছিল মাত্র ৪টি, সেই ইংল্যান্ডেরই আনাচে-কানাচে আজ গড়ে ওঠেছে প্রায় ১৩০০ মসজিদ। এ ছাড়াও গড়ে ওঠেছে শত শত ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সমাজের গভীর হতে আশ্চর্যজনকভাবে এ পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। প্রতিদিনই সেখানে মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলামি ব্যবসা-বাণিজ্য, সংস্কৃতি, আচার-আচরণ রসম-রেওয়াজ আজ সেখানে অপরিচিত কিছু নয়; বরং ইংল্যান্ডের সমাজ জীবনে ইসলাম যেন অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে! খ্রিষ্টানদের সমাজব্যবস্থা যতই ধ্বংসের দিকে ধাবিত হচ্ছে, ততই জোয়ারের পানির মতো তারা ধেয়ে আসছে ইসলামের ছায়াতলে।

দূরদর্শী ও সূক্ষ্ম অনুভূতি শক্তিসম্পন্ন আইরিশ দার্শনিক ও লেখক জর্জ বার্নাডশ' আজ হতে বহুদিন পূর্বেই এ সত্যটি উপলব্ধি করে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন–

> 'England in particular and the rest of the Western world in general are bound to embrace Islam.
> সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব, বিশেষ করে, ইংল্যাণ্ড ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য।'

ইংল্যান্ডের অনতিদূরে জার্মানিতেও সেই একই অবস্থা। সেখানে দলে দলে মানুষ ইসলামের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করছে, বিশেষ করে মহিলারা। মহিলারা যেন ইসলাম গ্রহণের জন্য পাগল প্রায়। একটি ব্যাংকের ঘটনা। ওই ব্যাংকের মহিলা কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই মুসলমান হয়েছে। তাদের অনেকের স্বামী এখনও খ্রিষ্টান। ওরা ইসলাম গ্রহণের পর অনেক সময়ই বাধ্য হয়ে তাদের স্বামীরাও ইসলাম গ্রহণ করে।

এক নওমুসলিম জার্মান মহিলার বক্তব্য–

> 'একটি মেয়ে যখন মুসলমান হয়, তখন সে মনে যে পরিমান শান্তি পায়, তাতে মনে করে যে, পৃথিবীতে স্বর্গ বলতে যদি কিছু থাকে- তাহলে সেটা ইসলাম গ্রহণের পরেই অর্জন করা যায়।'

পুরো জার্মানিতে এখন প্রায় চল্লিশ লাখ মুসলমান বাস করে।[৭৭] জার্মানির আনাচে-কানাচে এসব মুসলমানরা নিজেদের উদ্যোগে ও ব্যবস্থাপনায় হাজারো স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা-মসজিদ, ক্লিনিক, কমিউনিটি সেন্টার ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করছে।

অপর দিকে আটলান্টিকের অপর পাড়ের দেশ মার্কিন মুল্লুকে বর্তমান বিশ্বে সবচেয়ে দ্রুতগতিতে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ছে। সমাজের প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি ক্ষেত্রে সেখানে ইসলামের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও দর্শনের সরব উপস্থিতি লক্ষ্যণীয় পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। ইসলাম সেখানে এক নীরব বিপ্লব সাধন করতে চলছে। সাম্প্রতিক এক নির্ভরযোগ্য হিসেবে দেখা গেছে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা এক কোটি ছাড়িয়ে গেছে।[৭৮]

অন্য এক হিসেবে দেখা যায় যে, বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর গড়ে প্রায় এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করছেন। সেখানে আল কুরআন বা তার অনুবাদ গ্রন্থ বেস্ট সেলার পর্যায়ে এসে দাঁড়িছে। এই বিপুল সংখ্যক মুসলমান জনগোষ্ঠী মার্কিন সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।

তারা নিজেদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও কৃষ্টি-কালচারের পরিমণ্ডলকে গড়ে তুলছে ইসলামি আকিদা-বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই।

মুসলমান জনগোষ্ঠী মার্কিন সমাজজীবনে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করেছে, তা বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ঠ যে, ১৯৯৭ সালের নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন সরকারিভাবে ঘোষণা করেছেন যে–

> 'ফেডারেল গভর্নমেন্টে যারা চাকুরি করেন, সেই সমস্ত মুসলমানরা যদি অফিসে ধর্মীয় পোশাক পরে আসতে চায়, আমাদের কোনো বাধা নাই। যদি মুসলমানরা কুরআন শরিফ অফিসে পড়তে চায়, এসে পড়তে পারে। তারা যদি অন্য ধর্মাবলম্বীদের মুসলমান করতে চায়, তাহলে তাদের অনুমতি নিয়ে করতে পারে।'

অপরদিকে এখন হোয়াইট হাউজে প্রতি রমজানেই মার্কিন প্রেসিডেন্টের পক্ষ হতে ইফতার পার্টি দেওয়া হয়। মার্কিন সৈন্যবাহিনীর সদস্যদের জন্য হালাল খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সৈন্যবাহিনীতে মুসলিম ইমাম নিয়োগ দানের সুযোগ রাখা হয়েছে। এগুলো স্পষ্টতই এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ইঙ্গিতবাহী বিষয়।

প্রাচ্যের শিল্প ও কারিগরি দিক থেকে সবচেয়ে উন্নত দেশ জাপানেও ইসলাম দ্রুত বর্ধনশীল ধর্মে পরিণত হয়েছে। দলে দলে জাপানি নারী-পুরুষ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়ে ধন্য হচ্ছে। জাপানের রাজধানী টোকিওর প্রাণকেন্দ্রে বিশালকায় মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থেকে ইসলামের গর্বিত উপস্থিতির সাক্ষ্য দিচ্ছে। জাপানের প্রখ্যাত ক্যানসার বিশেষজ্ঞ কিতোকি, জাপানের প্রখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী ডা. কিয়া শুধু ইসলাম গ্রহণ করেই থেমে যাননি; বরং জীবনের সকল সম্পদ শ্রম-মেধা দিয়ে তাদের প্রিয় জন্মভূমিতে ইসলামের প্রসারে নিবেদিত হয়েছেন। ড. কিয়া টোকিও ইসলামিক সেন্টারের পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন। আর নিবেদিতপ্রাণ মুসলিম মুবাল্লিগ চিকিৎসক ড. কিতোকি আছেন ইসলাম প্রচারের কাজে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই এক ডা. কিতোকির হাতেই এ পর্যন্ত বারো হাজারেরও বেশি কোটিপতি ধনাঢ্য জাপানি মুসলমান হয়েছেন! সেখানে তারা নিখাঁদ ইসলামি টেলিভিশন চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করে ইসলামি শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচার করছেন। তারা সেখানে শত শত স্কুল-মসজিদ-মাদ্রাসা, কমিউনিটি সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেছেন, যেগুলো সমাজে ইসলামের বিকাশ ও বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

ধনী অথচ ক্ষুদ্র রাষ্ট্র সিঙ্গাপুরেও সেই একই অবস্থা। সেখানেও ইসলাম দ্রুত প্রসারমাণ। নওমুসলিমরা পূর্ণোদ্যমে ইসলাম প্রচারের কাজে নেমে পড়েছেন। মুসলমানরা সিঙ্গাপুরের ব্যবসা-বাণিজ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে। মাত্র ৩-৪ দশকের ব্যবধানেই তারা সিঙ্গাপুরের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।

প্রাচ্যের আরেক ধনী রাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তুর্কি বংশোদ্ভূত কিছু মুসলমান সৈন্যদের মাধ্যমে এখানে ইসলামের আগমন ঘটে। ওই সময় কয়েকজন কোরিয়ান নাগরিক সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করলেও তা খুব দ্রুত প্রসার লাভ করতে পারেনি। কিন্তু সত্তর দশকের শেষ প্রান্তে অথবা আশির দশকের শুরু হতেই কোরিয়ায় ইসলামের অগ্রযাত্রা বেগবান হয়ে ওঠে। আজ কোরিয়ার রাজধানী সিউল শহরসহ ছোটো-বড়ো প্রায় সকল শহরেই বহু মসজিদের উপস্থিতি চোখে পড়ে। অবাক করার বিষয় হলো প্রতিটি মসজিদেই রয়েছে উপচে পড়া ভিড়। কোরিয়ান মুসলমানরা ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিজ আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তোলার জন্য ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল-কলেজ স্থাপন, পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদি প্রকাশ ও পরিচালনা করছেন।

কট্টর মুসলিম বিদ্বেষী বলে পরিচিত আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারতের অবস্থা আরও ভিন্নতর। মুসলমানরাই এক সময় ভারতের শাসক ছিল, কিন্তু ব্রিটিশদের ষড়যন্ত্র আর নিজেদের দুর্বলতার কারণে ভারতের মুসলমানদের অবস্থা বড়োই শোচনীয়! তারপরেও সেখানে ইসলাম এক দ্রুত বর্ধনশীল ধর্মবিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। উগ্র হিন্দুদের সকল অপপ্রচার ও নির্মম অত্যাচার সত্ত্বেও দলে দলে ভারতীয় হিন্দু জনসাধারণ ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে। হিন্দু ড. মালিক রাম, ড. শিবশক্তি স্বরূপজী ভগবান, আগ্রার দৈনিক পত্রিকা দি নিউ সেনানীদর সম্পাদক দুর্গাদাস, এরা তো হাতেগোণা কজন মাত্র!

এদের কথা না হয় বাদই দিলাম, ভারতের কোনায় কোনায় সাধারণ জনগোষ্ঠীর অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করছে। উদাহারণ হিসেবে বলতে পারি, দক্ষিণ ভারতের তামিলনাড়ু রাজ্যের প্রায় চারটি গ্রামের পুরো জনগোষ্ঠী একসঙ্গে একই দিনে ইসলাম গ্রহণ করেছে। এ ঘটনা সমগ্র ভারতজুড়ে হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। প্রাদেশিক সরকারসহ কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করেছিল, কোনো মৌলবাদিরা এ অঘটন(!) ঘটাল কি না তা খতিয়ে দেখার জন্য। কিন্তু সবই বৃথা! দেখা গেল, ওইসব হাজারো হিন্দু জনগোষ্ঠী পার্শ্ববর্তী কয়েক ঘর অশিক্ষিত ও হতদরিদ্র মুসলমান জেলেদের আচার-আচরণ, উন্নত ব্যবহার ও দর্শনে অভিভূত হয়ে স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে।

পৃথিবীর একমাত্র হিন্দু রাষ্ট্র নেপাল, সেখানেও ইসলাম দ্রুত গতিতে বৃদ্ধির দিকে ধাবিত হচ্ছে। বিশেষ করে, ছাত্র-যুবসমাজে ইসলামকে জানার আগ্রহ প্রবল। নেপালের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মান্তরিত নওমুসলিম ছাত্ররা ইসলাম প্রচারের কাজে দিন রাত ব্যস্ত। এ বিষয়টি আজ হতে মাত্র দুটো দশক পূর্বেও নেপালের মতো দেশে ছিল অকল্পনীয়, অভবানীয়।

দূর প্রাচ্যের অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডে ইসলাম দ্রুত বৃদ্ধির দিকে। বিশেষ করে অস্ট্রেলিয়াতে তো মুসলমানদের সংখ্যা অবিশ্বাস্য গতিতে বেড়ে চলছে। অস্ট্রেলিয়ার রাস্তা-ঘাট, অফিস-আদালত যেখানেই দৃষ্টি দেন না কেন, মুসলমান নজরে পড়বেই। বেশ কিছু শহরে মসজিদ, ইসলামি স্কুল ও কমিউনিটি সেন্টার দাপটের সঙ্গে ইসলাম প্রচার ও প্রশিক্ষণের কাজ করে যাচ্ছেন।

চারদিকে সাগর পরিববেষ্টিত জনবিচ্ছিন্ন দ্বীপ মাদাগাস্কার। ক্ষুদ্র এই দ্বীপরাষ্ট্রেও লেগেছে ইসলামের গণজাগরণ। সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মান্তরিত হয়ে মুসলমান হওয়ার প্রবণতা বেশ কিছু বছর ধরেই চলে আসছিল। কিন্তু মাত্র বছর তিনেক পূর্বে সে দেশের এক কেবিনেট মন্ত্রী ধর্মান্তরীত হয়ে গেলেন এবং বহাল তবিয়তে স্বপদে থেকেই তার সরকারি দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। এ ঘটনাই প্রমাণ করে যে, এই দ্বীপ রাষ্ট্রের আগামী ভবিষ্যৎ কী।

ইউরোপে বলকান অঞ্চলে সোভিয়েত ব্লকের দেশ রুমানিয়া। বল্গাহীন যৌনাচারের জন্য ইউরোপে তার বিশেষ পরিচিতি ছিল। সেই রুমানিয়ায় ইসলামের অগ্রযাত্রা প্রথম দিকে নীরবে-নিভৃতে চললেও এখন তা বেশ প্রকাশ্য ও সরবে চলছে। মহিলা ও যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে ইসলাম এখন পরম মহার্ঘ, প্রিয় এক দর্শন। হাজারো রুমানিয়ান এখন ইসলামের ছায়াতলে এসে গর্বিত। তারা সংগঠিত হতে শুরু করেছেন। নওমুসলিম মুহাররম রাসুলের নেতৃত্বে ১৯৯২ সালে সেখানে (বুখারেস্ট) ইসলামি সংগঠন কায়েম হয়েছে। দেশের অন্যান্য শহরেও তার শাখা হয়েছে। ইসলামি পুস্তক, সাহিত্য এবং পোস্টার-লিফলেট প্রকাশ করে প্রচার কাজ চলছে পুরোদমে। কুরআনের অনুবাদ ছাপানো হয়েছে ২০ খণ্ডে। হট কেক-এর মতো তার বিক্রিও চলছে পুরো রুমানিয়া জুড়ে। রুমানিয়ার বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে ইসলামি সংগঠন।

১৪৯২ সালে যে স্পেনে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে মুসলমানদের নির্মূল করা হয়েছিল, সেই স্পেনেই এখন ভিন্ন চিত্র! স্পেনে আজ মুসলমান জনগোষ্ঠীর সংখ্যা আট লাখ। অবিশ্বাস্য এক ব্যাপার! সমগ্র স্পেনে রয়েছে তিনশতেরও বেশি বিরাটকায় মসজিদ এবং শত শত স্কুল-কলেজ।

শুধু ক্যাতালোনিয়া রাজ্যেই রয়েছে সত্তরটির বেশি এমন বাজার, যেখানে ইসলামি শরিয়া পদ্ধতিতে জবেহকৃত হালাল মাংস বিক্রি হচ্ছে। গ্রানাডা ও বার্সেলোনাতে দুইটি বৃহৎ গ্রান্ড জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যার প্রতিটির ধারণ ক্ষমতা পাঁচ হাজারের বেশি! এ দুটো শহর হতে নিয়মিত ইসলামি পত্র-পত্রিকা, ম্যাগাজিন ও অডিও-ভিডিও প্রচার প্রকাশ হচ্ছে। এই তো মাত্র কিছুদিন আগে প্রায় একসঙ্গে স্পেনে ২৫ হাজার খ্রিষ্টান গণধর্মান্তকরণের মাধ্যমে ইসলামে দীক্ষিত হলেন। এ ঘটনা পুরো স্পেন এবং ইউরোপে তোলপাড় শুরু করে দিয়েছে। সবাই ভাবছে ইউরোপ যাচ্ছে কোথায়?

ইউরোপেরই আরেক শক্তিশালী ও প্রভাবশালী রাষ্ট্র ফ্রান্স। এই ফ্রান্সে মুসলমানরা এখন দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। ফরাসি নারী-পুরুষ, বিশেষ করে, নারী সম্প্রদায় ইসলামকে গ্রহণ করার জন্য ছুটছে পঙ্গপালের মতো। সেখানকার প্রতিটি ছোটো-বড়ো শহরেই ধর্মান্তরিত হয়ে প্রতিদিনই মুসলমান হওয়ার ঘটনা ঘটছে। সেখানে মুসলমানদের আলাদা কবরস্থান, আলাদা স্কুল-কলেজ, রেস্টুরেন্ট, কমিউনিটি সেন্টার, মসজিদ এগুলো যত্র-তত্র চোখে পড়বে। ফরাসি ভাষায় কুরআন-হাদিস এবং ইসলামি সাহিত্য দেদারছে প্রকাশ, প্রচার ও বিক্রি হচ্ছে। সে দেশের প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুসলিম ছাত্র সংগঠন, মুসলিম মহিলা সংগঠন। জোয়ারের মতো দলে দলে ফরাসি নাগরিকেরা শামিল হচ্ছে ইসলামে। ফরাসি জনগণ বিস্মিত ও হতবিহ্বল হয়ে তা অবলোকন করছে। এ স্রোত থামিয়ে দেওয়ার সাধ্য কার!

ইটালিতেও সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে। রোম, মিলানের মতো বড়ো বড়ো শহরগুলোর কথা বাদই দিলাম। সে দেশের যেকোনো ক্ষুদ্র জনপদেই যান না কেন, দেখবেন মুসলমানদের সরব উপস্থিতি! আজানের সুমধুর ধ্বনি জনপদকে প্রতিদিনই নিয়মিত স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এ জনপদ ইসলামের জন্য উর্বর।

স্ক্যান্ডেনেভিয়ান দেশগুলোর মধ্যে সুইডেন ও নেদারল্যান্ডে ইসলাম দ্রত সম্প্রসারণের দিকে। বিশেষ করে সুইডেনে নওমুসলিম বেলাল ফিলিপ (Belal Philips) এবং তাঁর স্ত্রী সেখানে তো অসাধ্য সাধন করে ফেলেছেন। তাঁদের দাওয়াতি কাজে সাড়া দিয়ে শত শত সুইডিশ নারী-পুরুষ মুসলমান হয়েছেন। পরে তারাও সংগঠিত হয়ে নেমে পড়েছেন মাঠে। মাত্র এক দশকের মধ্যেই সুইডেনে এক নীরব বিপ্লব সংঘটিত হয়ে গেছে। আজ সেখানে শহরগুলোতে নিয়মিত আজানের ধ্বনি, রাস্তা-ঘাটে হিজাব বা টুপি পরিহিত মুসলিম নর-নারীর সরব উপস্থিতি স্পষ্টতই ঘোষণা করছে, আগামী দিন হবে একমাত্র ইসলামের।

আরও বিস্ময়ের ব্যাপার ঘটে গেছে আফ্রিকা মহাদেশে। বলতে গেলে পুরো মহাদেশ জুড়েই চলছে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন! দলে দলে মানুষ সেখানে ইসলামে দীক্ষিত হচ্ছে। মাত্র দুই দশক আগেও সেখানে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ছয় থেকে সাত, আর আজ সে সংখ্যা হঠাৎ করেই বেড়ে দাঁড়িয়েছে তেরো হতে ষোলোজনে (১৩% -১৬%)।

ওপরে দু-একটি নমুনা তুলে ধরলাম মাত্র। এভাবে সারা বিশ্বের ছোটো-বড়ো বিভিন্ন দেশে খ্যাত-অখ্যাত বিভিন্ন সমাজে ইসলাম দ্রুত বিস্তার লাভ করছে। পশ্চিমা গবেষক কিথ স্টাম্প (Keith W Stump) তাঁর এক গবেষণা কর্ম 'A Crucial Half Century Of Religion'-এ পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি প্রধান ধর্মের প্রবৃদ্ধির তুলনামুলক পর্যালোচনা করেছেন তথ্যভিত্তিক উপায়ে। ১৯৩৪ সালে থেকে শুরু করে ১৯৮৪ সালের শুরু পর্যন্ত তিনি ৫০ বছর সময়কালকে বেছে নিয়েছেন তার গবেষণার জন্যে। এ গবেষণার জন্য তিনি তথ্য নিয়েছেন পৃথিবীর অত্যন্ত খ্যাত ও স্বনামধন্য প্রামাণ্য গ্রন্থ *The World Almanac and Book of Facts 1935* এবং *The Readers Digest Alamanac and Year Book 1983*' থেকে। উভয় গ্রন্থ হতে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে তিনি দেখিয়েছেন যে, বর্ণিত এ সময়কালে খ্রিষ্টান ধর্মানুসারী বেড়েছে ৪৭%, ইহুদি জনগোষ্ঠী বৃদ্ধি না পেয়ে; বরং হ্রাস পেয়েছে ৪%। পক্ষান্তরে ইসলাম ধর্মের অনুসারী মুসলমান বেড়েছে ২৩৫%! অবিশ্বাস্য! কিন্তু অকাট্য দলিলভিত্তিক তথ্য, যা অস্বীকার করার বা অবিশ্বাস করার কোনোই সুযোগ নেই।[৭৯]

প্রকৃত সত্য হলো, ইউরোপ ও পশ্চিমা সভ্যতা তার নিজের বা নিজেদের কর্মফলে আজ ধ্বংসের প্রান্তসীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। অবাধ যৌনতা ও বস্তুবাদী এবং ভোগবাদী জীবনযাপনের অভ্যাস তাদেরকে বিবাহে অনিচ্ছুক করে তুলেছে।

কয়েকশত বছর ধরে এ রকম জীবনযাপনের ফলে পারিবারিক বন্ধন ধ্বসে পড়া ও জন্মহার কমে যাওয়ায় আজ তারা এমন একটা অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে যে, সেখান থেকে ফেরার আর কোনো পথই তাদের সামনে খোলা নেই। কারণ, সভ্যতা গড়ে ওঠার মূল উপাদান যে মানুষ, সেই মানুষেরই আকাল পড়েছে খ্রিষ্টবাদী পশ্চিমা সভ্যতা জুড়ে। যে মানুষকে ঘিরে রাষ্ট্র, সমাজ ও সভ্যতা গড়ে ওঠে, সেই মানুষই যদি না থাকে, তাহলে সভ্যতার বিকাশ ও বিস্তারের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে কারা? ফলে সভ্যতা মুখ থুবড়ে পড়তে বাধ্য।

এ অবস্থা থেকে বাঁচতে তারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে অভিবাসী নিচ্ছে বা নিতে বাধ্য হচ্ছে। এসব অভিবাসীরা নিজ নিজ জন্মভূমি ছেড়ে যাচ্ছেন, সেইসঙ্গে তারা নিয়ে যাচ্ছেন নিজ নিজ আদর্শ, ধর্মবিশ্বাস, কৃষ্টি-কালচার আর জীবনবোধ।

ফলে এদের কারণেও পশ্চিমা সমাজ তার ভেতর থেকেই বদলে যাচ্ছে। বলা চলে বদলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। পুরো পশ্চিমা সভ্যতায় এর প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে।

জন্মহার একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার নিচে নামলে সভ্যতা বিকশিত হয় না। ইতিহাসে কোনো সভ্যতা পরিবার প্রতি ১.৯% জন্মহার নিয়ে বিকশিত হয়েছে, সে প্রমাণ নেই। জন্মহার কমতে কমতে যখন ১.৩% জনে ঠেকে, তখন সে সভ্যতার টিকে থাকাটা অসম্ভব। কারণ, এ রকম সভ্যতায় এ জন্মহার নিয়ে প্রতিটি নারী পুরুষকে গড়ে ৮০ থেকে ১০০ বছর পর্যন্ত প্রজননক্ষম হতে হবে, সেটা অসম্ভব।

ব্রিটেনে পরিবারপ্রতি জন্মহার হলো ১.৬% জন মাত্র। বিলুপ্তির হার ২.১১%-এর নিচে। ব্রিটেনে মুসলমানদের জন্মহার পরিবার প্রতি গড়ে ৪.৬%। তিরিশ বছর আগে ব্রিটেনে মুসলমান ছিল বিরাশি হাজার। ২০১৭ সালে সে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিরিশ লাখ।

সারা ব্রিটেনে মসজিদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৩০০ তে! এটাই পরিবর্তন। সমাজ পরিবর্তন হচ্ছে, ব্রিটেন বদলাচ্ছে, বদলাচ্ছে ইউরোপ! পরিবর্তনটা আঞ্চলিক নয়, বৈশ্বিক। ক্ষয়িষ্ণু নয়, বর্ধিষ্ণু। ঘরে বসেও টের পাওয়া যায়!

ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে। ফ্রান্সের অবিসংবাদিত নেতা, নেপোলিয়ান বোনাপোর্ট কুরআনের শিক্ষার ওপর ভিত্তি করে এক বৈশ্বিক ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে ১৯১৪ সালের এক সমাবেশে বলেছিলে–

> ‘I hope the time is not far off when I shall be able to unite all the wise and educated men of all the countries and establish a uniform regime based on the principles of Qur'an which alone are true and which alone can lead men to happiness (Quoted in CHRISTIAN CHERFILS' BONAPARTE ET ISLAM (PARIS 1914)’

‘ফ্রান্স এখন ইসলামের পথে ঝড়ের গতিতে ধেয়ে চলেছে। ফ্রান্সে যেখানে মূল ফরাসি পরিবার প্রতি জন্মহার ১.৮% মাত্র, সেখানে মুসলিম পরিবারগুলোয় এ হার অবিশ্বাস্য! গড় ৮.১%! আরও রয়েছে ক্রমবর্ধমাণ ধর্মান্তরিত হওয়ার ঘটনা। ২০০৯ সালেই সত্তর হাজার ফরাসি খ্রিষ্টান ইসলাম গ্রহণ করেছে!

দক্ষিণ ফ্রান্স ছিল গির্জার শহর, আজ সেখানে শতকরা ৩০ ভাগই মুসলমান। নিস, মার্সেই ও প্যারিস শহরে এ হার শতকরা ৪৫%। ২০২৭ সালে ফ্রান্সে মোট জনসংখ্যার ২৫% হবে মুসলমান। ২০৫০ সাল নাগাদ ফ্রান্স হবে মুসলমান প্রধান দেশ।

জার্মানির অবস্থাও ভিন্ন কিছু নয়। সেখানে জন্মহার ১.৩%। একটা সভ্যতাকে টিকে থাকতে হলে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন জন্মহার, পরিবার প্রতি ২.১১ জনের নিচে। জার্মান সরকার স্বীকার করছে, ২০৫০ সালে জার্মানি হবে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ।

১৯৯০-এর পর ইউরোপজুড়ে যত জনস্যংখা বৃদ্ধি পেয়েছে তার শতকরা ৯০ ভাগই মুসলমান। ২০২৮ সাল নাগাদ পুরো ইউরোপে মুসলমানের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে দশ কোটির বেশি!

গ্রিসে জন্মহার ১.৩%, ইটালিতে ১.২%, স্পেনে মাত্র ১.১%! আর পুরো ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ৩১টি দেশের গড় হার ১.৩৮% মাত্র। ইতিহাসের কোনো পর্যায়েই এ জন্মহার নিয়ে কোনো সভ্যতা টিকে থাকতে পারেনি। অতএব, পরিবর্তনটা অবশ্যম্ভাবী। আর ইউরোপের আগামী পরিচিতি হবে 'ইসলামিক ইউরোপ' বলে!

নেদারল্যান্ডসে বর্তমানে যত নবজাতক জন্মে, তার অর্ধেকই মুসলিম শিশু। আগামি ১৫ বছরের মধ্যে নেদারল্যান্ডসের অর্ধেক জনসংখ্যা হবে মুসলমান। এটা নেদারল্যান্ডস সরকারের নিজস্ব পরিসংখ্যান!

বেলজিয়ামে মোট জনসংখ্যার শতকরা পঁচিশজনই মুসলমান। বর্তমানে জন্ম নেওয়া প্রতি একশত শিশুর মধ্যে পঞ্চাশজনই মুসলমান। সরকারের হিসাব অনুযায়ী আগামি ২০২৫ নাগাদ বেলজিয়ামে মুসলিম জনসংখ্যা দাঁড়াবে দেশের মোট জনসংখার শতকরা তেত্রিশজনে। ২০৫০ সাল নাগাদ বেলজিয়ামের সংখাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী হবে মুসলমান।

কানাডায় পরিবার প্রতি জন্ম হার ১.৬ জন মাত্র। সভ্যতা টিকে থাকার জন্য কাম্য সর্বনিম্ন হার ২.১১-এর চেয়ে কম। ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত দেশটির জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ষোলো লাখ। এর মধ্যে বারো লাখই হলো ইমিগ্র্যান্ট, যাদের বেশিরভাগই মুসলিম!

আমেরিকার বর্তমান জন্মহার ১.৬ জন। এর সঙ্গে যদি লাতিন আমেরিকা থেকে আগত অভিবাসীদের হার ধরা হয়, তাহলে সে হার দাঁড়ায় ২.১১-এ। ১৯৭০ সালে আমেরিকায় মুসলমান ছিল মাত্র এক লাখ, আজ চল্লিশ বছর পরে এসে মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক কোটি ছাব্বিশ লাখের কাছাকাছি!

২০০৯ সালে আমেরিকাতে নব্বই হাজার আমেরিকান ইসলাম গ্রহণ করেছে। অথচ কদিন আগেও বছরে মাত্র কুড়ি হাজার আমেরিকান ইসলাম গ্রহণ করত।

অতপর...

বিশ্ব সভ্যতা আজ বাস্তবিক অর্থেই ধ্বংসের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে! একমাত্র ইসলাম-ই পারে তাকে প্রত্যাশিত সুখ-শান্তি ও স্থিতিশীলতা দিতে। এ বিশ্ব সভ্যতা হাঁপিয়ে উঠেছে। প্রতিদিনই জনমানুষের অন্তর্জগত, বহির্জগত এবং চেতন-অবচেতন মন বিভিন্ন দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে, আধ্যাত্মিক শূন্যতায় ভারাক্রান্ত ও নিঃশেষিত হচ্ছে, শারীরিক ও মানসিক পীড়নে পীড়িত হচ্ছে। সেখানে প্রত্যাশিত সুখ-শান্তি আর সমৃদ্ধি পাওয়া কি আদৌ সম্ভব্য?

আজকের বিশ্ব সভ্যতা যদি সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার মুখ দেখতে চায়, তবে তাকে সর্বপ্রথম প্রতিটি মানব সদস্যের নৈতিকতাকে জাগ্রত করতে হবে। যা তার বিবেককে শাণিত করবে, অন্তরকে পরিশুদ্ধ করবে, চরিত্রকে উন্নত মানবহিতৈষী ধ্যানধারণায় সজ্জিত করবে। কিন্তু কীভাবে? বিশ্বের অন্যান্য দর্শন-মতবাদ যে এ দায়িত্ব পালনে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে, সে কথা আজ বিশ্বের কোনো পাগলেও অস্বীকার করবে না।

বিশ্বের মানুষের দৃষ্টিপটে বর্তমান সভ্যতার অসারতা শুধু সুস্পষ্টই হয়নি; বরং এর সকল নেতিবাচক ও বিধ্বংসী ফলাফলও পূর্ণরূপে উপলব্ধি হতে শুরু করেছে। এ উপলব্ধি সমাজের সর্বস্তরের মানুষের চেতনায় ধরা পড়েছে এবং সকল প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব উপেক্ষা করে তা প্রকাশও করছে। নিজেদের হাতে গড়া বড়ো সাধের এই সভ্যতার অসারতা ও ব্যর্থতার কথা প্রকাশ্যেই তারা বলছে। এই পরিস্থিতি একথাই প্রমাণ করে যে, বর্তমান বিশ্বসভ্যতার বাসিন্দারা নিজেদের বোধ-বিশ্বাস ও দর্শনের প্রতি হতাশা ও অনাস্থায় ভেঙে পড়েছে।

তারা এ অবস্থা হতে মুক্তি পেতে ইসলামকেই আশ্রয়স্থলের লক্ষ্যবস্তু হিসেবে পরিগণিত করছে। এ সত্যেরই প্রকাশ ঘটেছে বর্তমান বিশ্বের অন্যতম এক প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব, ব্রিটিশ রাজ সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী প্রিন্স চার্লসের বক্তব্যে। ১৯৯৬ সালের ১৩ই ডিসেম্বর নিজ জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনে প্রদত্ত ভাষণের এক পর্যায়ে তিনি অকপটে বলেন–

> 'আমি বহু সময় ধরে চিন্তাভাবনা করে দেখেছি যে, আমাদের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত আধ্যাত্মিক অনভূতি এবং ইসলাম ও পাশ্চাত্য দুনিয়ার পারস্পরিক বোঝাপড়া। আমার বিশ্বাস আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার এ অনুভূতি ফিরে আসছে। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ লোক ঠাট্টা-বিদ্রুপের ভয়ে এ অনুভূতি প্রকাশ করতে চায় না। এ ঠাট্টা-বিদ্রুপে এমনকী আল্লাহর নাম নিতে যে ভয়, তা এ কথার প্রমাণ করে যে, তথাকথিত পাশ্চাত্য সভ্যতা তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছে। ...আমার অভিমত এই যে, আধুনিক জড়বাদের ভারসাম্যহীনতা এবং অনিষ্ঠকারিতা দ্রুত বাড়ছে। আমি সর্বদা অনুভব করেছি যে, আমাদের জীবনে পাওয়া যায় এমন কোনো ঐতিহ্য নিছক মানুষের কোনো আবিষ্কার নয়; বরঞ্চ আল্লাহ প্রদত্ত প্রাকৃতিক বুনিয়াদী দিব্যজ্ঞান।'[৮০]

হ্যাঁ, প্রিন্স চার্লসের ভাষায় পরিষ্কার স্বীকৃত হয়েছে পশ্চিমা সভ্যতার উপলব্ধি, ব্যর্থতা ও হতাশার উপলব্ধি!

এখন এ বিশ্বের সামনে একমাত্র অবলম্বন হিসেবে কেবল ইসলামই রয়েছে। সেইসঙ্গে বিশ্ববাসীর সামনে সর্বজন স্বীকৃত ও বহুল গবেষণালব্ধ এ তথ্য রয়েছে যে, বিশ্ব ইতিহাসে একমাত্র ইসলামই পেরেছিল মানুষের নৈতিকতাকে উন্নত করতে। বিবেককে শাণিত করে এবং অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে মানুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করে অকল্পনীয় দ্রুততার সঙ্গে বহুল কাঙ্ক্ষিত সুখ-সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। ইসলামই একমাত্র দর্শন, যা এমন এক সমাজ কায়েম করতে পেরেছিল, যেখানে সকলের মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা হয়েছিল। মানুষের মন থেকে সংকীর্ণতা, হিংসা-বিদ্বেষ, দুর্বলতা ও অনৈক্যকে দূর করেছিল। সকলের জান-মাল-ইজ্জতের নিরাপত্তা দিয়েছিল। অকাট্য তথ্য ও প্রমাণসহ বিশ্বের সামনে এ বাস্তবতাও রয়েছে যে, ইসলামই একমাত্র দর্শন; যা মানুষের মনের সকল দ্বন্দ্ব এবং প্রশ্নের যুক্তিগ্রাহ্য, বোধগম্য ও ভারসাম্যপূর্ণ জবাব দিয়ে তার মন-মগজকে প্রশান্ত করতে পেরেছে।

মায়ের অবাধ্য কিশোর সন্তান মায়ের হাতে বকুনি খেয়ে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার সময় পণ করেছিল যে, সে আর বাড়ি ফিরে আসবে না। সারাদিন পথে পথে ঘুরে, দ্বারে দ্বারে ঠোকর খেয়ে সন্ধ্যার আঁধার নামলে ভীত ও তটস্থ হয়ে ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত ও অবসন্ন কিশোর যখন বাড়ির দরজায় ফিরে আসে, তখন লজ্জা আর অভিমানে ভেতরে না ঢুকে বাইরেই ঘুরঘুর করে। আর সেইসঙ্গে অনর্থক চেঁচামেচি ডাকাডাকি কাশাকাশি করে মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সচেষ্ট হয়। মা যদি একবার শুধু বাড়ির ভেতরে ডাকেন, সে ছুটে গিয়ে মায়ের আঁচলে আশ্রয় নিয়ে ধন্য হয়!

সভ্যতা ইসলামের শাশ্বত বিধানকে অস্বীকার করে মুসলমানদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে পুঁজিবাদ-সমাজবাদ-জড়বাদ এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সবই অনুশীলন করে দেখেছে। শান্তির আশায় প্রত্যেকের দরজায় ধরনা দিয়ে দিয়ে ঠোকর খেয়ে ফিরেছে। আজ সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে, লেখা-লেখনীতে বিবৃতি দিয়ে ইসলামের প্রশংসা করছে। মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায় নিয়োজিত সেই অবাধ্য কিশোর ছেলেটির মতো করতে বাধ্য হচ্ছে! এ হলো মায়ের আঁচলরূপী ইসলামের কোলে লুটিয়ে পড়ার পূর্বক্ষণ! একটু দরদভরা গলায় অতীতের নির্মম অত্যাচার আর দুর্ব্যবহারের পাপকে ক্ষমা করে যদি মুসলমানরা এ বিশ্ববাসীকে ডাক দেয়, বিশ্বাসে করুন, এ বিশ্ববাসী একটি শতকও আর অপেক্ষা করবে না, লুটিয়ে পড়বে ইসলামের ছায়াতলে। কারণ, এ বিশ্বসভ্যতা অকাট্যভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, ইসলাম-ই তার একমাত্র ঠিকানা।

হায়! মুসলমানরা কি এ বাস্তবতা উপলব্ধি করে নিজেদের জড়তা, হীনমন্যতা আর নিষ্ক্রিয়তাকে কাটিয়ে উঠে সফল ও সার্থক মুবাল্লিগের চরিত্র নিয়ে মাঠে নেমে আসবে?

তথ্যসূত্র

১. Western Civilization through Muslim Eyes, Pp-237.
২. A Hand Book of Modern Europe, L. K Mukharjee, pp-528.
৩. Parallel Thinking, By Edward D Bono, Pp- 7.
৪. Ibid
৫. The law of The Soviet State.
৬. ইসলামে মানবাধিকার, মুহা. সালাহ উদ্দিন, আধুনিক প্রকাশনী, পৃষ্ঠা- ৪৩।
৭. দৈনিক আঞ্জাম ৮ এপ্রিল, ১৯৫০ সংখ্যা।
৮. Parallel Thinking, By Edward D Bono, Pp- 31
৯. ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম, মুহাম্মদ কুতুব, পৃষ্ঠা ১৮৪।
১০. Communism লেখক- WEBB, Pp 833.
১১. Parallel Thinking, By Edward D Bono, Pp-6.
১২. আগামী দিনের জীবন বিধান, সাইয়্যেদ কুতুব।
১৩. ওই
১৪. Oxford Dictionary, William Geddi সম্পাদিত।
১৫. পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎস, আব্দুল হামিদ সিদ্দিকী, অনুবাদ এ.কে.এম, নাজির আহম্মেদ, পৃ : ৩৪।
১৬. ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, লেখক ড. মুস্তফা আল সিবায়ী, অনুবাদ আকরাম কারুক, পৃষ্ঠা- ১০।
১৭. পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎস. মূল. আব্দুল হামিদ সিদ্দিকী, অনুবাদ; এ.কে. এম, নাজির আহম্মেদ পৃষ্ঠা ৫৪।
১৮. ওই, পৃষ্ঠা-৬২।
১৯. ওই পৃষ্ঠা ৬২-৬৩।
২০. Spotlight on Women in Society. By Elizabeth Curry, Published-1984, Pp-5.
২১. Ibid –pp9.
২২. Ibid.
২৩. Ibid pp10.
২৪. Ibid pp20.
২৫. নারী, লেখক মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, পৃষ্ঠা- ২২।

২৬. ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী, লেখক ডা. মুস্তফা আল সিবায়ি, অনুবাদ আকরাম কারুক, পৃষ্ঠা- ১১৯।
২৭. Encyclopedia Britannica, Vol -4 Pp-I (X)3
২৮. পাক্ষিক পালাবদল ১৬-১৮ ফেব্রুয়ারি/১৯৯৮ সংখ্যা।
২৯. ওই
৩০. মাসিক পৃথিবী মার্চ /১৯৯৬ সংখ্যা পৃষ্ঠা ৩৪/৩৫
৩১. Spotlight on Women In Society. By Elizabeth Curry. Published-1984. Pp-52.
৩২. Ibid pp-52.
৩৩. Bulletin on Islamic Medicine. Vol-I. Second Edition, Pp 60.
৩৪. Ibid pp-61.
৩৫. National Institution of Alcohol Abuse and Alcoholism প্রদত্ত গবেষণা জরিপ, ২০১৫
৩৬. Spotlight on Women In Society. By Elizabeth Curry. Published-1984. Pp No--69.
৩৭. Parallel Thinking. Edward 'D Bono. Pp-6
৩৮. Maladaptive Behabior: An Introduction To Abnormal Psychology. Lehey and Cinunero. Pp- 530.
৩৯. Western Ciiization Condemned by Itself. By Mariam Jamila. Vol-2,
৪০. বর্তমান সভ্যতার সংকট, এ.কে এম. নাজির আহম্মেদ পৃষ্ঠা ২০।
৪১. Spotlight on Women In Society. By Elizabeth Curry, Published-1984, Pp- 52-53..
৪২. সাপ্তাহি বিচিত্রা ১৭ মার্চ সংখ্যা ১৯৯৫।
৪৩. Maladaptive Behavior: An Introduction to Abnormal PsychologyÕ, Lehey and Ciminero. Pp- 334.
৪৪. Bangladesh Observer. 13 Dec/97.
৪৫. পাশ্চাত্য শিশু ও নারী অধিকার, মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, মাসিক পৃথিবী, জানুয়ারি /৯৮।
৪৬. রহস্য পত্রিকা, জানুয়ারি ১৯৯৫।
৪৭. চেপে রাখা ইতিহাস গোলাম আহম্মদ মুরতজা, পৃষ্ঠা- ৮১।
৪৮. ভারতবর্ষ ও ইসলাম, লেখক শ্রী সুরজিত দাস গুপ্ত, পৃষ্ঠা ১৭।
৪৯. The Crusades, Hans Edeherd Mayer. Pp No- 60.
৫০. চেপে রাখা ইতিহাস, গোলাম আহম্মদ মুরতজা পৃষ্ঠা- ১৭।

৫১. Islamic Constitution. Rasheedul Hasan. 1st Edition.
৫২. বিজ্ঞানের ইসলামের অবদান, ড. দেলওয়ার হোসেন, পৃষ্ঠা- ৬৬।
৫৩. ওই পৃষ্ঠা- ৭১।
৫৪. ওই- ৯৬।
৫৫. Bulletin on Islamic Medicine, Second Edition. 1981. Pp 94.
৫৬. Ibid, pp-93.
৫৭. The Making of Humanity. Robert Briffault. Pp 191.
৫৮. চেখে রাখা ইতিহাস, গোলাম আহম্মদ মুরতজা, পৃষ্ঠা- ২১।
৫৯. বাংলা ও বাঙালী, মুক্তি সংগ্রামের মুলধারা, মুসলিম অবদানের মূল্যায়ন, মুহা. আব্দুল মান্নান।
৬০. ওই
৬১. রাম মোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল লেখক ইন্দ্রভূষণ দাশ, পৃষ্ঠা- ৭।
৬২. বাংলার সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ১১৭।
৬৩. The Making of Humanity, By Robert Birffault, Pp 7.
৬৪. পাক্ষিক পালাবদল, ১৬-৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ পৃষ্ঠা- ১১৭।
৬৫. মানব সভ্যতা ও ইসলাম, সাইয়্যেদ কুতুব, পৃষ্ঠা- ৫০।
৬৬. ওই
৬৭. অঙ্গীকার ডাইজেস্ট, মার্চ/৯৪, পৃষ্ঠা- ৫০।
৬৮. পাক্ষিক পালাবদল। ১৬-৩০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ সংখ্যা পৃষ্ঠা- ৮।
৬৯. মানব সভ্যতা ও ইসলাম, সাইয়্যেদ কুতুব, পৃষ্ঠা- ৪৯-৫০।
৭০. ওই পৃষ্ঠা- ৫৫।
৭১. ওই পৃষ্ঠা- ৫৬।
৭২. ওই পৃষ্ঠা- ৫৬।
৭৩. Theory and Practice Of Communism. R.N Crew Hunt.
৭৪. Threshold 2000 Jerald O' Burney.
৭৫. সাপ্তাহিক মুসলিম জাহান, ২৪-৩০ সেপ্টেম্বর ৯৬।
৭৬. ওই, ২৪-৩০ সেপ্টেম্বর ৯৬।
৭৭. ওই, ৩-৯ সেপ্টেম্বর ৯৬।
৭৮. ওই, ৩-৯ সেপ্টেম্বর ৯৬।
৭৯. The Choice, Islam & Christianity, Vol- I. Ahmad Deedat, Pp -১৩৩
৮০. আমাদের অতীত ও বর্তমান। মরহুম আব্বাস আলী খাঁন, ছাত্র সংবাদ জুলাই আগষ্ট/ ৯৭ সংখ্যা পৃষ্ঠা ৩৩।

লেখকের অন্যান্য বই

১. আধুনিক যুগে ইসলামি আন্দোলন ও তার দশটি ক্ষেত্র
২. চিকিৎসার আড়ালে মিশনারি তৎপরতা ও আমাদের চিকিৎসকদের দায়িত্ব
৩. নেতা : বিশ্বনেতা : শ্রেষ্ঠ নেতা
৪. ভোট কি ও কেন
৫. মানব সম্পদ উন্নয়নে আল কুরআন
৬. ব্রিটেনে মুসলিম শাসক
৭. অন্তর মম বিকশিত করো
৮. বাংলাদেশে শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা
৯. ধরনীর পথে পথে
১০. টাইন নদীর ওপার থেকে
১১. আবার কখনো যদি
১২. ইতিহাসের অলি গলি
১৩. অল্প স্বল্প গল্প
১৪. বিদায় বন্ধু দেখা হবে জান্নাতে
১৫. কালচার নিয়ে অনাচার
১৬. ইসলামি শাসনব্যবস্থা; মৌলিক দর্শন ও শর্তাবলী
১৭. নির্বাচিত কিশোর গল্প সংকলন
১৮. সম্রাট আকবর- নায়ক না খলনায়ক
১৯. শিক্ষাব্যবস্থা : মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি
২০. নির্বাচিত কিশোর গল্প সংকলন
২১. এই ধরণী তলে

গার্ডিয়ান পাবলিকেশন-এর প্রকাশিত বইসমূহ

ক্রম	বই ও লেখকের নাম	মূল্য
১.	প্যারাডক্সিক্যাল সাজিদ– আরিফ আজাদ	৩০০/-
২.	কয়েকটি গল্প : অতঃপর– নাসরিন সুলতানা সিমা	১৩০/-
৩.	হালাল বিনোদন– আবু মুআবিয়াহ ইসমাঈল কামদার অনুবাদ : মাসুদ শরীফ	১৫০/-
৪.	৫০০০ প্রশ্নোত্তরে সিরাতুন্নবি ﷺ– ড. মো. আবদুল মান্নান	৪৯০/-
৫.	নেতৃত্বের প্রাথমিক বোঝাপড়া– ড. মুনির উদ্দিন আহমেদ (বাদল)	২৫০/-
৬.	মুক্তিযুদ্ধের বয়ানে ইসলাম– পিনাকী ভট্টাচার্য	২৫০/-
৭.	বি স্মার্ট উইথ মুহাম্মাদ ﷺ– ড. হিশাম আল আওয়াদি অনুবাদ : মাসুদ শরীফ	২৫০/-
৮.	বিয়ে– রেহনুমা বিনত আনিস	২৫০/-
৯.	দ্যা রিভার্টস : ফিরে আসার গল্প– সামছুর রহমান ওমর, কানিজ শারমিন সিঁথি	৩৫০/-
১০	বন্ধন– উস্তাদ নোমান আলী খান	২৫০/-
১১	এরদোয়ান : দ্যা চেঞ্জ মেকার– হাফিজুর রহমান	৪০০/-
১২	রোহিঙ্গা গণহত্যা : কাঠগড়ায় সু চি– ইমরুল কায়েস	২৫০/-
১৩	আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন দেখ– আমিনুল ইসলাম ফারুক	২২০/-
১৪	সানজাক-ই উসমান– প্রিন্স মুহাম্মদ সজল	৫০০/-
১৫	নাফ নদীর ওপারে– আসাদ পারভেজ	৩০০/-
১৬	ডেসটিনি ডিজরাপ্টেড– তামিম আনসারি অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর	৫০০/-
১৭	বাতিঘর– মাসুদা সুলতানা রুমী	৩৭৫/-
১৮.	বেবিজ ডায়েরি– সম্পাদনা : মুজাহিদ শুভ	৪৫০/-
১৯.	অ্যা লেটার টু অ্যাথিইস্ট : মুগনিউর রহমান তাবরীজ	৩৩৫/-
২০.	দুআ বিশ্বাসীর হাতিয়ার : ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : মাসুদ শরীফ	৩২৫/-
২১.	ইসলাম : সভ্যতার শেষ ঠিকানা – জিয়াউল হক	২৭৫/-
২২.	Paradoxical Sajid (English Version)- Arif Azad	৩০০/-

২৩.	Science of Da'wah- Akhlaqe Rasul	২৫০/-
২৪.	Gateway to Success- Ahsan Habib Imrose	১৫০/-
২৫.	রিভাইব ইয়োর হার্ট– উস্তাদ নুমান আলী খান অনুবাদক : মারদিয়া মমতাজ	২৫০/-
২৬.	গুড প্যারেন্টিং– নিছার আতিক	২৫০/-
২৭.	সাইমুম সমগ্র (১২ খণ্ড)– আবুল আসাদ	৭২০০/-
২৮.	আতাতুর্ক থেকে এরদোয়ান– মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ	৪০০/-
২৯.	আমার দেখা তুরস্ক– হাফিজুর রহমান	৪০০/-
৩০.	হাজার গানের হৃদয়ের স্বরলিপি– তাওহীদুল ইসলাম	৬০০/-
৩১.	সবুজ চাঁদে নীল জোছনা– আব্দুল্লাহ মাহমুদ নজীব	১২০/-
৩২.	ইসলামি রাজনীতির ব্যবচ্ছেদ– এহসানুল হক জসীম	৪৭৫/-
৩৩.	বিপ্লবী শ্রেষ্ঠ কবিতা– সংকলিত	৩০০/-

প্রকাশিতব্য বইসমূহ

১. প্যালেস্টাইনের বুকে ইজরাইল– আসাদ পারভেজ
২. মানবাধিকার ও ইসলাম– প্রফেসর ড. মো. নুরুল ইসলাম
৩. জ্বলে ওঠো সাহসের মন্ত্রে– আ জ ম ওবায়দুল্লাহ
৪. দ্য প্রোডাক্টিভ মুসলিম- মুহাম্মাদ ফারিস, অনুবাদ : মিরাজ রহমান
৫. দ্য ব্যাটল অব ইসলাম- মেজর জেনারেল (অব.) সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম (বীরপ্রতীক)
৬. লেটার টু ডটার– নিছার আতিক
৭. নবি কাহিনি (শিশুতোষ সিরিজ)– সামছুর রহমান ওমর
৮. ইতিহাসের ধুলোকালি– পিনাকী ভট্টাচার্য
৯. বিয়ে ও পর্দা– রাশেদুল হাসান রিয়াদ (সম্পাদিত)
১০. ইসলামে প্রত্যাগমনের গল্প– রাজা মকবুল হুসাইন জানজুয়া (অনুবাদ গ্রন্থ)
১১. আন্তর্জাতিক ইহুদি সংকট– হেনরি ফোর্ড (অনুবাদ : ফুয়াদ আল আজাদ)
১২. ভ্রান্তির বেড়াজালে– ড. ইউসুফ আল কারজাবি (অনুবাদ : ড. মাহফুজুর রহমান)
১৩. গল্পে গল্পে আল-কুরআন (শিশুতোষ সিরিজ)– মুহাম্মদ শামীমুল বারী

কুষ্টিয়ার সন্তান জিয়াউল হক। জন্ম ১৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬০। তৎকালীন পাকিস্তান নৌবাহিনীতে কর্মরত পিতার কর্মস্থল করাচিতেই কেটেছে শৈশব, কৈশোর আর তারুণ্যের দিনগুলো। ৭৪-এ কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুরের ফিলিপনগরে প্রত্যাবর্তন।

মেন্টাল হেলথ নার্সিং, মেন্টাল হেলথ, সাইকিয়াট্রিক রিহাবিলিটেশন-এ পড়াশোনা করেছেন তিনি। সর্বশেষ ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল ইউনিভার্সিটি থেকে মেন্টাল হেলথ, ইএমআই এবং ডিমেনশিয়া ম্যানেজমেন্ট কোর্স শেষ করে ইংল্যান্ডেই একটি বেসরকারি মেন্টাল হাসাপতালের ডেপুটি ম্যানেজার এবং ক্লিনিকাল লিড হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

নাবিকের নোঙ্গর হয় ঘাটে ঘাটে। শৈশবেই খেলাচ্ছলে কলম হাতে নিয়ে লিখতে বসা। একজন নাবিক পিতার সন্তান লেখক জিয়াউল হকও জীবনের দুই-তৃতীয়াংশ সময়ই দেশের বাইরে কাটিয়েছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ পেরিয়ে চাকরির সুবাদে ইংল্যান্ডে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে এখন নিয়মিত লেখালেখি করছেন।

এ পর্যন্ত তার ২২টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।
তন্মধ্যে '*বই খাতা কলম, মানব সম্পদ উন্নয়নে আল-কুরআন, ব্রিটেনে মুসলিম শাসক, বাংলাদেশের শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থা, ইসলাম : সভ্যতার শেষ ঠিকানা, ইসলামি শাসন ব্যবস্থা : মৌলিক দর্শন ও শর্তাবলি, ধরণীর পথে পথে, অন্তর মম বিকশিত করো*' অন্যতম।

'আরবদের মধ্য দিয়েই মানবভাগ্য তার আলোকশক্তি সঞ্চয় করেছে, ল্যাটিন জাতির ভেতর দিয়ে নয়।'

জি.সি ওয়েলস

নানান সভ্যতা ইসলামের সর্বজনীন বিধানকে অস্বীকার করে মানুষের ওপর পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, জড়বাদ, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদসহ বিভিন্ন মতবাদ অনুশীলন করে দেখেছে। শান্তির আশায় প্রত্যেকের দরজায় ধরনা দিয়ে দিয়ে ঠোকর খেয়ে ফিরেছে। অবশেষে তারা সত্যটা উপলব্ধি করতে শিখেছে। বক্তৃতা, বিবৃতি ও লেখনীতে ইসলামের প্রশংসা করছে। এ যেন ঠিক সেই ছেলেটির মতো, যে মায়ের সঙ্গে রাগ করে বাড়ি ফিরবে না বলে পণ করেছিল। কিন্তু সারাদিন পথে পথে ঘুরে, দ্বারে দ্বারে ঠোকর খেয়ে সন্ধ্যায় ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত শরীরে বাড়ির কাছে এসে ঘুরঘুর করছে, কিন্তু ভেতরে ঢোকার সাহস পাচ্ছে না।

এমতাবস্থায় মুসলমানরা যদি নিজেদের জড়তা, হীনমন্যতা ও নিষ্ক্রিয়তাকে দূরে ঠেলে মায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে পতনোন্মুখ সভ্যতাকে একবার ডাক দিতে পারে, তাহলে হয়তো সে আর বেশি দিন অপেক্ষা করবে না; লুটিয়ে পড়বে ইসলামের ছায়াতলে। কারণ, এ বিশ্বসভ্যতা অকাট্যভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, ইসলামই তার একমাত্র ঠিকানা।